Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Papiya Publishers; No. 49, Cornwallis Street, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Nripendrakumar Basu
Title: *Ogo Premik Pita o Mata*	Year of Publication: July, 1948
	Size: 18.5 c.m. x 13 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good.
	Remarks: Hard bound copy. Total pages: 236; Title page, content list, full page picture are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

ওগো প্রেমিক পিতা ও মাতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

ওগো শ্রেমিক পিতা ও মাতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

প্রণীত।

সহায়তাকারিণী

শ্রীনির্মলা বসু

প্রকাশস্থান

পাপিয়া পাবলিশার্স

৪৯, কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা-৬

কলিকাতার এজেণ্ট

কাত্যায়নী বুক স্টল

২০৩, কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা-৬

মূল্য—চার টাকা।

কলিকাতা ৪৯নং কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীটস্থ পাপিয়া পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ সাতুই শ্রাবণ তেরশো পঞ্চান্ন, ইংরিজি তেইশে জুলাই উনিশ শো আটচল্লিশ।

এই গ্রন্থকারের লেখা

বিয়ের আগে ও পরে
তরুণতরুণীদের জীবন-গীতা ৩৷৷০

ওগো বর ওগো বধূ
বিবাহে উপহার-দানের কোহিনুর ৩৷৷০

নরনারীর যৌনবোধ
ব্যবহারিক প্রেমজীবনের নবীন মহাভারত ৪৷৷০

প্রেম ও কামবিজ্ঞান
উচ্চতর প্রেমরসপিপাসুদের অলকানন্দা ৩৷৷০

যৌন বিশ্বকোষ
৩ খণ্ডে সমাপ্ত। জ্ঞানের স্বর্ণখনি ৩৲

ফ্রয়েডের ভালবাসা
বহুরূপী প্রেমের স্বরূপ-নির্ধারণ ৪৲

ফ্রয়েডের নারীচরিত্র
বহু দেখা-শোনা-পড়া নারীর চরিত্রবিশ্লেষণ ৪৲

জন্ম-শাসন
সন্তান-নিরোধ সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ৫৷৷০

প্রচ্ছদপট ও ভেতরের ছবি এঁকেছেন বিনয় বসু; মুখপাতে ভাস্কর সুনীল পালের মৃন্মূর্তির আলোকচিত্র। ব্লক করেছেন দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। ছেপেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পান ২০৯ নং কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীটস্থ লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস থেকে।

উৎসর্গ

আমার পুত্রকন্যাপ্রতিম
পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানবাসী
যত প্রতীক্ষাশীল ও প্রত্যাশাবান
প্রেমিক পিতামাতার হাতে পরম স্নেহে অর্পণ করলুম।

৭ই আষাঢ়, ১৩৫৫। গ্রন্থকার।

আমার

.....

.....কে

.....

উপহার দিলুম।

ইতি।

তারিখ .....

ক্রেতা ছাড়া পুস্তকের ভিতর কেহ দেখিতে পারিবেন না।

প্রধান বিষয়-সূচী

প্রথম।	প্রেম জমাবার নতুন মন্ত্র	....	১
দ্বিতীয়।	বীণা বেসুরো বাজে কেন	....	১২
তৃতীয়।	গরমিল হওয়ার কারণাবলী	...	২৭
চতুর্থ।	গরমিল হওয়ার আরো কারণ	....	৪৫
পঞ্চম।	আরো কারণ ও প্রতিকার	....	৬৩
ষষ্ঠ।	মিলন-বাঁধন অটুট্ কিসে	....	৮০
সপ্তম।	ঘর-সংসারের দু'চার কথা	....	৯৫
অষ্টম।	খাদ্যতত্ত্ব ও পাকশালা	...	১০৮
নবম।	নব জীবনের সূচনা	...	১৩১
দশম।	গর্ভকালীন কর্তব্য	...	১৪১
একাদশ।	প্রসবের জন্য প্রস্তুতি	...	১৫৩
দ্বাদশ।	প্রসবের তিনটি ক্রমিক অবস্থা	...	১৬৭
ত্রয়োদশ।	প্রসবের পর শিশু ও প্রসূতির পরিচর্যা		১৭৮
চতুর্দশ।	শিশুপালনের প্রথম পর্ব	...	২১৩
পঞ্চদশ।	অ্যাম্বুলেন্স ও হাসপাতালের ঠিকানা		২৩৫

এর মধ্যে প্রায় দেড়শো উপবিষয় ও সাধারণের অজ্ঞাত তত্ত্ব এবং সাতখানা ছবি আছে।

যুগল স্নেহ

ভাস্কর
শ্রীসুনীল পাল।

ওগো প্রেমিক পিতা ও মাতা

প্রথম আলাপন

প্রেম জমানোর নতুন মন্ত্র

তোমাদের বিয়ের পর এই প্রথম তোমাদের সঙ্গে দেখা !....

বিয়ের প্রাক্কালে তোমরা যে মন ও মনোভাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে, আজ তার মধ্যে নিশ্চয়ই এসেছে রূপান্তর ; এবং এই রূপান্তরের জন্যে মনোভব হচ্ছেন অনেকখানি দায়ী। 'মনোভব' হচ্ছে মদনের আর এক নাম। বিয়ের পরদিন থেকেই তোমাদের যুক্ত জীবনের পর্দায় প্রেমের তুলি দিয়ে মদনদেব নতুন রঙ্ চড়াতে সুরু করেছেন। আজ তোমাদের মুখে নতুন আনন্দের বাণী, বুকে নবীন আশার ঝলক, চোখে অমোঘ তৃপ্তির চারিমা !

বিবাহের অব্যবহিত পর থেকে নতুন পথে কিভাবে তোমাদের যাত্রা হবে সুরু, যাত্রাপথের পাথেয় হবে কি কি, পথের কোথায় ফোটে ফুল—কোথায় গজায় কাঁটার ঝোপ, কোথায় ডাকে পাখি—কোথায় ডাকে ফেউ, তা তোমাদের সোজা কথায় মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আমার নির্দেশ-মতো তোমরা এই নতুন পথে এসেছ এগিয়ে ; কোথাও তোমরা বাধা পাওনি—পথ হারাও নি। কিন্তু এ পথ তেমন ছোটো নয়, সমতল নয়, সোজা নয়,—এর সন্ধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা বড় সহজ নয়।

বিয়ের পরবর্তী সাধনা

এ পথ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে সমান নয়। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক দম্পতি—প্রত্যেক পতি ও পত্নী একই শিক্ষা, স্বভাব ও ঐতিহ্যের মূলধন নিয়ে বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করে না। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্রবৃত্তি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী সমান নয়। নানা বিষয়ে অল্পবিস্তর তারতম্য নিয়েই আমরা পতিপত্নীত্বের সুরভি-কাননে প্রবেশ করি। এই তারতম্যগুলি থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে বরদাস্ত করা, শুধু বরদাস্ত করা নয়—পছন্দ করা এবং পরস্পরের তারতম্যের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোই বিবাহ-জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে বড় সাধনা।

আপনাকে পর করা যতখানি শক্ত বলে' মনে হয়, তার চেয়েও বেশি শক্ত হ'ল পরকে আপন করা। তোমাদের আগেও বলেছি—এখনো বল্‌ছি, এটা ঈশ্বরকে পাবার সাধনার মতোই কৃচ্ছ্রসাধ্য! রাজ্যজয়ের চেয়েও কঠিন এই হৃদয়-জয়ের ব্যাপার। পবিত্র যজ্ঞাগ্নি-সম্মুখে অথবা পাদ্রী-ইমাম্-উকিলকে সাক্ষী রেখে দুটি অদেখা অজানা কিশোরকিশোরী বা তরুণতরুণী হাতে হাত মিলোলেই যে তাদের হৃদয় দুটি নিমেষে জোড়া লেগে যাবে—এমন কোন কথা নেই। এমন দুরাশা করাও বাতুলতা।

বিবাহের উৎসব, বিবাহের মন্ত্রমালা, বিবাহের স্ত্রী-আচার—এগুলি শুধু দুটি হৃদয়কে পাশাপাশি এনে তাদের যুক্ত হবার মুক্ত রাজপথে দাঁড় করিয়ে দেয়; বিবাহের অনুকূলে তারা দু' দণ্ডের তরে মনোরম যুক্তির পশরা তুলে ধরে। তারা হাস্য-লাস্য-গীতি-গন্ধের পরিবেশে অনুরক্তির তেল-সল্‌তে-প্রদীপ যোগায়; কিন্তু সে প্রদীপে অগ্নি-সংযোগের ভার পতিপত্নীর ওপর। অনেক সময় একের বা উভয়ের অসামর্থ্যে, অবহেলায় বা অজ্ঞতায় প্রদীপ জলে না; কিন্তু মন জলে, গৃহ জলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষণিকের তরে জলে উঠে একটা দম্‌কা বাতাসে

নিবে যায়! কোথাও নেবে নিজেরই বুক-থেকে-ঠেলে-বের-করা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে!

সুতরাং যে সব দিক থেকে বিবাহ-জীবনে ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি আসতে পারে, সেই সব দিকের সন্ধান নিতে হবে আর সাবধান হতে হবে তোমাদের। একের বা উভয়ের ছোটখাটো ত্রুটীবিচ্যুতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রেমের পদ্মাতীরে কেমন করে ভাঙন ধরায়, কেমন করে' একদিন সশব্দে পাড় ধ্বসে পড়ে, কেমন করে' সাজানো সংসার দেখ্‌তে দেখ্‌তে অতল তলে তলিয়ে যায়, তার সকরুণ ইতিহাস তোমাদের ভাল করে অধ্যয়ন করে রাখা দরকার। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো অতি-নিকট আত্মীয়ের বা বন্ধুবান্ধবীর সংসারে এরূপ দুর্ঘটনা ঘট্‌তে দেখেচ। কিন্তু কারণগুলো ভাল করে' নির্ণয় করার সুযোগ পাও নি; সুযোগ যদি পেয়ে থাক—তা' একতরফাই পেয়েছ। আজ পর্যন্ত হয়তো তোমাদের কেউ ভাবতেও পারনি যে, এমন বিয়োগ-বিধুর কালবৈশাখী একদিন তোমাদের কারো কারো দাম্পত্য জীবনেও দেখা দিতে পারে!

বিবাহ-জীবনে ব্যর্থতা কি কি কারণে ঘট্‌তে পারে, প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত কোন্ কোন্ ঘটনার পিঠে ভর্ করে' সুখের সংসারে ব্যথাভরা অশান্তি নেমে আসে, তা নিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ আলোচনা করতে চাই আমার বক্তৃতা-বৈঠকে। তারপর বিবাহ-জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা যাতে, সে সম্বন্ধে দীর্ঘতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। হেঁয়ালির প্রয়োজন নেই; এখানে স্পষ্ট করেই বলে যাই—সে সার্থকতা হ'ল পিতৃত্বে আর মাতৃত্বে। তোমরা অনেকেই হয়তো এই শুভ সংঘটনের তোরণসম্মুখে এসে দাঁড়িয়েচ। এর ভেতরকার সমস্ত তথ্য তোমাদের জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই আবার তোমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

বিয়ের কিছুদিন পরে

বিয়ের পর ছ'মাস, এক বছর, দেড় বছর বা বড় জোর দু'বছর দু'জনের জীবনে স্বপ্ন ও বাস্তব-মেশানো, রোমান্সের মাদকতা-জড়ানো, দেহেন্দ্রিয়-সর্বস্ব মিলনের শুধু একটানা খরস্রোত চলে। মন তখন থাকে বর্ষার বালুচরের মতো তলিয়ে। তারপর শ্রাবণের প্লাবন যখন যায় থেমে, ভরা ভাদরের দুরন্ত উচ্ছ্বাস যখন আসে স্তিমিত হয়ে, তখন দেহকে ছাপিয়ে ওপরে জেগে ওঠে মন। তখন জীবন, যৌবন ও মন এক সুতোয় গাঁথা হতে চায়। তখন রূপের পাশে গুণ এসে দাঁড়ায় এবং একের সঙ্গে অন্যের পাল্লা লড়ালড়ি হয়।

যারা বিয়ের দু' তিন বছর পরেও দেশবন্ধু কবি চিত্তরঞ্জনের সুরে সুর মিলিয়ে প্রিয়াকে সম্বোধন করে' গায়—

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্বাঙ্গে সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়!
তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি,
দুজনার মাঝে এক দীপ জেলে রাখি।....

তাদের আকাঙ্ক্ষাকে একটু সংযত করতে বলি। তোমাদের আগেও বলেছি, এখনো বলছি যে, রূপ দু'দিনের, গুণ চিরদিনের। তোমাদের দুজনার দেহের মাঝখানে অনঙ্গের সম্মোহন-প্রদীপ জালিয়ে রেখে পরস্পরকে চিন্‌বার ও ভালো করে পাবার যে সাধনা করছ, সে প্রদীপের তেল সারাজীবন সমানভাবে যুগিয়ে যাওয়া সোজা নয়। তা'ছাড়া সে প্রদীপ দু'জনার মাঝখানের ব্যবধান কখনো ঘোচাতে পারে না—বিবাহকে সর্বতোভাবে সার্থক ও সুন্দর করে

তুলতে পারে না। এখন থেকেই এ প্রদীপের আলোকে ধীরে ধীরে স্তিমিত করে' আনো।

দাম্পত্য প্রেমে অনঙ্গরঙ্গের মাত্রা

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বা একের তরফ থেকে অনঙ্গরঙ্গের মাত্রাধিক্য হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের সম্ভোগেচ্ছা ও কামাবেগ সমান নয়; যথেষ্ট তারতম্য আছে। একটি পুরুষের সঙ্গমেচ্ছা বিবাহের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত হয়তো প্রত্যহ জাগে, কোন কোন দিন হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার তিনবারও। আবার কোন পুরুষের জাগে একদিন অন্তর, কোন পুরুষের জাগে সপ্তাহে দু'দিন। মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। স্বভাবত তাদের কামেচ্ছা জাগে গড়্‌পড়্‌তা পুরুষের চেয়ে কিছু কম ঘন-ঘন। তবে পুরুষের চেয়ে রতি-ব্যাপারে তারা অল্পদিনের অভ্যাসে বেশ পারদর্শী ও পরিপক্ক হয়।

পুরুষরা সঙ্গমজীবনের প্রথম থেকেই যেমন আনন্দ পায়, স্ত্রীলোকেরা তা পায় না বটে। কিন্তু ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের অসীম এবং ব্যথার মধ্যে দিয়েই আনন্দ নিংড়ে বার করবার শক্তিও আছে তাদের মধ্যে অফুরন্ত। কিন্তু যাকে তারা ভালবাসে না এবং বেশ ভালো করে' ভালবাসে না, তাদের সঙ্গে সহবাসে তাদের ব্যথা-বোধের কালক্রম বাড়ে, মাত্রা কমে না। তোমাদের মধ্যে যদি এমন কোন স্ত্রীলোক থেকে যাক—যারা স্বামিসঙ্গমকালে এখনো ব্যথা পাও এবং বাহুত ইচ্ছা জাগলেও কার্যকালে যাদের কেমন একটা বীতরাগ মনের তলা থেকে গুম্‌রে কেঁদে ওঠে, তাদের বেশীর ভাগেরই অন্তরে যে স্বামীর প্রতি চার আনা ভালবাসাও নেই—এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

অন্তরে স্বামিবিরাগিণী এমন নারীও দেখেছি যাদের রতি-প্রারম্ভে আপনা-আপনি যোনিনালীর প্রাচীর ফুলে উঠে শক্ত হয়ে যায় এবং যোনিমুখে এমন পৈশিক আক্ষেপ হতে থাকে যে, ধ্বজ প্রবিষ্ট করানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এটা মানসিক বিদ্রোহের দৈহিক অভিব্যঞ্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। যাকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসে, তার কাছে তাদের সর্বদ্বারই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আপনা-আপনি। কোন কোন কূট-নীতিজ্ঞা চতুরা নারীকে দেখেছি মনের মধ্যে বিরাগের বাষ্প চেপে রেখে স্বামীর কামলীলায় সারা জীবন কেমন সহযোগিতা করে যায়! তারা মনোমত জীবনসঙ্গী না পেয়ে যেমন দুঃখু পায়, আবার তাকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে তেম্‌নি কিছু গর্বিত আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

যাহোক্, বিয়ের পর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তোমরা কিভাবে কাম-জীবন পরিচালিত করবে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি এ বৈঠকে করতে চাই না; কারণ আমার একাধিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা স্থানলাভ করেছে। কৌতূহলী হলে তোমরা আমার "নরনারীর যৌনবোধ" ও "প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান" বই দুখানা পড়ে দেখতে পার। পড়লে তোমরা কামজীবন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য ও সংবাদ জানতে পারবে, তোমাদের ব্যক্তিগত অনেক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত এর মধ্যে দেখতে পাবে।

স্বভাবসঙ্গত ব্যবহারিক প্রেমের যে নিরিখ্ তোমরা বই থেকে বা বন্ধুবান্ধবীদের কাছ থেকে জেনেশুনে স্থির করেছিলে, তোমরা কেউ স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে ঠিক সেই নিরিখ অনুযায়ী অথবা নিজেদের মন-গড়া আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার হয়তো পাচ্ছ না। সেই নিরিখ বা আদর্শের সঙ্গে ষোল আনা কিংবা পউনে-ষোল আনা মিল আছে, এমন স্বামী বা স্ত্রী মর্ত্যে তো পাওয়া যায়ই না, স্বর্গেও দুর্লভ।

বিবাহের পর কিছু দিন পর্যন্ত একের কাছে অপরের খুব বড় ত্রুটি

বলে গণ্য হয়—তার সহবাসে অনিচ্ছা, সুস্পষ্ট বিরাগ অথবা মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ। একের অতিবেগের সঙ্গে অন্যের মন্দবেগের খাপ খাওয়ানো বড় মুশ্‌কিলের ব্যাপার বলে' মনে হয়। কিন্তু মধ্যবেগের খাপে একজন যদি নেমে আসে এবং আর একজন যদি উঠে আসে, তাহলে ব্যাপারটা দু'জনের পক্ষেই সহজসাধ্য হতে পারে। নিজের কামজীবনে এইটুকু পরিবর্তন যে আনতে না পারে, তার কিন্তু বিয়ে করা উচিত হয় নি।

স্বামীর কামগত ও দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো দোষত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে ঢেকে নেবার একটা ঐতিহ্যগত ক্ষমতা আমাদের দেশের মেয়েদের ছিল; যাদের সে ক্ষমতা ছিল না, তারা অন্ততপক্ষে প্রসন্নতার মনোজ্ঞ অভিনয় করতে পারত। আজকাল আমরা মেয়েদের মধ্যে এই দুটি গুণেরই ব্যত্যয় ঘটেছে দেখ্‌ছি। এর কারণ একাধিক। মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ, তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাদের আত্মসম্মানবোধের জাগৃতি, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনীয়তা···ইত্যাদি।

পত্নীর দোষত্রুটি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিল পুরুষদের চিরকালই কম। তার প্রধান কারণ এক স্ত্রী মনের মত না হলে তাকে বর্জন করে' স্বচ্ছন্দে অন্য স্ত্রী আনা চল্‌ত। সংসারে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাওয়ের অভিনয় করার তাদের শক্তি ছিল না, কারণ সে শক্তি-চর্চার আবশ্যকতা ছিল না তাদের। আজকাল একাধিক কারণের প্রভাবে গড়্‌পড়তা বাঙালী যুবকের এই দু'রকমের শক্তিই পূর্বাপেক্ষা কিছু বেড়ে গেছে দেখ্‌ছি।

ভালবাসার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

বিবাহগণ্ডীর ভেতরেই হোক্ আর বাইরেই হোক্, কাউকে ভালবাসা মানে—তার দোষ ও গুণ সমেত একটা অখণ্ড সত্তাকে

ভালবাসা। কারুর দোষগুলো বেছে গুণগুলোকে পছন্দ করা হ'ল ভালবাসার ব্যাপারে ব্যবসাদারি বাছাই-বুদ্ধি টেনে আনা, ভালবাসার পাত্রকে খণ্ডিত করে দেখ্‌তে শেখা, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে—তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করা। যার কাছে প্রিয়পাত্র বা পাত্রীর বিচ্যুতিগুলো তার গুণরাশি ছাপিয়ে বারে বারে ধরা দেয় ও মনকে পীড়া দেয়, তার কাছে প্রিয়পাত্র বা পাত্রীর কদর রীতিমত কমে এসেছে বলে মনে করতে হবে। দু'দিন পরেই অশৌচান্তে মৃৎপাত্রের মতো সে পরিত্যক্ত হতে পারে।

স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের গুণগুলোকে বড় করে' দেখ্‌তে শিখ্‌লে তাদের দোষগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নক্ষত্রগুলো সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়ো হয়েও দিনের বেলায় সূর্যের সমুজ্জ্বল কিরণে অপ্রকাশ হয়ে থাকে। নিজের গুণের গর্ব না করে যদি তোমরা নিজের দোষগুলো সম্বন্ধে সচেতন হও এবং সেগুলোকে দমন করতে যত্নবান হও, তাহলে সংসারে কখনো অশান্তি আসবে না—দুজনের ভালবাসায় ভাঁটা পড়বে না জেনো।

সঙ্কটময় পরীক্ষার কাল

দোষেগুণে মানুষ—সেটা আমরা সবাই জানি; কিন্তু মানুষের দোষটাকে বড়ো করে' দেখাই মনুষ্যত্ব নয়। বিয়ের এক, দেড়, দু'বছরের মধ্যেই প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর মনে পরস্পরের দোষগুণ বিচার করে' দেখার একটা প্রবৃত্তি আপনা-আপনি জাগে। নেশার ঘোরে যে লোক সারারাত্র কল্পনার রঙীন্ পাখা মেলে আকাশে উড়্‌ছিল, সে যেন ভোরের হাওয়ায় প্রকৃতিস্থ হয়ে সলজ্জ চকিত দৃষ্টিতে নিজেকে ঘরের মেঝেয় শায়িত দেখে; কঠিন মৃত্তিকার পাদ-ভূমিতে দাঁড়িয়ে সে যেন নিজের পরিবেশের মূল্য অবধারণের চেষ্টা

করে। এই সময়টা কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার কাল, সরকারী আফিসে probationary period অন্তে departmental examination দিয়ে চাকুরিতে পাকা হওয়ার সময়!

তাই এই সময়টির আগে থেকেই তোমাদের সাবধান হতে বলি। খবর্দার, তোমরা কেউ যেন তোমাদের মনের মালিন্য আর ক্লেদ নিয়ে প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে হাতে-নাতে ধরা প'ড়ো না। এই সময়টা তোমাদের রূপ যৌবন স্বাস্থ্য সঙ্গমকুশলতা সব কিছুই অন্তত সাময়িকভাবে পটভূমিকার দিকে যাবে সরে! বিভিন্ন গুণ তাদের যথোপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এগিয়ে আসবে সামনের দিকে।

কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের *L'Accord Conjugal* নামক বইয়ে পড়েছি—তিনি এক জায়গায় লিখ্‌ছেন, "সব দিক দিয়ে ঠিকমতো বিবেচনা করে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, বিয়ের প্রথম দু'তিন বছর প্রেমের আফিসে স্বামী ও স্ত্রীর যে শিক্ষানবিশী চলে, সেইটাই হ'ল তাদের জীবনের কঠিনতম শিক্ষার ক্রম। স্বামী হওয়া বা স্ত্রী হওয়া একটা উচ্চস্তরের পেশা; প্রত্যেককেই এই পেশার কায়দাকানুন্ রীতিমত যত্ন করে' অধিগত করতে হয়। এই বৃত্তি শিখতে যে কষ্ট, তার তুলনায় লাভ অনেক বেশী।"

বিবাহ-জীবনরূপ পেশায় খানিকটা বস্তুগত লাভ তো আছেই, কিন্তু ভাবগত লাভ তার চেয়ে অনেক বেশী আছে। এই পেশাটিকে আধাআধি অংশের কারবার বললে বোধহয় আরো সমীচীন হয়। কিন্তু লাভের অংশ কে অর্ধেকের বেশী পেল বা কে কম পেল, তা নিয়ে চুল-চেরা বিচার করতে বসে না কেউ, এই নিয়ে ঝগড়া করে' আদালতে ছোটে না কেউ। কেউ নিজের বুদ্ধির দোষে কারবারকে ঋণগ্রস্তত করবার উপক্রম কর্লে আর একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার

মমতা-বুদ্ধি-বিবেচনার ঐশ্বর্য নিয়ে। এ ব্যবসায়ে মূলধন ভালবাসা, লাভ আত্মতৃপ্তি।

এতে শুধু দিতে হয়, চাইতে নেই—পাওয়ার আশা করতে নেই। যদি কিছু পাওয়ার আশা থাকে—তা আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ থাকবে অন্য অংশীদারের আনন্দের মুখাপেক্ষী হয়ে। তোমাদের দাঁড়ি-পাল্লার যে পাল্লায় যতখানি স্বার্থপরতা রাখবে, ঠিক তেমনি মাত্রার পরার্থপরতা অন্য পাল্লাটিতে রাখতে চেষ্টা করো। তাহলে দেখবে বিয়ের কিছুকাল পরের প্রথম আগড়টি তোমরা সসম্মানে ও অল্পায়াসে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক গি দে মোপাসাঁর কথা কয়টি মনে পড়ছে এখানে—"When two people love each other nothing is more imperative and delightful to them than giving ; to give always and everything ; one's thoughts, one's life, one's body and all that one has ; and to feel the gift and to risk everything in order to be able to give more, still more."

বিয়ের পর পরস্পরের দেহের সকল রহস্যদ্বার উত্তীর্ণ হয়ে আজ মনের রংমহালের প্রবেশপথের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তোমরা কে কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে, তোমরা এতদিন শুধু দেওয়ার সাধনায় প্রমত্ত ছিলে ; যা পেয়েছ তা না চেয়েই পেয়েছ অথবা অল্প চেয়ে আশার অতিরিক্ত পেয়েছ ; তোমরা প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছ আগের চেয়ে ; তোমাদের আত্মার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছ তোমাদের প্রেমাস্পদের মধ্যে ? যারা অকপটে একথা বলতে পাচ্ছ না, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত ও সন্দিহান্ হয়ে পড়লুম আমি।

তবু নিষেধ করি হাল ছাড়তে তাদের। কারণ বহু ক্ষেত্রে

দেখেছি একটি অথবা দুটি সন্তান হলে তবে স্বামিস্ত্রী পরস্পরকে ভালো করে' চিন্‌তে পারে—নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পারে—দুজনার মাঝখানে বিরোধ ও বিভেদের পাঁচিল ভেঙে ফেলতে পারে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে এখনো যারা স্বামিস্ত্রীতে মনেপ্রাণে মিলতে পারনি, জীবনে কখনো মিলতে পারবে না বলে ধারণা করে' নিয়েছ, তাদের আরো কিছু দিন আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে বলি।

যে সব দেশে বিবাহবিচ্ছেদের প্রথা আছে, সেখানে সন্তান-বঞ্চিতদের মধ্যে যত বিবাহবিচ্ছেদ হয়, সন্তানবান ও সন্তানবতীদের মধ্যে ততটা হয় না এবং বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই মন-কষাকষি ও ছাড়াছাড়ির হিড়িক বেশী দেখা যায়। সুতরাং যে সব দম্পতির মধ্যে অবনিবনাও দেখা দিয়েছে, তারা একটুখানি সাম্‌লে চল, একটুখানি ধৈর্য ধর ; নিজেদের কোথায় গলদ্ তা বুঝতে শিখে ও নিজেদের যথাসাধ্য সংশোধন করবার চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে চল পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের তীর্থ-সঙ্গমের দিকে। সেই পবিত্র তীর্থনীরে স্নান করে' তোমরা দুটিতে দুটিতে হয়তো নূতন করে' মিলনমন্ত্র পাঠ করবে, যুক্ত জীবনবীণা নূতন তানলয়ে বাঁধ্‌বে !

দ্বিতীয় আলাপন

বীণা বেসুরো বাজে কেন?

বিয়ের অব্যবহিত বা কিছুদিন পরে দাম্পত্য জীবন-বীণা বেসুরো বাজে কেন—এর উত্তর অবশ্য খুব সংক্ষেপে দেওয়া চলে না। এর কারণ একটা নয়, দু'টো নয়, দশটা-বিশটা, কি তার চেয়েও বেশী। কয়েকটি প্রধান কারণ নিয়ে তোমাদের কাছে আজ আলোচনা করব। এই সব কারণ থেকে তোমাদের সকলকে দূরে থাকতে বলি। যাদের জীবনে এই সব কারণের দু'টি একটি কুশাঙ্কুরের মতো সবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের বলি কালবিলম্ব না করে' নির্মমভাবে ওর মূলোৎপাটন করতে।

কতকগুলি সামাজিক কারণ

নবদম্পতিদের মধ্যে অবনিবনাও ও অসন্তোষের কারণগুলি আমরা গোড়া থেকে অনুসন্ধান ও অনুসরণ করে' আসি। আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারে একটা মস্ত বড় গলদ ছিল, এখনো সে গলদ পল্লীগ্রামে পউনে ষোলো আনা এবং শহরে আট আনা রকম বজায় রয়েছে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে। সে গলদটা হ'ল বিয়ের দিন পর্যন্ত বর-বউয়ের দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা কওয়ার সুযোগ না থাকা; সম্বন্ধ পাকা করা ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের কথা কইবার কোন অধিকার না থাকা; অর্থাৎ বর-বউ দুজনকেই পরের মুখে ঝাল খেতে হয়।

তা ছাড়া হিন্দুসমাজে নানা জাতি ও নানাস্তরের মধ্যে অল্পবিস্তর বর-পণ ও বধূ-পণের রেওয়াজ আছে। মুসলমান সমাজে দেন্‌মোহরের প্রশ্ন আছে। পাত্রপাত্রীর রূপ-গুণ-কুল-শীলের বিচার ছাপিয়ে প্রায়

ক্ষেত্রে কৌষ্ঠির বিচার ও পণের পরিমাণই এদেশে বড় হয়ে উঠেছে, এখনো হয়। তা ছাড়া কৌলিন্য-প্রথার অত্যাচার একদিন নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছিল। আজো সে প্রথা স্খলিত-দন্ত গলিতনখর হয়ে বেঁচে আছে।

অতি-বড় রূপসী কন্যাও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আজীবন কুমারী থাকৃত শুধু গরিবের ঘরে জন্মাত বলে' অথবা শ্রেণী-থাক্-মেল-গোত্র-প্রবর-পর্যায়ে সামঞ্জস্যযুক্ত পাত্র পেত না বলে'। আজকাল এ অচলায়তনের দেওয়াল অনেকখানি ভেঙে পড়েছে। অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য কারণে পাত্রপাত্রীর বিয়ের বয়সও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিয়ের পূর্বে পাত্রপাত্রীর পরস্পরকে দেখা, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা কিংবা সুষ্ঠুভাবে পরস্পরের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়ার রেওয়াজ এখনো এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। আজকাল ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে বিবাহার্থী যুবক বিবাহযোগ্যা এক বা একাধিক কন্যাকে তার পিত্রালয়ে গিয়ে সবান্ধবে নিজে দেখে আসে এবং তাকে দেখে পছন্দ হয়েছে কিনা তৎসম্বন্ধে মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, ঠাকুরমা প্রভৃতির কাছে মতপ্রকাশ করতে পারে। মেয়েরা সে অধিকার আজো আদায় করতে পারেনি সমাজপতিদের দরবার থেকে। সেয়ানা হয়ে ও বি-এ এম-এ পাশ করেও, রুচি ও কৃষ্টির উচ্চতম স্তরে উঠেও, তারা আজীবনের সঙ্গী নির্বাচনে নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে না। বিয়ের পর যদি তাদের কারো স্বামী পছন্দ না হয়, তার আদর্শের সঙ্গে রুচির সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে স্বামী যদি কোনমতেই তাল রেখে না চলতে পারে, তাহলে কাউকে খুব বেশী দোষী করা চলে না। স্বামীর যদি স্ত্রীকে পছন্দ হয়, তাহলে স্ত্রীরও স্বামীকে পছন্দ হওয়া স্বাভাবিক ও সমুচিত—এটা আমরা গায়ের জোরে আপ্ত-বাক্যে পরিণত করে ফেলেছি। কিন্তু এর মধ্যে প্রতারণা আছে অর্ধেক, অনুমান আছে বাকি অর্ধেক।

সেকালে বিবাহদানের মুখ্য উদ্দেশ্য

কম বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রেমবোধ, পছন্দবোধ ও রুচিবোধ আছে—এটা আমরা নব্য মনোবিজ্ঞানের নতুন চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে পেয়েছি। তবে সেটা প্রখর, সূক্ষ্ম ও বহুদর্শনসিদ্ধ হয় না। যখন শিশু বা বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তখন পাত্র বা পাত্রীর স্থূল প্রবৃত্তিমূলক পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে' বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা অবশ্য নানা দিক্ দিয়ে অসুবিধাজনক ও অসঙ্গত ছিল। সেই জন্য পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকগণ ছেলেমেয়ে দেখে পছন্দ করতেন, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতেন। তবে আগেই বলেছি যে, পুরোহিত, পাঁজি, পণ, কোষ্ঠি ও কুল বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করা ব্যাপারে প্রধান নিয়ন্তা ছিল। মেয়ের রূপ-গুণ-লক্ষণাদি ছিল গৌণ বিবেচনার বস্তু।

যাহোক্, সেকালে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার মধ্যে পিতামাতার বোধ হয় লোকাচারসম্মত আসল উদ্দেশ্য ছিল—পুত্রের কামোপভোগের জন্যে যতটা না হোক, তার বংশধর সৃষ্টির জন্যে সৎবংশের একটি নীরোগ বিশুদ্ধ পাত্রীকে যোগাড় করে আনা, যে কন্যা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্নকে জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত বলে' গ্রহণ করতে শিখ্‌বে, যে মুখ বুজে সংসারে দাসীত্ব করবে, যে স্বামীকে ষোলো আনা শ্রদ্ধা করবে—ভয় করবে, কিন্তু প্রেমের বাঁধনে শক্ত করে বাঁধ্‌তে পারবে না। ভরা যৌবনে পদার্পণ করে, বিগত যুগের স্বামিস্ত্রী পরস্পরের প্রতি একটু বেশী আসক্ত, একটু বেশী মনোযোগী হলেই কর্তাগিন্নীর মাথায় পড়্‌ত বজ্রাঘাত!

বাল্যের সেই রঙীন্ স্বপ্নবিলাসিনী পতিসঙ্গসুখাভিলাষিণী কিশোরী নববধূটির উপর শাশুড়ি ধীরে ধীরে সংসারের জোয়াল চাপিয়ে দিয়ে শাস্ত্রবচন শাসনবাক্য আর গরম খুন্তির ছ্যাঁকার সঙ্গে সঙ্গে নারী-

জীবনের পরমার্থ দিতেন শিখিয়ে। ঊষা থেকে মধ্যরাত্র পর্যন্ত ঘোমটার শ্বাসরুদ্ধকর ঘেরাটোপে সারাদিন ছুটোছুটি করে' সে শ্রান্ত-কলেবরে স্বামিশয্যাপার্শ্বে শয়নের ছুটি পেত। বেচারা স্বামী প্রেয়সীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আপন দুরদৃষ্টকে ধিক্কার পাড়্‌তে পাড়্‌তে পড়্‌ত ঘুমিয়ে, স্ত্রীরও ক্বচিৎ প্রবৃত্তি হ'ত স্বামীর কানে কানে গাইতে—'তোমারি চোখে লাগ্‌ল ঘুম আমি যে মরি বেদনাতে।'....

সেকালের দাম্পত্য প্রেমের যে চিত্র আমরা কল্পনার রঙে ভাবাতিশয্যের রস মিশিয়ে সচরাচর অঙ্কিত করি, সেটা অনেকখানি অতিরঞ্জিত। একান্তে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করবার—'প্রথম প্রণয় প্রভৃত বিনয় প্রাণ ভরে' সুধা ঢেলেছি' এই কথা বলে গর্ব করবার সুযোগ সেকালের সামাজিক ও পারিবারিক শাসন কাউকে দিতে চাইত না। একটু স্বামিসোহাগের বাড়াবাড়ি, একটু নিভৃতে বিশ্রম্ভালাপ, একটু আয়াস-মাখা স্বাতন্ত্র্য-লাভের প্রয়াস—সেকালের শাশুড়িননদীরা বিষদৃষ্টিতে দেখতেন আর লৌহমুষ্টিতে দমন করতেন। তার প্রত্যক্ষলব্ধ ফল কি হয়েছিল, তা' বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পাতায় কিছু পরিমাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে; আর সুদূরপ্রসারী ফল কি হয়েছে, তার সাক্ষ্য বহন করছি আমরা ও বহন করছে আমাদের সন্তানসন্ততিরা।

তুলাদণ্ডের দুইদিকে—স্ত্রী ও রক্ষিতা

প্রেম জিনিসটিকে আমাদের প্রাচীন মহাজনরা অলৌকিক ফানুস্ করে, আকাশে উড়িয়ে মানুষের নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছেন; নতুবা স্বামী-স্ত্রীর বুকের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে পরকীয়ার পাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন গীতিকাব্যের প্রাণবিমোহন পদ্মবন সৃষ্টি করতে। সেকালে বহু যুবক বহু প্রৌঢ় তাই গৃহের বাইরে এক বা একাধিক নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর রক্ষিতা পুষত এবং তাদের সঙ্গে নিরঙ্কুশভাবে 'প্রেম'

করত। মাতাপিতা ও সংসারের প্রতি একান্ত কর্তব্যবিমুখ এবং বিশেষ বেহিসাবী না হলে সমাজ তার এই কামকলুষিত অনাচারকে প্রশ্রয় দিত সানন্দে! এমন কি কোন বিত্তশালী সমাজপতি যদি কোন রক্ষিতাকে এনে আপন গৃহে আপন পত্নীকন্যার কক্ষপার্শ্বে ঠাঁই দিতেন এবং তার গর্ভজাত সন্তানদের আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতেন, তাহলে পণ্ডিতপ্রবর কুলপুরোহিতগণ সাধুবাদ দিয়ে তাঁর জন্য দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে লজ্জিত হতেন না। রক্ষিতা হল ভালবাসার জন্য, পত্নী হল সংসারে সেবাবৃত্তির জন্য।

এই প্রসঙ্গে পার্ল্ বাকের 'গুড আর্থে'র একটা জায়গা মনে পড়্ছে। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বৃদ্ধ ওয়াঙ্ লুঙ্ তার সদ্যো-বিবাহিত পুত্রকে তিরস্কার করে' বলেছে, "You have grown fond and too fond of your wife, and it is not seemly. It is not meet for a man to love his wife with a foolish and overweening love as though she were a harlot". (p. 298). বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে লক্ষ লক্ষ ওয়াঙ্ লুঙ্ বেঁচে ছিল, আজো শত শত বেঁচে আছে।....

দিকে দিকে দেখ্তে পাচ্ছি মধ্যযুগের রুদ্ধকণ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমের স্বাধীনতা-লাভের বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। পুরাকালের বৈদিক বিবাহের ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পাই গান্ধর্ব বিবাহের সঙ্কোচহীন নূপুরনিক্কণ। গান্ধর্ব বিবাহ আর স্বয়ম্বর-প্রথা একটু রূপ বদ্লিয়ে এযুগে ফিরে এসেচে love-marriage, civil marriage, তিন আইনের বিয়ে, অসবর্ণ বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, অগম্যা বিবাহ প্রভৃতি নূতন দেশী-বিদেশী নামে।

পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি, পৃথিবীর কোন রকমের বিয়ের আইনকানুন ও অনুষ্ঠানই ত্রুটীশূন্য নয়। যে রকমের বিয়ের

মধ্য দিয়েই যুবকযুবতীরা মিলিত হোক না কেন, তাদের বিবাহজীবন বিড়ম্বিত হতে পারে—একজন বা দু'জনের দোষে।

বিবাহজীবনে কোন পতি বা পত্নীকে অথবা উভয়কে অসুখী হতে দেখ্লে, আমরা তাদের দুজনকে যতখানি দোষ দিই ততখানি দোষ বিবাহের একটা বিশিষ্ট ধরণকে দিই না। উচিতও তাই। যে মেয়ে বা যে ছেলে হিন্দু হয়ে ও পাত্র বা পাত্রী-নির্বাচনে সামান্য স্বাধীনতা পেয়ে বিয়ের কিছুদিন পরে বিবাহজীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বীতশ্রদ্ধার বটবীজ তার নিজের অথবা তার স্ত্রীর চরিত্রের মধ্যেই (অথবা অল্পবিস্তর দু'জনের মধ্যেই) লুকিয়ে রয়েছে। দোষ যদি তার একার হয়, তাহলে সে খৃষ্টান হয়ে বিয়ে করলেও সুখী হতে পারত না, মুসলমান হয়ে বিয়ে করলেও দু'দিন বাদে হাঁফিয়ে উঠ্ত। স্বর্গের দেব বা দেবীও এই শ্রেণীর তরুণতরুণীর ঘরে এসে তাদের তৃপ্তি ও শান্তি দিতে পারে না।....

নববধূর পারিবেশিক অসুবিধা

সাধারণত বিয়ের পরদিন থেকেই আমাদের দেশের বহু বধূর মন ভাঙ্ত—আশা নিব্ত, যখন তার রূপ ও বয়স এবং অলংকার-বরসজ্জাদির গুণ ও পরিমাণ শ্বশুরালয়ের অন্দরমহলে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হ'ত। এই নিয়ে অল্পবিস্তর খোঁটা তাকে খেতে হ'ত তার প্রৌঢ়কাল অথবা শাশুড়ি-ননদ-জা-জাউলিদের জীবিতকাল পর্যন্ত। এই সঙ্গে যদি স্বামীপ্রবর প্রকাশ্যে বধূ ও তার পিত্রালয়ের নিন্দাবাদে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দিত, তাহলে নিশীথশয়নে হাজার তৃপ্তি পেয়েও বউয়ের মনে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্বচিৎ ভালো করে দানা বাঁধ্তে পারত। এমন ঘটনা আজকালকার বাজারেও ঘট্তে পারে এবং ঘটেও।

স্ত্রী যেমন স্বামীর সুমুখে শ্বশুরশাশুড়ির নিন্দা করলে তার মনে ব্যথা লাগে—ক্রোধ জাগে, স্বামী তেমনি স্ত্রীর সুমুখে তার পিতামাতার পরিবাদ করলে তার মনেরও একই অবস্থা হয়। এ কথাটা অনেক স্বামীই ভুলে যায়। কোন কোন অতি-ধীরস্বভাবা স্ত্রী প্রকাশ্যে স্বামীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করলেও মনে মনে তার ওপর বেজায় চটে এবং পাকেপ্রকারে স্বামীর অশিষ্টতার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। তোমাদের মধ্যে কারো এ অভ্যাস বা প্রবৃত্তি থাক্‌লে তাকে সাবধান করে দিই। স্ত্রীই যদি তার নিজের বাপ, মা, ভাই বা বোনের বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ প্রকাশ করে, তখন স্বামী বরং তাতে সহানুভূতি প্রকাশ করবে, নচেৎ অবস্থা বুঝে সেই অভিযোগের গুরুত্বকে হাল্কা করার সপক্ষে যুক্তি যোগাবে।

স্ত্রীদেরও বলি স্বামীর পিতামাতা ভাইবোনের কারোর বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ না থাক্‌লে, তা নিয়ে স্বামীর কাছে হৈ-চৈ করবে না—মুখে অনল ও চোখে জল নিয়ে অনশন-ধর্মঘটের ভয় দেখাবে না। তাদের ছোটখাটো অযত্ন, পীড়ন ও ত্রুটি যথাসাধ্য সহ্য করে চল্‌বে। স্বামী যদি তোমাদের দিকে থাকে, তোমাদের নিত্যকার সাংসারিক সুখদুঃখদ্বন্দ্ববিসম্বাদে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহলে তোমরা শ্বশুরবাড়ির অন্য সকলের অবহেলা পেয়ে রোষচঞ্চল হতে যাবে কেন ?

স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহে পার্থক্য

মনে রাখ্‌বে যে, স্বামী বিয়ে করে একটি স্ত্রীলোককে ; আর স্ত্রীলোক বিয়ে করে একটি পুরুষকে এবং তার সমগ্র পরিবারকে। সেইজন্যে আমার মতে, ভাবী বধূর কুলশীলস্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে যতখানি সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন, তার চেয়েও ভাবী স্বামীর কুলশীলস্বভাব-

চরিত্র সম্বন্ধে আরো নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। আরো নেওয়া উচিত—শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাশুর-দেওর-জা-জাউলি-বিধবা ননদদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব। যে শ্বশুরশাশুড়ি পুত্রবধূকে নিজেদের সংসারের একজন বলে' এবং অপরিহার্য অংশীদার বলে' গোড়া থেকে মেনে নিতে পারেন না, তাঁরা পুত্রবধূর শ্রদ্ধা তো কখনো পানই না, অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেরও শ্রদ্ধা হারান। এই শ্রেণীর শ্বশুর-শাশুড়িরা কেউ কেউ শেষ বয়সে পুত্র-পুত্রবধূদের হাতে দারুণ অবহেলা ও পীড়ন সহ্য করেন। যেমন বীজ পুতবে তেমনি তো ফসল হবে! স্বামি-শ্বশুরের সংসারে যে-বউরা গোড়া থেকে বিশ্বাস, স্নেহ ও ভালবাসা পায়, তারা মনে মনে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট্ করলেও মুখ ফুটে বল্‌তে পারে না ; তাদের নবলব্ধ কর্তব্য-ভার পিত্রালয়ের বিরহকে অনেক সময় অনেকখানি প্রশমিত করে' দেয়।

বউয়ের বাপের বাড়ি

বাপের বাড়ী যাওয়া নিয়ে শ্বশুরবাড়ীর গুরুজনদের সঙ্গে এবং স্বামীর সঙ্গে বিয়ের পর বহুদিন পর্যন্ত বউদের মন-কষাকষি, ঝগড়া-ঝাঁটি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভাব চল্‌তে থাকে। অবশ্য যাদের বাপের বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নয় অথবা যেখানে মমত্বশূন্য বিমাতা আছেন অথবা মাতাপিতা মৃত ও ভ্রাতা-ভ্রাতৃজায়ারা সহানুভূতিহীন, তারা পিত্রালয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে কদাচিৎ। শুধু আমাদের দেশের নয়, জগতের সব দেশেরই স্বামীরা মনে করেন—বিবাহ-মন্ত্রের মহিমায় যখন চার হাত এক হয়ে গেল, তখন দুইপ্রাণ জোড়া লাগ্‌তে আর বাকি নেই ; অর্থাৎ বউ তার বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবী সবাইকে একদিনে মন থেকে মুছে ফেলে স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল, তার বাল্যকৈশোরের স্নেহপ্রীতির সব সুমধুর স্মৃতির

পসরা সে পায়ের তলায় মাড়িয়ে ও গুঁড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করল। ভুল!

যে ছেলেটি তার পিত্রালয় ছেড়ে কোন বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে' শ্বশুরবাড়িতে ঘর-জামাই থাকতে আসে, সে যেমন তার আত্মীয় ও অতীতকে ভুলতে পারে না, মেয়েরাও তেমনি সারাজীবন তাদের পিত্রালয়ের কথা মনে রাখে। মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'ল—পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের স্মৃতি আর প্রীতির দ্বন্দ্ব। রাজার ঐশ্বর্য ঘেরা সংসারে দেবোপম স্বামী লাভ করেও মেয়েরা আজীবন তাদের কাঙাল বাপ-মা-ভাই-বোনকে মনে রাখে এবং তাদের দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে পাগল হয়। কোন নারীই তার স্বামীর ষোলো আনা আপন হয় না কখনো—একথা অবুঝ আত্মসুখসর্বস্ব স্বামীদের বার বার মনে করিয়ে দিই।

পত্নীরা স্বামী ও তার অনাত্মীয়দের স্নেহপ্রেমে অভিষিক্ত হয়ে যে কী দো-টানার মধ্যে পড়ে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না; আর বুঝতে পারে ঘর-জামাইরা অনেকখানি। শ্বশুরবাড়ি নতুন আসার পর থেকে যে স্বামী তার পত্নীর পিত্রালয়ে গমনের পথে নিজের আসন্ন বিরহ বা সংসারে ঘোর অসুবিধার অজুহাত তুলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সে জীবনে প্রকাণ্ড ভুল করে। নবীনা পত্নী স্বামী ও তার পরিবারকে যখন আপন করার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে মনে মনে আশা করে যে, স্বামীও তার পত্নীর পিত্রালয়ের প্রতি অনেকখানি তারই মতো মমত্ববোধের অধিকারী হয়ে উঠবে এবং পত্নীর এই স্বাভাবিক ও দুরত্যয় দুর্বলতাকে সে সুমিষ্ট অনুকম্পার চক্ষে দেখবে।

স্বামীদের বলি, নবীনা স্ত্রীদের পিত্রালয়ে যাওয়ার আবদারকে উপেক্ষা ক'রো না, নৈরাশ্যমণ্ডিত ক'রো না শ্বশুরবাড়ির অতিভক্তও

হ'য়ো না, আবার সামান্য ত্রুটিতে তার প্রতি অতি বিরক্তও হয়ো না।....খবরদার, মায়ের সামনে শাশুড়ি-শালী-শালাবউদের আদর-যত্নের রান্নাবান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রো না। বউ নিয়ে বেশীদিন শ্বশুরমন্দিরে বাস ক'রো না। এজমালি সংসারে-শালাশালীদের এনে রেখে বেশীদিন আপ্যায়িত ক'রো না।

বিয়ের পর অন্তত একটা বছর বউদের ইচ্ছার ওপর তাদের বাপের বাড়ি যাওয়া ও থাকার ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে। কেমন ?....একটা গাছে জোড়-কলম বেঁধে চারা জন্মাতে বছর খানেক লাগে, আর একটা নতুন পরিবেশের মধ্যে একটা তরুণ প্রাণকে খাপ্ খাওয়াতে যদি বছর খানেক কি তার চেয়ে কিছু বেশী সময় লাগে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

একটি বা দু'টি সন্তান হলে প্রায় সকল স্ত্রীরই বাপের বাড়ি যাওয়ার নেশা কমে যায় (অবশ্য কাটে না)। তখন তারা মাঝে-মাঝে পিত্রালয়ে গেলেও সেখানে বেশীদিন থাকতে চায় না। তার কারণ, তখন তাদের স্বামীর সংসারে আগেকার চেয়ে অনেক বেশী মন বসেছে। তখন তাদের মনকে আর একটা সুবুদ্ধিসঞ্জাত চক্ষুলজ্জা এসে চেপে ধরে ; পাড়া-প্রতিবেশীরা পাছে না মনে করে—মেয়েটা যখন এতদিন বাপের বাড়ি রয়েচে, তখন হয় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে' এসেচে, নয় ওর স্বভাবদোষে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনিবনাও হয় না, নয় শ্বশুরবাড়ির অবস্থা হয়তো পড়ে' এসেচে....।

চেষ্টা ক'রো নিজে বউকে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে এবং সঙ্গে করে' নিয়ে আসতে। এক, দেড়, দু'বছর পরে, এক প্রসবের জন্যে যাওয়া ছাড়া, শুধু দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্য নিয়ে যাওয়ার দরকার হ'লে, বউকে যে যাত্রায় সঙ্গে করে' নিয়ে যাবে, সেই যাত্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পার তো খুব ভালো হয়।

ছিটেফোঁটা বিরহের মূল্য

এর আগের বারে বিয়ের প্রাক্কালে তোমাদের দু'দলকেই একটা-কথা বলেছি, মনে আছে বোধ হয় ? বলিনি যে, মাঝে মাঝে একটু আধটু অল্পস্থায়ী বিচ্ছেদ, ক্ষণভঙ্গুর বিরহ, ছোটখাটো মান-অভিমান দাম্পত্য প্রেমকে সুদৃঢ় করে—উপভোগ্য করে—সঞ্জীবিত করে ? যাদের মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সর্দিকাশি জ্বর কিংবা পেটের অসুখ হয়, যারা মাসে এক আধ দিন উপুস করে, তাদের বড়-একটা শক্ত অসুখ হয় না। সুতরাং যদি পার তো ভালো মনেই বউদের মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি পাঠিও (অবশ্য অভিভাবক থাকলে তাঁদের মত নিয়ে) ; নচেৎ ক্ষুব্ধমনে অভিমান ভরেও পাঠাতে পার—আপত্তি নেই। পরখ করে' দেখ না—তোমার কাছে ফিরে আস্‌বার জন্যে, তোমাকে কাছে টান্‌বার জন্যে সে আকুলি-বিকুলি করে কিনা ! মেয়েদের দেহ পাওয়া যায় গায়ের জোরে, মন পাওয়া মনের জোরে ; তা-ও একটু একটু করে' বহুদিনের অধ্যবসায়ে।

বধূদের বলি, তোমাদের সেয়ানা অবস্থায় বিয়ে হয়েছে এবং তোমরা সবাই লেখাপড়া শিখেছ। তোমাদের সঙ্গে সেকালের গৌরী আর রোহিণীদের অনেক তফাৎ। নয় কি ? বিয়ের অনেক আগে থেকেই তোমরা জান্‌তে পেরেছ স্বামিগৃহ নিয়ে চিরকাল তোমাদের ঘর করতে হবে ; কৈশোরে তোমাদের মানস-কুণ্ডে যে অজ্ঞাত দেবতার পূজায় আহুতিদানের উদ্দেশ্যে প্রেমের যজ্ঞাগ্নি আপনা-আপনি জ্বলে উঠেছিল, তাঁর অধিষ্ঠানভূমি তোমাদের পিত্রালয়ের বাইরে ; তাঁর হাতছানিতে একদিন তোমাদের সর্বস্ব পিছনে ফেলে বেরিয়ে আসতে হবে।···তবে এখন পিছনের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুবিসর্জন কেন ?

একদিনে বাপমাভাইবোনকে ভোলা যায় না সত্যি ; একদিনে কেন, চিরদিনেও যায় না। স্বামিপ্রেম ও সন্তানস্নেহের স্রোতস্বিনীর তলায়

তলায় পিত্রালয়ের স্মৃতির পলি আজীবন মুখ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সে স্মৃতি নূতন কর্মক্ষেত্রে তোমাদের প্রাণকে যেন সজীব রাখে, কখনো ম্রিয়মান না করে। বস্তুত বাপের বাড়িতে ষোল, আঠারো, বিশ বছর ধরে তোমরা যে ব্যবহার ও শিক্ষা পেয়েছ—যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ, তার সমষ্টি হবে তোমাদের উত্তরকালীন প্রেম-জীবনের মূলধন। শ্বশুরবাড়ি এসে সেই মূলধনকে কাজে লাগাও, আরো বাড়াও।

বাল্যস্মৃতি

বাপ-মা-ভাই বোনকে ভুল্‌তে বল্‌ছি না তোমাদের। যে বলে, সে নারীমনের ধার ঘেঁষে কখনো হাঁটেনি, সে মাতাপিতার স্নেহসুধার স্বাদ কখনো পায়নি ; সে হয় দুর্ভাগা নয় পাষণ্ড। বিয়ের পর কিছুদিন পর্যন্ত পতির পুলক-পরিরম্ভের মধ্যে থেকে নূতন স্বপ্নাবেশে বিভোর হয়েও তোমাদের বুকের অন্তর্বস্তু যেন এক এক সময় বেদনায় টন্‌টন্ করে' ওঠে, নূতন প্রমোদ-প্রীতি-পরিবেশ-পরিচিতির মাঝখানে থেকেও এক-এক সময় নিজেকে যেন নিতান্ত নিঃস্ব বলে' মনে হয়। স্বপ্নে-জাগরণে-কর্মাবসরে আচম্বিতে ভেসে ওঠে পিছনে-ফেলে-আসা স্নেহসজল বিরহম্লান এক-একখানি মুখ ! নিতান্ত দুর্ব্যবহারী পিতার একদিনের এক টুক্‌রা স্নেহমধুর বাণীর ঘুমিয়ে-পড়া রেশ মনের কোণ থেকে এক নিঃসঙ্গ অবকাশ ক্ষণে শতমুখ হয়ে বেরিয়ে আসে ; এসে নূতন প্রেমের শান্তি-সুষমা-মাখা অশ্রান্ত তিলক কামোদকে ডুবিয়ে দেয়—থামিয়ে দেয়।···নয় কি ? এ সব কি মন থেকে মোছা যায় ? মেয়েদের মন কি খোকার হাতের শ্লেট ?

বুঝি তা, কিন্তু তবু—তবুও পেছন্-টান্‌কে বেশ একটু তাড়াতাড়ি ছাড়্‌তে হবে। বাপের বাড়ির স্মৃতি নিয়ে সময়-অসময় রোমন্থন করা আর সজলচক্ষে হা-হুতাশ করা যতদূর সাধ্য কমিয়ে ফেল্‌তে

হবে। যত দ্রুত পার, তোমাদের নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ্ খাইয়ে নাও। নতুন ছোট গণ্ডীর মধ্যে মেয়েরা বেশ সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ্ খাইয়ে নিতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই তোমরা পার। তবে এটা মানি যে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর পাঁচজনের স্নেহভালবাসা তোমাদের এই খাপ্ খাওয়ানোর পদ্ধতিটিকে আরো সুখসাধ্য ও ত্বরিৎসম্ভব ক'রে দিতে পারে।

পিত্রালয়ে যাতায়াতের মাত্রা

নতুন সংসারে এসে বাপ মা ভাই বোনকে জোর করে' ভুলে যাওয়া, তাদের নাম কখনো মুখে না আনা এবং বাপের বাড়ী উৎসবে-ব্যসনেও যেতে না চাওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির আপত্তি সত্ত্বেও ঘন ঘন বাপের বাড়ী ছুটে যাওয়া ও নিতান্ত টেনে না আন্‌লে সেখানকার মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকাও তেমনি অন্যায়। যে বাড়িতে তোমাদের পত্নীত্ব ও ভাবী মাতৃত্বের পাকা আসন পাতা রয়েচে, সে বাড়ীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে চল্‌তে গেলে তোমরা বিবাহের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে' দেবে।

বিয়ের পর অন্তত এক বছর বা বড় জোর দু'বছর পিতৃপরিবারের মায়া-তরুমূলে এক আধটু করে' জল ছিটিয়ো। পিত্রালয় এক গ্রামে বা এক শহরে হ'লে এই সময় মাসে একবার, কাছাকাছি গ্রামে হ'লে ২।৩ মাস অন্তর একবার, একটু দূরে হ'লে বছরে দু'বার বা একবার যেতে পার সেখানে। যাতায়াতের সুবিধা ও পুনঃসম্ভাবনা বিবেচনা করে' তিন দিন থেকে একমাস থাক্‌বে সেখানে। তার বেশী নয়। প্রথম প্রসবের সময় শ্বশুরবাড়ীর মত্ নিয়ে সাত মাস গর্ভকালে বাপের বাড়ী যাবে এবং নবপ্রসূতের দুই মাস বয়স হওয়ার পূর্বেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে আস্‌বে।

বিয়ের বছর দুই পর থেকে অথবা একটি সন্তান জন্মানোর পর থেকে বাপের বাড়ী যাওয়ার বাতিক ও বায়না দিতে হবে যথাসম্ভব কমিয়ে। সেখানে কারো বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ থাক্‌লে অথবা কারো মরণাপন্ন অসুখের খবর শুন্‌লে যেতে পার বটে, কিন্তু দরকারের বেশীদিন থাক্‌বে না। চিরকালই সেখানে যাবে ও থাকবে স্বামি-শাশুড়ির সহৃদয় অনুমতি নিয়ে। যখনি বুঝবে বা শুন্‌বে যে, তোমার অনুপস্থিতিতে শ্বশুরবাড়ির কোন অসুবিধা ঘটছে বা ঘট্‌বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন বাপের বাড়ি থাকার সুখকে বিসর্জন দেবে সাময়িকভাবে। বাপের বাড়ির এমনি মোহ যে, সেখানে একটু বেশীদিন থাক্‌লেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে বেশ কিছুদিন মন অস্থির হয়ে থাকে,—এমন কি বুড়ো বয়সেও।

বিয়ের পর স্বামীর কাছে ক্রমাগত বাপের বাড়ী যাওয়ার বায়না করতে থাক্‌লে তার মনে তোমার প্রতি খানিকটা ফিঁকে সহানুভূতি জাগ্‌লেও জাগ্‌তে পারে; কিন্তু খুব বেশী করে' উপ্‌চিয়ে উঠ্‌বে কতকটা যুক্তিসহ সংশয়, বিরক্তি, ক্ষোভ আর অভিমান। সে মনে করবে —নবীনা বধূর প্রতি আদরযত্নসেবায় কোথায় যেন কি ত্রুটি ঘটেছে, হয়তো বধূ তাকে মনে মনে ভালবাসতে পারেনি, বুঝি বা পিত্রালয়ে তার বাল্যকৈশোরের কোন্ পুরাতন প্রেমিককে দেখ্‌বার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে !···বাপের বাড়িতে যাওয়া ও নির্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত থাকার ব্যাপার দাম্পত্য প্রেম জমাট বাঁধার পথে যে কত নিষ্করুণ কণ্টক নিক্ষেপ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং সাবধান।···

শ্বশুরবাড়ি তোমাদের অনেকেরই বোধহয় এতদিনে মন বসেছে। যুক্ত প্রেম-সাধনার পথে তোমরা হাতে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে কিছুটা দূর এসেচ এগিয়ে। পরস্পরের দেহের ও বলিষ্ঠ যৌবনের

পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ তোমরা ; এখন মনের পরিচয় নেওয়ার পালা সুরু হয়েচে। এতদিন তোমরা রতিদেবীর সোনার বীণায় বসন্ত-বাহারের ফোয়ারা ছুটিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আর বিচারবুদ্ধিকে। আজ তারা চোখ্ খুলে শেষ আলস্যজড়িমার হাই তুলছে, কর্মক্ষেত্রে তার ডাক পড়েছে। আজ কড়া হিসাব-পরীক্ষকের হাতে তোমাদের যৌথ জীবনের সাল-তামামী হিসাব-নিকাশ হবে। তাই এখন তোমাদের দুই দলকেই একটু হুঁসিয়ার হয়ে চল্‌তে হবে। বুঝলে ?

তৃতীয় আলাপন

গরমিল হওয়ার কারণাবলী

আগেই বলেছি যে, ভালবাসতে গেলে পরস্পরের দোষগুণ দুটোকেই ভালবাসতে হয়। খুব উচ্চস্তরের প্রেমিকের পক্ষে সেটা সম্ভব ; কিন্তু যারা আমাদের মতো মাঝামাঝি শিক্ষিত সাধারণ স্তরের প্রেমিক, তাদের পক্ষে এটা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। তারা পরস্পরের গুণগুলোকে পছন্দ করে—ভালবাসে, আর দোষগুলোকে যথাসাধ্য বরদাস্ত করার চেষ্টা করে মাত্র। একজনের দোষের জন্যে আর একজনের যখন একাধিকবার স্বার্থে আঘাত লাগে, সংসারে পুনঃপুন ছোটবড় ক্ষতি হতে থাকে, তখন দোষগুলোকে আর বরদাস্ত করা চলে না। সেগুলো তখন অপর পক্ষের মিঠেকড়া সমালোচনার আমলে আসেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের সমালোচনা ও মৃদু তিরস্কারে অপমানিত হয়ে' বেশ কড়া কড়াভাবে তাঁর প্রত্যুত্তর দেন্ এবং তাঁর দোষত্রুটির ফিরিস্তি আওড়িয়ে আত্মদোষ-স্খালনের অপচেষ্টা করেন, তাহলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াতে পারে—দাম্পত্যজীবন রীতিমতো অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে। কথায় কথা বাড়ে—এই প্রবচনটা অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধেই অতি রূঢ়ভাবে প্রযোজ্য।....যেখানে পরস্পরের অমার্জনীয় ত্রুটিও পরস্পরের গুণের কাছে ম্লান হয়ে ধরা দেয়, সেখানেই প্রেম স্নিগ্ধ সার্থকতার মধ্যে ফুটে উঠ্‌তে পারে।

পরস্পরকে জানা ও বুঝার অভাব

বিবাহজীবন পুরানো হয়ে গেলে আমাদের অনেকেরই নিজেদের দোষগুলোকে খাটো করে' প্রেমপাত্রের দোষগুলোকে বড় করে'

দেখ্‌বার প্রবৃত্তি জন্মায়। যে যার নিজের দোষগুলো সম্বন্ধে সচেতন হয়ে' সেগুলোর নীরব ও দ্রুত সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হলে উভয়ের মঙ্গল তো বটেই, ভাবী বংশধরদেরও মঙ্গল। কথাটা মনে রেখো।

আমাদের প্রায় সবারই দাম্পত্যপ্রেমের গোড়াপত্তন হয় দেহ, রূপ, অঙ্গসজ্জা, যৌবন ও লোকাচারের বহ্বাড়ম্বরের মশলা দিয়ে। বিয়ের পর অনেকদিন পর্যন্ত অনেক স্বামিস্ত্রীর স্বভাবমনের অনেকখানি উভয়ের কাছে অজানা থেকে যায় তো বটেই, দেহেরও কতক বৈশিষ্ট্য তাদের কাছে অলক্ষিত থেকে যায়—দেখেছি। এমন পতিপত্নীও দুনিয়ায় এবং বিশেষ করে' বাংলাদেশে আছে যারা আমরণ পরস্পরের সব চেয়ে কাছে থেকে পরস্পরের কাছে সব চেয়ে অজানা থেকে গেল।

আসল কথা, আমরা অনেকেই প্রেমাস্পদের দেহকেও ভাল করে' চিনি না, মনকেও ভাল করে' চিনি না। এক জোড়া বিবাহবঞ্চিত অস্থায়ী প্রেমিকপ্রেমিকা পরস্পরের দেহের কোথায় ক'টা কাটা দাগ, তিল, জড়ুল, আঁচিল আছে—কোন্ কোন্ অঙ্গে আকৃষ্টিকর সৌন্দর্যের আকর লুকিয়ে আছে, তা যেমন করে' লক্ষ্য করে ও মনে রাখে, এক জোড়া বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ তিরিশ বছর একসঙ্গে বাস করেও তেমন করে' লক্ষ্য করে না ও মনে রাখে না।

দম্পতিদের পরস্পরের কার চরিত্রের কোথায় বৈশিষ্ট্য, তার কি কি গুণ সহজে মনকে আকৃষ্ট করে, কার কিসে পছন্দ, কিসে অপছন্দ, কোন্ বিষয়ে উৎসাহ, কোথায় দুর্বলতা, কিসে হর্ষ, কিসে বিরক্তি—সে সম্বন্ধে অধ্যয়নের প্রচুর সুযোগ থাক্‌লেও প্রবৃত্তি হয় কদাচিৎ। যার প্রবৃত্তি হয়, তার হয় বিয়ের অনেক দিন পরে। স্ত্রী কোন্ মাছ কি তরকারি ভালবাসেন, কোন্ রঙের পাড় কোন্ ধরণের শাড়ি পছন্দ করেন, স্বামীর কোন্ আত্মীয়ের প্রতি মনে মনে স্নেহ বা বিরাগ

পোষণ করেন, কোন্ কোন্ গ্রন্থকারের উপন্যাস পড়্‌তে ভালবাসেন—তার খবর অনেক স্বামীই রাখেন না।

আবার অন্যদিকে স্বামী কোন্ আপিসে কি কাজ করেন, তাঁর আফিসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর কি, তাঁর আপিসের বড় সাহেবের নাম কি, তাঁর অতি প্রিয় বন্ধুদের নামঠিকানা কি, তাঁর ক্লাব কোথায়, কোন্ খেলা দেখ্‌তে—কোন্ খেলা খেল্‌তে—কোন্ বই পড়তে তিনি ভালবাসেন, কমিউনিস্ট্ পার্টি হিন্দুমহাসভা সোস্যালিস্ট পার্টি না কংগ্রেসের ভক্ত তিনি—তার খোঁজ বহু স্ত্রীই রাখা আবশ্যক বলে মনে করেন না। এমন বহু প্রৌঢ় স্ত্রীলোক আছেন জানি—যাঁরা স্বামী কত টাকা মাইনে পান, কবে তাঁর মাইনে বাড়্‌ল, কোন্ ব্যাঙ্কে তাঁর কত টাকা আছে, কত টাকার জীবন বীমা আছে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান না রেখে বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। কোনো কোনো স্ত্রীর সে জ্ঞান সঞ্চয় করবার কৌতূহলই নেই। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেও স্বামীর কাছ থেকে সদুত্তর পান্ না; কেউ কেউ ভাসা-ভাসা প্রশ্নের ভাসা-ভাসা উত্তর শুনে দু দিন বাদে স্রেফ্ ভুলে যান্।

একলার সংসারে কোনো কোনো স্বামী টাকাপয়সা নিজের কাছেই রাখেন। প্রতিদিন সকাল বেলায় স্ত্রীর হাতে তাঁরা প্রাত্যহিক খরচের জন্যে ২৲, ৩৲, ৪৲ ফেলে দেন্। কোন কোন অতি-হিসাবী স্বামী রাত্রিকালে খাওয়াদাওয়ার পর নিতান্ত বেরসিকের মতো জমা-খরচের খাতা খুলে স্ত্রীর কাছ থেকে সারাদিনের খুঁটিনাটি হিসাব নেন্ আর লেখেন। হিসাব রাখা মন্দ নয়; কিন্তু সে ভারটা স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই ভাল এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ ক্রমাগত না হতে থাক্‌লে তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ না চাওয়াই সঙ্গত।

সব চেয়ে ভালো হয়—মাসের শেষে স্ত্রীর হাতে মাইনের টাকাটা সমস্ত দিয়ে যদি বলা হয়, "এই এত টাকা তোমার এক মাসের

সংসার-খরচ দেওয়া গেল। আর এই টাকা ক'টা রইল আমার লাইফ্ ইন্সিওরের প্রিমিয়ামের জন্যে আর বাইরের খরচের জন্যে; আর বাকি এই ক'টা টাকার কিছু আমার ব্যাঙ্কে আর কিছু পোস্টাপিসে তোমার নামে জমা দেব। কি বল?" এতে খুব কম পতিসোহাগিনীরই আপত্তির কারণ থাক্‌তে পারে। এজমালি সংসারে স্বামীরা বুড়ো কর্তা বা গিন্নি যার হাতে খরচের টাকা দিক্ না কেন, গোটা কয়েক টাকা যেন মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে দিয়ে যায়। তা থেকে তারা ইচ্ছামতো খরচ করুক, ইচ্ছামতো জমাক্। অর্থ বিষয়ে আজকালকার বউরা সর্বদা ষোল আনা স্বামী-শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌তে চায় না।

বিয়ের কিছুদিন পরে স্বামিস্ত্রী দু'জনেই কিংবা দু'জনের একজন বেশ নির্লজ্জের মতো ভুল্‌তে আরম্ভ করে যে, তারা বিয়ে করেছে দু'জনের সুখের জন্য, চিরকালই তারা থাক্‌বে দু'জনের মুখ চেয়ে, তাদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যটাকে সংসারের গণ্ডীর মধ্যে বড় করে' দেখ্‌লে কিছুতেই চল্‌বে না। ভালবাসার চর্চা করতে গেলে ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে নিজের চেয়ে বড় দেখ্‌তে হয়; অর্থাৎ স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরকে নিজের better half বলে' জান্‌তে ও মান্‌তে হয়। যদি ততটা দূর পর্যন্ত কেউ এগুতে না পারে, অন্তত পরস্পরকে পরস্পরের সমান আধখানা দেখ্‌বে।

আসল কথাটা কি জান? আমাদের দেশের পুরুষরা বিয়ের পর কিছুদিন পর্যন্ত যৌবনরাগোদ্দীপ্তনেত্রে পত্নীকে better halfই দেখে, তারপর তাকে ধীরে ধীরে worse halfএর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। কেউ কেউ গোড়া থেকেই তাকে এই পদে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের বিবাহজীবনে দুর্বহ অভিশাপকে আমন্ত্রণ করে। আগেকার মেয়েদের মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহনশীলতা, আত্মদমন প্রভৃতি জন্মজন্মার্জিত গুণগুলি বেশী ছিল বলে' তারা স্বামীকে নিজেরা ভালবেসে তাকে

ভালবাসার পথে টেনে আন্‌বার শক্তি ও সুযোগ পেত; আবার স্বামীকে ভাল না বেসেও তার সংসারে আজীবন বেশ মানিয়ে-গুণিয়ে চল্‌তে পারত।

আজকাল এ সব গুণ মেয়েদের মধ্যে অনেকাংশে কমে গেছে। কেন কমেছে, তার কতকগুলো কারণ তোমাদের কাছে আগেই পরিব্যক্ত করেছি। পুরুষদের মধ্যে এ গুণগুলি আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে; তার চেয়ে বলা ভাল—তারা সম্প্রতি এই গুণগুলির চর্চা বেশী করে' করতে বাধ্য হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক। আজকাল আর কথায় কথায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাকে বাপের বাড়িতে নির্বাসিত করে' আর একটি বধূ আনা চলে না অথবা নিরন্তর কলহরতা একাধিক কলত্র ও একটি রক্ষিতাকে একই ছাদের নীচে পোষার বিলাসিতা করা যায় না। জীবনাহব এ যুগের পুরুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-সামর্থ্য-সময় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী দাবি করে ও টেনে নেয়। কাজে কাজেই একটি বধূ ঘরে আনবে কিনা তার সিদ্ধান্ত করতেই তার প্রায় অর্ধেক জীবন যায় কেটে।

তারপর যদি বা জাতি-কুল-শীল-পণের বাছবিচার না করে' একটি বউ ঘরে আন্‌ল, তখন আর তার রূপগুণের মূল্য যাচাই করার জন্যে কষ্টিপাথর নিয়ে বসার প্রবৃত্তি হয় না। বউয়ের প্রকৃতিগত ছোট ও মাঝারি আকারের ত্রুটিবিচ্যুতি সে যতদূর সাধ্য হজম করে, সংসারে শান্তিরক্ষার জন্যে তাকে যতদূর পারে স্বাধীনতা দেয়। সহনশীলতার সীমা বেশীদূর ও বার বার অতিক্রম করলে তবেই স্বামীরা বিদ্রোহ করে। অনেকে বিদ্রোহ করে শুধু স্ত্রীর বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ করে সংসারের বিরুদ্ধে—বিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধে। হয় গুরুমন্ত্র নিয়ে সংসারধর্মে জোর করে' বিতৃষ্ণ হয়, নতুবা সংসারের বাইরে গিয়ে একটি উপসংসার পাতে।

শাশুড়ি, বিধবা ননদ, দিদিশাশুড়ি প্রভৃতি যাঁরা বউয়ের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সর্বপ্রথম তীব্র সমালোচনা সুরু করেন এবং বার বার তার স্বামীর কান বিষিয়ে তোলেন তার বিরুদ্ধে সেই সব সনাতন শাসন-কর্ত্রীদের প্রতাপ আজকাল গিয়েছে অনেকখানি কমে। রোজগেরে পুরুষের সংসারে তাঁরা আজকাল প্রায়ই second fiddle play করেন। শহরবাসী অল্প রোজগারী পুরুষরা সাধারণত এঁদের দেশে ফেলে রাখেন এবং নিয়ত বা অনিয়মিতভাবে খরচ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। স্ত্রীসন্তানাদির কঠিন অসুখেবিসুখে বা সন্তান সম্ভাবনা হলে দুচার মাসের জন্যে—নতুবা পালে-পার্বণে-বিবাহে দু'চার দিনের জন্যে—তাঁরা শান্তশিষ্ট হয়ে বউদের সদয় আতিথ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে ফিরে যান।....কাজেই তেহি নো দিবসা গতাঃ।

যাহোক, বৈজ্ঞানিক যুগধর্ম আমাদের ওপর অনেকখানি তার প্রভাব বিস্তার করেছে, আরো করবে। তাই হৃদয়বৃত্তি নিয়ে কারবারের মওসুম আগের চেয়ে কিছু কমেছে, আরো হয়তো কমবে। স্বামিস্ত্রী দুজনকেই এই যান্ত্রিক ও অতি বাস্তবতার যুগে practical হতে হবে—দুজনের যুগ্ম স্বার্থের treasuryতে দুজনকেই খেটে নিত্য কিছু জমা দিতে হবে। রূপ-যৌবন দেখিয়ে—টানা ভুরু, রাঙা ঠোঁট্ আর রঙীন্ স ড়ির বাহার দেখিয়ে আজকাল ট্রামে-বাসে-ট্রেনে পার্কে পুরুষকে ক্ষণিকের জন্যে আবেগচঞ্চল করা চলে, বিয়ের পরও কিছুদিন পর্যন্ত তাকে হয়তো মোহমুগ্ধ রাখা যায়। কিন্তু তারপর জীবনের উচ্চাবচ পথে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চল্‌তে গেলে রজনীগন্ধার ডাঁটি দিয়ে লাঠি করা চলে না, প্রজাপতির পেলব পাখায় মাথা রেখে বিশ্রাম করা চলে না, কসেট্-ব্রেসিয়েরের সুকঠিন আগড় ভেঙে সন্তানের পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করা চলে না।....বুঝেচ ?

অবুঝ, অসহানুভূতিশূন্য, impractial স্বামিস্ত্রী আজকালকার

বাজারে প্রচুর দেখ্‌তে পাই আমরা। স্ত্রী আজকাল যদি স্বামীকে তার প্রভু বলে' না মানতে চায় না মানুক, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে দাসী বলে' না স্বীকার করতে চায় না করুক; ভালো কথা। দু'জনে সমান, দু'জনে সাথী, দু'জনে অকৃত্রিম বন্ধু বলে পরস্পরকে মেনে নিলেও সময়-বিশেষে একজনকে আর একজনের পরামর্শপ্রার্থী ও অনুগামী হতেই হয়। প্রভুও এক এক সময় ভৃত্যের মতামত ও উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তার যে বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি, বোধশক্তি ও আত্মা আছে—তা বিশ্বাস করেন। আমরা কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালে ভুলতে চেয়েছি যে, নারীর রূপ, যৌবন, গর্ভ-ধারণ, সন্তানপালন ও গৃহশ্রমের অন্তরালে এই বৃত্তি ও শক্তির প্রস্রবণ মুখ লুকিয়ে আছে।

নারী যে পুলকবেদনাতীত যন্ত্র নয়—সে সত্যকে আমরা যখনি বারে বারে ভুল্‌তে বসি, তখনি মনান্তরের কালবৈশাখীকে ঘরের ভেতর আমন্ত্রণ করে আনি। তবে মেয়েমানুষ যতই লেখাপড়া শিখুক, স্বাবলম্বিনী হোক, পুরুষবিদ্বেষিণী হোক্, পুরুষদের ওপর এক দিক দিয়ে না একদিক দিয়ে তাদের নির্ভরশীল হোতেই হবে। একজন ওলন্দাজ লেখক লিখেছিলেন—"Woman's power is opposite of man's power. Power in man is force; power in woman is weakness." হ্যাভলক এলিস্ তাঁর *Studies in the Psychology of Sex* নামক গ্রন্থাবলীর এক জায়গায় লিখেছেন যে, স্ত্রীলোক যতকাল মাসিক আর্তবের অধীন থাকবে এবং যতকাল গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের দায়িত্ব প্রকৃতিদেবী তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে রাখবেন, ততদিন তাদের পক্ষে পুরুষের সমকক্ষতা করা অসম্ভব হবে; ততদিন তারা পুরুষের কাছে অল্পবিস্তর দুর্বল থেকে যাবে।

এই দুর্বলতার শক্তি দিয়েই তাদের বশ করতে হয় পুরুষকে। আবার নিজেদেরকে খুব সবল স্বতন্ত্র মনে করেও তারা এড়িয়ে চল্‌তে

পারে না পুরুষকে। লক্ষ্য করে দেখো, একটি মেয়ে-স্কুলে একটা পুরুষ দারোয়ান্ তো থাকেই, তা' ছাড়া হয় একজন পুরুষ দপ্তরি, একজন হিসাবরক্ষক, নয় একজন বুড়ো সংস্কৃতের বা অঙ্কের শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন! তা' ছাড়া স্কুলের সেক্রেটারি, প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি সবাই পুরুষমানুষ। এ দেশেই বল আর ও দেশেই বল; মেয়েরা যখন নিজেদের জাতির স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করে, বক্তৃতা করে, শোভাযাত্রা করে, তখন তার পেছনে বা পাশে পাশে থাকে এক বা একাধিক পুরুষ; অনেক ক্ষেত্রে বক্তৃতা লিখে দেয়—শলাপরামর্শ দেয় এক অন্তরালচারী নর। রাশিয়ায় মেয়ে সৈন্যদলে হয় মেজর, নয় কর্নেল, নয় জেনারেল পুরুষ থাকে। নার্সদের সর্বময়ী কর্ত্রীও ঊর্ধ্বতন এক পুরুষ কর্মচারীর কাছে বেতন ও পরামর্শ ভিক্ষা করতে বাধ্য হন্।

স্বামী ও স্ত্রীকে বিয়ের অব্যবহিত পর থেকেই বুঝ্তে হবে—তারা একাধারে উভয়ে উভয়ের প্রভু ও দাস, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক ও উভয়ের নিকট উভয়ে অপরিহার্য; প্রত্যেকের সুখ-দুঃখ-সুবিধা-অসুবিধা-বোধ সমান। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু প্রকৃতিগত ও অর্জনগত ত্রুটি আছে—সেগুলি প্রত্যেককে যথাসাধ্য সহ্য করে চল্তে হবে। নিষ্ঠুর সমালোচক ও কঠোর শিক্ষকের আসনে না বসে যদি প্রেমিকের আসনে বসেই অপরের চক্ষুপীড়াদায়ক দোষত্রুটিগুলি একটু একটু করে সংশোধন করতে পার তো খুবই ভালো। নইলে আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

তাকে নিয়ে তুমি কখনো সুখী হতে পারবে না—এই সিদ্ধান্ত চট্ করে তোমাদের কাউকে করতে বারণ করি। তার ওপর বিশ্বাস রেখো, আশা রেখো, যতটা শোভন ততখানি তাকে প্রশ্রয় দিও। দেখেছি, যে মেয়ে বিয়ের আগে এক বা একাধিক যুবককে ভালবেসেছিল,

এমন কি হয়তো কাউকে তার দেহদানও করেছিল, সে মেয়েও অচেনা এক যুবককে বিয়ে করে' তার পায়ের তলায় সর্বস্ব সমর্পণ করে দেয়, আর তার মানস-সরোবর থেকে অতীতের শ্যাওলা-পানা নির্মম হস্তে তুলে ফেলে।···আবার এমন মেয়েও দেখেছি, বিয়ের পর ছ'মাস এক বছর ধরে' স্বামীর সঙ্গে কারণে-অকারণে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে; বাপের বাড়ীতে সরোষে আত্মনির্বাসনে কিছুকাল কাটিয়ে শেষে একদিন ফিরে এসে স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তার ব্যক্তিত্বকে বিনাসর্তে বিসর্জন দেয়।···সুতরাং হতাশ হয়ো না; স্বামীও না, স্ত্রীও না!····

পরস্পরের হৃদয়াবেগ অধ্যয়নের অভাব

তারপর, সারাজীবন পরস্পরে পরস্পরের মন, মতি, মেজাজ ও হৃদয়াবেগ বুঝে চ'লো। যে ঠাট্টাবিদ্রূপ অপরের হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তেমন ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রবৃত্তিকে সর্বতোভাবে দমন করবে। অসময়ে বা স্নেহভাজনদের সামনে কখনো ঠাট্টাও করবে না, তিরস্কারও করবে না। হুকুম চালাবে নির্বন্ধাতিশয্যের মিষ্টত্ব দিয়ে এবং হুকুম শোন্বার ঐকান্তিক ইচ্ছা হৃদয়ে নিয়ে। যে তোমার আদেশ বারে বারে পালন করে, তাকে বারে বারে আদেশ না করে' দু'চার বার তার সামনে নিজেই একটা কাজ করবে; করে' তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, তাকে তুমি অনরবত খাটাতে চাও না, ইচ্ছা করলে সে কাজটা তুমি নিজেই করতে পার।···

গ্রীষ্মকালের রাত্রি। স্বেদস্রাবী গুমটে পৃথিবীর লোক আইঢাই কচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু একটু ফুরফুরে বাতাস ঘরে এসে ঢুক্ছে, আবার চোখের কোল থেকে ঘুমের জড়িমাকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই বারন্দায় বা ছাতে শুয়ে। স্বামী স্ত্রীকে

বল্‌লে, "ওগো একটু বাতাস কর না!" স্ত্রীর সে অনুরোধ রাখা উচিত। আবার স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে "ওগো শুন্‌ছ? কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও না।" স্বামীরও সে অনুরোধ অবহেলা করা উচিত নয়।....

বউ হয়তো উনুনে ভাত চড়িয়েছে। স্বামী বাইরে থেকে এসে জামা ছেড়ে চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ডেকে বল্‌লেন, "ওগো, এখুনি এক কাপ চা তৈরি করে দাও—দু'মিনিটের ভেতর।" বাড়িতে হয়তো স্টোভ্ নেই, অথবা ধর—স্টোভটা খারাপ হয়ে গেছে। গিন্নি স্বামীর কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বল্‌লেন, "দিচ্ছি, মিনিট পাঁচেক সবুর কর। ভাত নাম্‌তে আর দেরি নেই। এখুনি উনুন থেকে হাঁড়ি নামালে ভাত দলা পাকিয়ে কাদাকাদা হয়ে যাবে।" স্বামীর মুখখানা অমনি হাঁড়িপানা হয়ে উঠ্‌ল; গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন "যাক্‌গে, আর দরকার নেই। রামহরি কোথায় গেল? ওরে রামা, যাতো দৌড়ে দোকান থেকে এক কাপ চা কিনে নিয়ে আয় তো।"...রামহরি যখন চা কিনে এনে বাবুর সাম্‌নে রাখ্‌লে, তখন গিন্নির ভাত নেমে গিয়ে ডাল চড়েছে।..

গিন্নি সকালে কর্তাকে বল্‌লেন, "মেজো ভাজ গীতার পরশু দিন 'সাধ'। ওরা কাল নেমন্তন্ন করতে আসবে। আজকে একটু সকাল সকাল আপিস্ থেকে ফিরো; সন্ধের সময় বসন-বিপণিতে তোমার সঙ্গে গিয়ে একখানা টাকা পনেরো-কুড়ির মধ্যে সাড়ি কিনে আন্‌ব সাধ দেবার জন্যে। বুঝলে?"...কিন্তু আপিসে হাফ্-ইয়ার্লি ক্লোজিংয়ের সময়; সবাইকে ক'দিন ধরে' রোজ ২।১ ঘণ্টা করে ফাল্‌তু খাটতে হচ্ছে পাঁচটার পর। সন্ধ্যার পর স্বামী তেতে-পুড়ে আপিস থেকে এসে গিন্নির খোঁজ নিতেই শুন্‌লেন, একটু আগে তিনি পাশের বাড়ির হিনুর মাকে সঙ্গে নিয়ে সওদা করতে বেরিয়েছেন। বারো বছরের মেয়ে

আরতি বাপের জন্যে চা তৈরি করে' দিলে। রাত্রি আটটার পর গিন্নি কাপড় কিনে নিয়ে ফিরলেন। গোঁসা-ভরে সে রাত্রিতে তিনি স্বামীর সঙ্গে কথাও কইলেন না, কি কাপড় কিনেছেন তা স্বামীকে দেখালেনও না।..

এইভাবে ছোটখাটো ঘটনা থেকে বড় ঝগড়া—বিরাট বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। একজন রাগ করে' কথা বন্ধ করলে আর একজন যদি তার দেখাদেখি কথা বন্ধ করে' দেয়, তাহলে এই অচল অবস্থা কিছুদিন চলার পর দুজনের পক্ষেই দুঃসহ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। এক-আধদিন এইরকম চল্‌লে যে দোষী পক্ষ, তার উচিত অপর-পক্ষের সাধ্যসাধনা করে' তার মৌন ভঙ্গ করা এবং তার কাছে আত্মদোষ স্বীকার করে' তার ক্ষমাপ্রার্থনা করা। কেউ দোষ করলে, যুক্তি দিয়ে ও কিছুদূর পর্যন্ত প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে' সে যে দোষ করেছে সেটা মোলায়েমভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে যদি যুক্তি মান্‌তে না চায় (মেয়েরা লজিক্ ও ফিলজফি পড়েও ব্যবহারিক যুক্তিতত্ত্বের ধারে ঘেঁষ্‌তে চায় না), তাহলে চুপ করে' যাবে। কারণ, যুক্তি ও প্রতি-যুক্তি নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হলেই উষ্ণ তর্কাতর্কির এলাকায় এসে পড়্‌তে পার—যেখানে উষ্মা, অশ্রুজল ও অপ্রিয়ভাষণের প্রাচুর্য তোমাদের প্রেমজীবনের খানিকটা অংশকে বিষময় করে' দিতে পারে। যে দোষ সে করেছে তুমিও সেই দোষটি একদিন সুবিধামতো তার সাম্‌নে করে দেখো সে আপত্তি করে কিনা এবং সে যে যুক্তি দিয়ে একদিন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিল সেই যুক্তি তোমার মুখে শুনে মেনে নেয় কিনা!

দু'জনের মধ্যে নিবিড় ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও বারো মাস তিরিশ দিন দু'জনে দুজনের প্রতি একই রকম সুমিষ্ট ব্যবহার করতে পারে না; আশা করাও যায় না। স্বভাবত একজন একটু

উগ্রমেজাজী, একটু আবেগপ্রবণ, একটু দুশ্চিন্তাপ্রবণ, একটু বিষয়-বুদ্ধিহীন, একটু অসহিষ্ণু, একটু ছিদ্রান্বেষী, একটু ভাবোন্মাদী হতে পারে; শিক্ষাদীক্ষায়, চিন্তাধারায়, ধর্মবিশ্বাসে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'জনের মধ্যে অল্পবিস্তর অমিল থাকতে পারে। তার ফলে তর্কাতর্কি, কলহ ও মনকষাকষি ঘটা খুব স্বাভাবিক। সেটা খুব কম ঘটতে পারে যদি আমরা অন্যপক্ষের ন্যূনতাকে সহৃদয় অনুকম্পার চক্ষে দেখি ও তার মতের একটা লৌকিক মূল্য প্রদান করতে শিখি। যার যেখানে স্বভাবগত অসংশোধনীয় ত্রুটি বা হীনতা আছে, তার সেখানে বারে বারে খোঁচা না দেওয়াই শোভন; তাতে তার ব্যথাই শুধু লাগে না—তোমার প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধাও জাগে। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন আপন হীনতার বা ন্যূনতার গর্ব জাহির না করে; বরং তাকে ভেতরে ও বাইরে সলজ্জভাবে স্বীকার করতে যেন পিছপাও না হয়।

চিরকালই ভদ্র পরিবারে স্বামিস্ত্রীর শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য ছিল; তা সত্ত্বেও এদের একটা বড় অংশের মধ্যে বনিবনাও হ'ত, মনের মিলও হ'ত। ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন, হেমচন্দ্র, কোলরিজ্, মুর, হাইনে, স্কট্ প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের পত্নীগণের এমন বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না যে, তাঁরা তাদের স্বামীদের প্রতিভার পরিমাপ করতে পারতেন বা তাঁদের লেখার পরিপূর্ণ রসবোধ করতে পারতেন। তবুও এঁরা দাম্পত্যজীবনে সুখী ছিলেন; কখনো পত্নীদের শিক্ষা ও কাব্যরসবোধের দৈন্য পতিদের মনকে পীড়া দেয়নি। স্কটের পত্নী ছিলেন ফরাসী, তিনি ভালো করে' ইংরাজী বা স্কচ্ ভাষা কখনো বলতে শেখেন নি।

আবার ওয়াল্টার ল্যাণ্ডরের পত্নী ছিলেন মোটামুটি শিক্ষিতা, কিন্তু কাব্যরসবোধ তাঁর মধ্যে ছিল না এবং তাঁর অসম্বরণীয়

স্পষ্টবাদিতা আবেগবহুল কবির হৃদয়ে চিরকাল নৈরাশ্য ও বেদনা জাগিয়েছিল। প্রিয়জনের এক-মিনিটে বলা একটুকরা কটু বা রূঢ় কথা মানুষের মনের মাঝে বেদনার কণ্টক সারাজীবন জিইয়ে রাখতে পারে,—এ কথা মিসেস্ ল্যাণ্ডর জানতেন না। তোমাদেরো কেউ কেউ হয়তো জানো না। মধুযামিনী যাপনকালে একদিন ল্যাণ্ডর তার নববধূকে তাঁর লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলেন; তাঁর মুখ থেকে কবিতা পাঠ শোনা তখনকার দিনে রমণীয় সৌভাগ্য বলে' গণ্য হত। ল্যাণ্ডর-বনিতা খানিকটা শুনেই অন্যমনস্ক হ'তে লাগ্‌লেন, তারিফ্ করার কোন চিহ্নই তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল না। একটু পরেই তিনি স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; সকৌতুকে খোলা জানালার দিকে চেয়ে বললেন, "ওগো ওয়াল্টার, তোমর কবিতা থামাও; ভাল লাগ্‌ছে না শুনতে। রাস্তায় পুতুল-নাচের সঙ্ দেখাচ্ছে, একটু দেখে আসি, দাঁড়াও।"....

অলস আনন্দাবসরে পতি যদি আফিস, ক্রিকেট্ আর ক্লাবের গল্প করে, তা যেমন মন দিয়ে শোনা উচিত, তেমনি পত্নী যদি রান্না, সেলাই, ভাজেদের বাপের বাড়ীর কাহিনী আওড়ায়, তাও তেমনি কান পেতে শোনা উচিত। শুধু শোনা নয়, মাঝে মাঝে সকৌতূহল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং অকাজের হলেও তার কিছু কিছু তথ্য মনে রাখাও বাঞ্ছনীয়। সব চেয়ে বাঞ্ছনীয় মনে করি—যদি প্রত্যেকে অপরের কার্যক্ষেত্র ও কর্মতৎপরতার স্বরূপ, ব্যাপকতা ও সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে মোটামুটি হাল খবর রাখে, তৎসম্বন্ধে একটা কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে কিংবা সময়-বিশেষে তার সহযোগিতা করার আগ্রহ দেখায়।

পরস্পরের শিক্ষাদীক্ষা, মন, মেজাজে পার্থক্য

একজন অডিটারের গৃহিণী ম্যাট্রিক্ পাশ না করলেও তাঁর স্বামী কি কাজ করেন—তার খবর রাখ্‌তে পারেন এবং অডিটিং জিনিসটি কি—তা অবশ্য অন্যান্য বিদ্যাবুদ্ধিহীনা প্রতিবেশিনীদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। কোন্ কোন্ আফিসে তাঁর স্বামী অডিট্ করতে গেলেন, কোন্ আফিসের কি গলদ তিনি ধরলেন, 'ব্যালান্স শীট্' কাকে বলে—সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রত্যেক স্ত্রীর থাকা উচিত এবং স্বামীরও সে আগ্রহ সাধ্যমতো মিটোনো উচিত। একজন গায়কের পত্নীর যদি সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকে, তাহলে ততটা দোষের হয় না যতটা হয় তিনি সঙ্গীত-রসজ্ঞা না হলে। সা-রে-গা-মা যিনি জীবনে কখনো সাধেন নি, গান শুনলে যিনি চিরকাল কানে আঙুল দিয়ে এসেছেন অথবা যিনি ভৈরবী ও পূরবীর মধ্যে ভূপালী ও ইমনের মধ্যে পার্থক্য জানেন না, তাঁর পক্ষে একজন গানের ওস্তাদের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা সকল ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য ও সুখাবহ নয়।

আমি এমন স্ত্রীও একালে দেখেছি যিনি তাঁর লোকপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বামীর লেখা একখানা বইও পড়েন নি; শুধু তাই নয়, তাঁর স্বামী ক'খানা বই এ পর্যন্ত লিখেছেন—তার নামগুলো পর্যন্ত বল্‌তে পারেন না। এঁদের মধ্যে ভালবাসা বাইরে যতই গভীর বলে' মনে হোক্ না কেন কোথাও-না-কোথাও একটা প্রকাণ্ড ফাঁক্ ও ফাঁকি থেকে যায়। আবার এমন স্ত্রী দেখেছি—যিনি নিজে লেখিকা নন্, উচ্চশিক্ষিতাও নন্; কিন্তু যিনি স্বামীর লেখা প্রত্যেকটি ছত্রের সঙ্গে পরিচিত, যিনি অবসর পেলেই স্বামীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকালে ডিক্টেশন্ গ্রহণ করেন এবং কখনো বা সযত্নে প্রুফ্ সংশোধন ক'রে দেন্।

অন্যদিকে এমন বহু স্বামীকে জানি যিনি স্ত্রীর অসুস্থতার সময় আফিসে ছুটি নিয়ে তাঁদের কচি ছেলে বা মেয়ের সমস্ত তত্ত্বাবধান করছেন, দুধ গরম করছেন, অপটু হস্তে পথ্য প্রস্তুত করছেন, রাত্রি জেগে স্ত্রীর শুশ্রূষা করছেন, ঘণ্টা-মিনিট ধরে' ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। আবার এমন স্বামীকেও দেখেছি, যিনি শনিবার সন্ধ্যার সময় উনুনের ধারে বসে' মাংস রান্না করছেন, স্ত্রী বাটনা বাট্‌ছেন; অথবা স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও বঁটি নিয়ে ইলিশ মাছ কুট্‌তে লেগে গেছেন। এই রকম পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং পরস্পরের জাতিসুলভ বিশিষ্ট ক্রিয়াকর্মের প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোষণ ভালবাসার বাঁধনকে শক্ত ও জীবনকে অধিকতর হৃদ্য করে।

একপক্ষের ভালবাসা যখন গভীর আর অন্যপক্ষের ভালবাসা যখন অগভীর বা অন্তঃসারশূন্য হয়, তখন দ্বিতীয় পক্ষ দেওয়ার চেয়ে চাওয়া ও নেওয়ার পক্ষপাতী বেশী হয়। সে শুধু প্রথম পক্ষের ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করে' তাকে বারবার আঘাত দিতে অথবা তার সর্ববিধ সুবিধা গ্রহণ কর্‌তে থাকে। কথায় কথায় সে তাকে ভালবাসবে না বলে' ভয় দেখায়, 'বাপের বাড়ী চলে যাব' নতুবা 'আবার বিয়ে করব' বলে' আস্ফালন করে, দিনরাত এক-তর্ফা মান-অভিমানের পালা গাইতে পাল্লে খুশী হয়। এরা ভালবাসা পাবার অনুপযুক্ত, কারণ এরা ভালবাসা কাকে বলে জানে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে—এরা জীবনে কাউকে ভালবাসতে পারেনি, বাপ-মা-ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধবী কাউকে নয়; জীবনে হয়তো কাউকে ভালবাসতে পারবেও না। এরা আত্মসুখসর্বস্ব।

আগেই বলেছি, একজন রাগ করে' দুটো শক্ত কথা শুনোলে—দুটো গালাগাল দিলে, আর একপক্ষ চুপ করে' যাবে! ছোট যুক্তি দিয়ে যদি তার রাগ থামাতে পার তো ভাল, নইলে তখনকার মতো

তার গালাগাল উপেক্ষা করবে। সে অন্যায় করে' গালাগাল দিলে নিজে নিজেই অনুতপ্ত হবে, নচেৎ তার রাগ পড়ার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের সওয়াল্ সুরু করবে। স্বামিস্ত্রীর ঝগড়া যেন পাড়াপ্রতিবেশীর কানে না যায় এবং মিটোবার জন্যে তাদের কাউকে যেন সালিশ মান্‌তে না হয়। নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটোবে এবং যত তাড়াতাড়ি পারো। একপক্ষকে যদি নীচু হতে হয়—তাও স্বীকার। যে আগে নীচু হয় সে পরে আর একজনকে আরো নীচু করতে পারে। কথাটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে' দেখো। ঝগড়া করার পর দুজনেই সন্তাতীত আদরের মনোমদ ক্ষণগুলিকে মনে আন্‌বে। তাহলে মন তাড়াতাড়ি কোমল ও প্রসন্ন হবে।....

মহাভারতের এক জায়গায় আছে—

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্ন সুখা ভর্তুর্যানারী সা পতিব্রতা॥

পতি রাগান্বিত হয়ে কটু কথা বললেও যে নারী সহাস্যবদনে তা সহ্য করতে পারেন তিনিই পতিব্রতা।....পত্নীব্রত পতি সম্বন্ধেও এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

একখানি পুস্তকে বহুকাল পূর্বে একটি সুন্দর গল্প পড়েছিলাম।.... কোন গৃহে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া লাগত। গৃহিণী সব সময় স্বামীর দোষ দেখ্‌তেন। অফিস থেকে এলে তাঁর বকুনি সব চেয়ে বেশী বাড়ত এবং যতক্ষণ তিনি বাড়ী থাক্‌তেন কেবলি বক্‌বক্ করতেন। স্বামী প্রথম প্রথম তাঁর কথার বেশ কড়া কড়া জবাব দিতেন; শেষে অনন্যোপায় হ'য়ে স্ত্রীর সঙ্গে লেন্‌দেন্ বন্ধ করলেন এবং যতদূর সাধ্য তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগ্‌লেন। এই দেখে স্ত্রীর সন্দেহ হ'ল স্বামী বোধ হয় আর কারো প্রেমে পড়েছেন।

তাঁকে বশ করবার জন্য দিন কয়েক পরে তিনি গ্রামান্তরের এক প্রসিদ্ধ ওঝাকে ডাকিয়ে আন্‌লেন। ওঝা সমস্ত শুনে ও খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে' চিকিৎসার পদ্ধতি স্থির করে' ফেল্‌লেন। নদী থেকে পেতলের একটি ঘটিতে করে এক ঘটি জল তুলে আনতে স্ত্রীলোকটিকে আদেশ করা হ'ল। ওঝা ঘটির জলে এক গাছা কুশ ঘাস ডুবিয়ে বিড়্ বিড়্ করে মন্ত্র পড়ে দিলেন এবং উপদেশ দিলেন, "তোমার স্বামী আপিস থেকে আসবামাত্র গোপনে এই ঘটি থেকে ছোট্ট এক চুমুক্ জল মুখে তুলে নেবে; স্বামী হাতমুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে যতক্ষণ না বেড়াতে বেরোন্, ততক্ষণ মুখের জল ফেল্‌বে না। তিনি কোন কড়া কথা বল্‌লেও কথার জবাবও দিতে যেয়ো না; তা'হলে মুখের জল অসময়ে পড়ে যাবে। তাতে তোমার স্বামীর অকল্যাণ হবে। এক সপ্তাহ এই রকম করলে তোমার স্বামী তোমার বশে আসবে।" বুঝতে পাচ্ছ সে জলে মন্ত্র পড়ে' বিশেষ কোন ক্ষমতা সঞ্চারিত করে' দেওয়া হয়নি! ওঝার নির্দেশ-মতো পর পর সাত দিন স্ত্রী জল মুখে ক'রে থাকার ফলে স্বামীর মনে ভাবান্তর এল। স্ত্রীকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে স্বামী তাঁকে হেসে দুটো-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তিনি মুখ নীচু করে চুপ করে থাকেন—সারা মুখে তাঁর গোপন সাধনার গর্বিত এক আনন্দের ছটা! ওঝার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল।....

এক পক্ষের অতিরিক্ত সহনশীলতা, বিশ্বাস ও প্রশ্রয়দান অনেক সময় অন্য পক্ষের স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়—দেখেচি। ক্রমাগত তিতিক্ষাকে অপরপক্ষ দুর্বলতা বা দুস্ত্যাজ্য মোহ বলে' ধরে নেয়। সেইজন্যে দু'দলকেই বলি মাঝে মাঝে ফণা তুলে ফোঁস্ ক'রো; তবে ছোবল দিও না, বিষ ঢেলো না। স্ত্রীদের একাকী মুক্ত বিচরণের স্বাধীনতা, ক্রমাগত বস্ত্রালঙ্কারের আবদার, সিনেমা-থিএটার দেখার বাতিক

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীদের আর্থিক ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদার সীমা অতিক্রম করে যায়। গোড়া থেকে স্বামীদের উচিত এবিষয়ে স্ত্রীদের সুমিষ্ট উপদেশ-দানে সংযত করা।

স্ত্রীদের বোঝা উচিত তাঁদের এই ব্যবহার সংসার ও স্বামী দু'টিকেই তাঁদের কাছ থেকে ক্রমশ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপব্যয়ের প্রতিক্রিয়া স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা জীবনান্তে তাঁদেরই বেশী ক'রে ভোগ করতে হয়। নিজেদের অপব্যয়ের স্পৃহাকে তাঁরা যেমন জোর করে দমন করতে চেষ্টা করবেন, তেমনি স্বামীদের অপব্যয়ের অকুণ্ঠ আধিক্যকে তাঁরা সুকৌশলে সংযত করার চেষ্টা করবেন। সাচ্ছল্য ও প্রাচুর্য-ভরা সংসারেও স্বামী বা স্ত্রী কেউ অপব্যয় করবে না। যে সব বউ স্বামীর দেওয়া বস্ত্রালঙ্কার বিলাসসামগ্রী গৃহসজ্জা নিয়ে, বান্ধবী-আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও লোক-লৌকিকতা নিয়ে তুষ্ট ও ব্যস্ত থাকে, দেখবে স্বামিপুত্রের সুখসুবিধার দিকে তাকাতে বার বার তাদের ভুল হয়। তারা দুনিয়ায় নিজেকে ছাড়া বোধহয় আর কাউকে ভালবাসতে আসে নি।

চতুর্থ আলাপন

গরমিল হওয়ার আরো কারণ

পরস্পরের সঙ্গ ও সাহচর্যের অভাব

এই জিনিসটি অনেক সময় দাম্পত্য সম্বন্ধকে শিথিল ও দুঃসহ করে দিতে পারে। যাকে ভালবাসি, তাকে প্রতিনিয়ত দেখতে, তার সঙ্গ সাহচর্য ও সহানুভূতি পেতে ভাল লাগে; এটা নতুন কথা কিছু নয়। কিন্তু যাকে ভালবাসতে পারি না, যাকে ভাল লাগে না, যার আকৃতিপ্রকৃতির মধ্যে খুঁৎগুলোই শুধু ভেসে উঠে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা জাগায়, তাকে কিছুদিন ধরে দেখতে দেখতে, তার সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে এবং তার হাত থেকে অযাচিতভাবে ছোটখাটো দুটো-একটা সাহায্য—সুমিষ্ট ব্যবহার পেতে পেতে তাকে যেন নতুন চোখে দেখতে শিখি, সে যেন আমার কাছে ক্রমশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ব্যাপার অনেক দেশে বহু নাটক ও উপন্যাসের আখ্যানবস্তু নির্মাণ করেছে; কিন্তু লেখকদের নিছক্ কল্পনাই এর রসদ জোগায়নি।

অতি কাছে থাকার একটা মোহও আছে, একটা বিরহও আছে। কাছে থেকে আমরা যে বস্তুর যে সব দোষগুণ ধরতে পারি না, একটু দূরে গেলে তার অনেকখানি ধরতে পারি। স্বামিস্ত্রীকে আমি বিয়ের পর কিছুদিন কাছে, কিছু দিন দূরে থাকতে বলি। এর মনস্তত্ত্বগত অনেকগুলি কারণ আছে। প্রেমজীবনের কোন সময়ই 'বহুৎ ভালা না বর্ষাবাদল বহুৎ ভালা না ধূপ'। খুব পাওয়া ও মোটে না পাওয়া—অতি পরিচয় ও অপরিচয়, দুটোর মধ্যেই একটা অতৃপ্তি আছে; যদিও দুই অতৃপ্তির গতি-প্রকৃতি এক নয়।

একদল স্বামী আছে যারা বিয়ের পর কিছুদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে কিছুতেই বাপের বাড়ি যেতে দেবে না, দিনেরাতে যথাসাধ্য তার কাছে কাছে থাকবে, একটু চোখের আড়ালে গেলে তাদের মনে হয় 'হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে'।....আর একদল আছে যারা প্রবাসের কর্মস্থল থেকে দশ-পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল, বিয়ের পর পাঁচ-সাতদিন বউদের যৌবন-মনের যৎসামান্য পরিচয় নিয়ে ও দিয়ে প্রবাসে ফিরে যায়। বউরা কিছুদিন বাপের বাড়ী কিছুদিন শ্বশুর-বাড়িতে থাকে, কল্পনা-বিলাস আর চিঠির মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্যজীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রসঘন হবার চেষ্টা করে। স্বামীরা বছরের মধ্যে বড় জোর দশ পনেরো বিশ দিন এসে নববধূদের সঙ্গলাভ করে ধন্য ও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যান্।...এই দুটো দৃষ্টান্ত একই অক্ষদণ্ডের দুটী প্রান্ত। দুটো পন্থাই প্রাণকে শ্রান্ত ও অশান্ত করে; দুটোই প্রেমকে দৃঢ় ও গাঢ় করে না। এর মাঝামাঝি রাস্তায় যারা চলে, তারা দুজনে মোটামুটি সুখী হতে ও থাকতে পারে; কারণ তাদের মধ্যে অতি-পাওয়ার অবসাদ নেই, অত্যল্প পাওয়ার বিষাদ নেই।

নারীর প্রেম হ'ল পেশা, নরের প্রেম হ'ল নেশা। ভালবাসার মধ্যে নারীর আছে দেহমনজীবনের খোরাক; পুরুষের আছে ক্ষণিকের স্মৃতি—ক্ষণিকের উন্মাদনা—ক্ষণিকের তুষ্টি—ক্ষণিকের বিস্মৃতি। প্রথম পরিচয়ের আবেগ, প্রথম বিরহের উদ্বেগ, প্রথম মিলনের আগ্রহ, পুরুষের তাড়াতাড়ি যায় কেটে। বাইরের জগৎ তাদের চোখে যে মায়া-কাজল পরিয়ে দেয়, তার বলে সে ঘরের পানে ফিরে তাকাবার অবসর পায় অতি অল্প, বাইরের বিচরণক্ষেত্র থেকে সে লাভ আর ক্ষতির হিসেবের বোঝা নিয়ে প্রেয়সীর বুকের কাছে এসে পড়ে ঘুমিয়ে। তার নেশার পাত্র থেকে ভেতরে আর বস্তু থাকে বাইরে। নারীর

কিন্তু তা নয়। তার পাত্র থাকে বাইরে আর বস্তু থাকে ভেতরে। ক্বচিৎ পাত্রকে ভেতরে পায়; কিন্তু তার বস্তুর তুলনায় পাত্রকে সর্বদা ছোট দেখে। তা-ছাড়া বস্তুটা নেশা জমানোর নয়, ক্ষুধা প্রসাদনের। নারী যতটুকু পুরুষকে কাছে পায় ততটুকুর মধ্যেই পুরুষকে অনেকখানি দিতে পারে; অনেক পুরুষই ততখানি নিতে পারে না; আবার যত-খানি নেয় ততখানি দিতে পারে না। গঙ্গার অবতরণ বেগকে ধারণ করতে গিয়ে কত শত মাতঙ্গ ও ইন্দ্রের ঐরাবত ভেসে যায়।

স্ত্রীলোকের প্রেম উপজীব্য বলে' তারা স্বামীকে যতখানি কাছে পেতে চায়, গড়পড়তা পুরুষের পক্ষে ততখানি কাছে থাকা সম্ভবপর নয়; সম্ভব হলেও সে থাকতে চায় না। যৌনসংযোগের জন্য যতটুকু এগুনো ও আদর-আপ্যায়নের প্রয়োজন, ততটুকু সে ওজন করে' করতে পারে। তার বেশী করতে গেলেই তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আজ-কালকার বহু স্বামীকে দেখি নিজের আফিস, ব্যবসা, ক্লাব, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এমন মশ্‌গুল থাকে যে, তারা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় ভুলে থাকে—গৃহে তাদের স্ত্রী নাম্নী একটি প্রিয় প্রাণবস্তু সামগ্রী আছে!

স্ত্রী যখন স্বামীকে ভালবাসে এবং স্বামী যখন স্ত্রীকে ভালবাসে, তখন আর চিন্তা কিসের? স্ত্রী তো শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাশুর-দেওর-ছেলে-মেয়ে-দাস-দাসী আর কাপড়চোপড়-গহনা নিয়ে সুখেই আছে; স্বামী যদি দু'দশ দিন কি দু'দশ মাস কাছে না থাকে, কাছে থেকেও দুটো হেসে কথা না বলে, তা'হলে তার কি-এমন ক্ষতি হবে?·· ভ্রান্ত ধারণা এটা। স্বামীর বাইরের প্রতি—অর্থ বা অনর্থকর কর্মের প্রতি বেশী আশক্তি ও বেশী মনোযোগ কোন স্ত্রীলোকই বরদাস্ত করতে পারে না। কাজ ও সখের জন্যে অনেক স্বামীকে রাত্রি দশটা এগারটা বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়, জীবনের অধিকাংশ সময় একাকী প্রবাসে কাটাতে হয়, পত্নী নিয়ে একত্র বাস করলেও মাঝে মাঝে অস্থায়িভাবে

অন্যত্র ছুটতে হয়। সেখানে গিয়ে কারো কারো পত্নীকে সময়মতো একখানা চিঠি লেখবার ফুর্সৎ থাকে না। তদুপরি স্বামী হয়তো স্ত্রীকে পেছনে ফেলে বন্ধুদের দিয়ে উদ্যান-ভোজে দেশ ভ্রমণে বা শিকারে যান্। শুধু কাজ আর কাজ, বন্ধু আর বন্ধু। স্ত্রীদের আর আফ্‌শোসের অন্ত থাকে না। স্বামীদের এই অনতিপ্রেত উপেক্ষাকে তারা শতবৃশ্চিকের দংশনের চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে করে। কেউ কেউ স্বামীদের নির্দয় ঔদাসীন্যের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়।

জুলে মিশেলে (Jules Michelet) নামক ঊনবিংশ শতাব্দীর এক নারীমনোবিশ্লেষক ঐতিহাসিক এক জায়গায় বলেছেন—"A woman's torment is not the man's tyranny but his indifference." কথাটা একেবারে খাঁটি সত্যি।....স্বামী নিকটে থাকতেও তাঁর প্রত্যক্ষ সমাদর ও সাহচর্যের অভাব—তাঁর মৃদু মৌন ভালবাসার লীলাভূমিতে দিন কয়েকের অকারণ তুহিনপাত—কোনো কোনো আবেগপ্রবণা নারীকে ম্রিয়মাণ করে, অসুস্থ করে, ক্ষিপ্ত করে। এমন কি, কোনো নারীর মনকে এক দুর্বল মুহূর্তে এক সহানুভূতিশীল স্বামিসখার প্রতি অযথাপ্রসন্ন করে দেয়। প্রসিদ্ধ কথাচিত্রের জাদুকর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর "রমলা" নামক উপন্যাসে এই মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করে' এক মনোজ্ঞ শিক্ষাপ্রদ আখ্যান গড়ে' তুলেছেন। যারা পড়নি, তারা বইখানা পড়ে দেখো একবার।

নিশুতি রাতের প্রেম

এইবার বিলাতী একখানা উপন্যাসের গল্প খুব ছোট্ট করে তোমাদের কাছে বলি। উপন্যাসখানার নাম *Midnight Love*, রেক্স্ রায়ান্ নামক এক ভদ্রলোকের লেখা।...ডোরীন্ নাম্নী একটি মেয়ে কন্‌ভেণ্ট থেকে পড়ত। সে কুরাল থিয়েস্ নামক এক ভদ্রবেশী সুমিষ্টভাষী

নামাজাদা জোচ্চোরের প্রলোভনে ভুলে তার সঙ্গে কন্‌ভেণ্ট থেকে আসে পালিয়ে। অল্পকাল মধ্যে জেম্‌স্ পেন্ নামক এক বিগত-প্রায়যৌবন অবিবাহিত ভদ্রলোক থিয়েস্‌র হাত থেকে ডোরীন্‌কে সুকৌশলে উদ্ধার করে' তাকে বিবাহ করেন।

প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী ও বিখ্যাত ধনী হল জেমস্ পেন্। সুরম্য হর্ম্যে দাসদাসী পরিবৃত হয় অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে সংসার পাতল ডোরীন্। স্বামীকে ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। যখন তিনি শহরে থাকেন, তখন আপিস্ কর্মচারি অর্থোপায়ের নতুন নতুন স্কীম্ নিয়ে থাকেন ব্যস্ত। দিনেরাতে স্ত্রীর কাছে বসে' দুটো হাসিঠাট্টাগল্প করার অবসর নেই তাঁর। সব দিন একসঙ্গে ডিনার-টেবিলে বসে' আহার করাও তাঁর ভাগ্যে জোটে না। থিয়েস্ প্রথমে জেম্‌স্‌এর আপিস সংক্রান্ত দু'একটি কাজ প্রায় নিঃস্বার্থভাবে সমাধা করে দিয়ে তার সুনজরে পড়্‌ল। তারপর তার পারিবারিক বন্ধু সেজে ডোরীনের সঙ্গে নতুন করে' আলাপ জমাল।

ডোরীন্ সারাদিন একলা থাকে। স্বামী কোন্ সকালে ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে আপিসে বেরিয়ে যান্ ডোরীনের নিজের একখানা মোটর আছে। ক্বচিৎ কখনো সে একটু বেড়াতে যায়, কখনো যায় সিনেমায়। কিন্তু কোথাও একলা গিয়ে তৃপ্তি পায় না—শান্তি পায় না। প্রকাণ্ড সোনার খাঁচায় যেন বন্দিনী বিহঙ্গিনী সে।...থিয়েস্ পুনরাবির্ভূত হয়ে তার নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা খানিকটা ঘুচিয়ে দিল! ক্রমশ থিয়েস্ ডোরীনকে কোকেন-সংমিশ্রিত ওষুধ খাইয়ে তাকে নেশায় আসক্ত করে' তুল্‌ল। কোকেন নইলে তার চলে না, থিয়েস্‌কে নইলে তার চলে না। থিয়েস্‌কে সে কোনদিনই সত্যিকারের ভাল বাসেনি, আজ তার মনে হ'ল থিয়েস্‌কে ছাড়া তার জীবন অভিশপ্ত। থিয়েস্ তার বিজন চিন্তাভারাক্রান্ত মুহূর্তগুলি সুমিষ্ট চাটুবাণীতে ভরে

দেয়, তাকে থিএটারে সিনেমায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তাকে সর্বদুঃখ-দুশ্চিন্তা-দুঃস্বপ্নহরা মহৌষধি খাইয়ে চুম্বন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যায়। সে দুষ্প্রাপ্য ওষুধের মোটা দাম নেয়, মাঝে মাঝে টাকা হাওলাৎ নেয়, নিক্ না! তার ঋণ অপরিশোধ্য।

শেষে থিয়েস্ তার জাল গুটোতে সুরু কর্ল। মাঝে মাঝে সে ডোরীনের সঙ্গে দেখা করতে আসে না, তাকে কোকেন যোগায় না নিয়মিতভাবে। ডোরীন আর থিয়েসের মাখামাখি দাসদাসীদের নজরে অনেক দিন আগেই এসেছিল; পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে এদের ব্যাপার নিয়ে খুব কানাঘুষো চল্ছিল। স্বামীর সন্দেহ জাগ্ল সকলের শেষে। থিয়েস্ যখন এসে একদিন ডোরীন্কে জানাল যে, তার পক্ষে ওর কাছে ঘন-ঘন আসা ও কোকেন যোগানো আর সম্ভবপর হবে না, কারণ তার স্বামী এত মেশামিশি সম্ভবত সুনজরে দেখ্ছেন না, তখন ডোরীনের মাথা গেল ঘুরে!

স্বামীর বিরুদ্ধে ডোরীনের পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ। স্ত্রীকে সে হীরেমুক্তোমণিজহরৎ মুড়ে দেবীমূর্তি করে বসিয়ে রেখেছে তার সংসার-মন্দিরের উঁচু পাদপীঠে; কিন্তু তার শত আকাঙ্ক্ষাকে সে উপেক্ষা করেছে, তার প্রাণসত্তাকে সে অস্বীকার করেছে। স্বামী হবার—প্রেমিক হবার অনুপযুক্ত সে। তার বোকামির শাস্তি ভোগ কর্তে হবে তাকে। থিয়েস্কে সে যতখানি না ভালবেসেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ভালবেসেছিল সে কোকেনকে; কোকেন যদি তাকে চিরনিদ্রার দেশে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত তাহলে সে বাঁচত। কোকেনের জন্যেই সে থিয়েস্কে ছাড়তে পারে না। তাই সে সোনার শিকল কেটে থিয়েস্ের সঙ্গে দূর দিগন্তে উড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

জেম্স্ একেবারে হাতেনাতে আসামীকে ধরে' ফেল্লেন।

আসামী লজ্জিত হ'ল না তাতে, বরং গ্রেপ্তারকারীকে লজ্জা দিল। সে প্রাণের দরজা খুলে তার এতদিনের পুঞ্জীভূত অনুযোগ ও আফ্শোষের ক্লেদ লাভার মতো দিল বার করে'। স্বামীর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সে যে ছোটখাটো একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিল সেটা আগাগোড়া অনুবাদ করে' তুলে ধর্ছি তোমাদের সামনে। স্বর্ণমৃগের নিত্য-পশ্চাদ্ধাবনকারী পতিদের বিশেষ করে' পড়তে বলি এই অংশটুকু।—

"হ্যাঁ, তুমি তোমার অফিসের ব্লটিং কাগজখানার জন্যে যে যত্ন নাও, আমার জন্যে ততখানি নাও না। তুমি হাজার হাজার স্বামীদেরই একজন। তুমি মনে কর যে, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভক্তি কর্বে বিশ্বাস করবে ভালবাসবে—তোমার কাছ থেকে হৃদয়ের কোন পরিচয়ই না পেয়েই, তোমার কাছে সুশীলা ও সতী থাকার কোন অনুপ্রাণনা না পেয়েই! তুমি আমাকে দিনের পর দিন বাড়িতে একলা ফেলে রেখে গেছ। রাত্রিতে যখন বাড়ি ফিরেছ, তখন আমাকে একটু স্নেহ-সম্ভাষণ করনি, আমার সঙ্গে একটু হেসে কথা কওনি; তার বদলে পেয়েছি ভ্রূকুটি আর অনুযোগ। শুধু কাজ আর ঘুম, ঘুম আর কাজ। তোমরা পুরুষরা মেয়েমানুষদের কি মনে কর? কাঠি না পাথর? পোষা কুকুর-বেড়াল? ভুল। তোমরা যে জগতের মানুষ, আমরাও সেই জগতের। আমরাও মাঝে মাঝে পরিবর্তন চাই, কিছু আমোদপ্রমোদ চাই, কিছু প্রিয়জনের সঙ্গ ও আদরসোহাগ চাই। কাজেই আমাদের স্বামীরা যখন এসব আমাদের দিতে পারে না বা দিতে চায় না, তখন আমরা অন্য মানুষের দিকে তাকাতে বাধ্য হই। অমনি তোমরা আমাদের চেপে ধর, আমাদের অবিশ্বস্ততার জন্যে মাথার ওপর যত কিছু রুদ্র অভিশাপ বর্ষণ কর। কিন্তু এই অবিশ্বস্ততার মূলে তোমরাই ঠেলে দাও আমাদের।"....

বাস্তব জীবনের উপেক্ষিতা

আমাদের দেশে ভোরীন্ আর জেম্‌স্ হাজার হাজার আছে; থিয়েসেরও অভাব নেই। যেখানে থিয়েস নেই, সেখানে দেওর আছে—প্রতিবেশী যুবক আছে। যেখানে তা-ও নেই, সেখানে ভদ্রেতর কুটনী বা দূতী আছে। কাব্যের উপেক্ষিতা আর বাস্তব জীবনের উপেক্ষিতা এক নয়; এরা কদাচিৎ স্বামীর নির্লজ্জ উদাসীনতা বা উপেক্ষাকে মার্জনা করে।

বিবাহ-জীবন যতই পুরোনো হয়ে যাক্ না কেন, স্বামীর উচিত স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা, থিএটার, সার্কাস্ বা প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া; এবং শত কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু সেবা চাওয়া ও তার সঙ্গে দুটো-চারটে মিষ্টি কথার বিনিময় করা। আপিসের সময়টুকু ছাড়া স্বামী যদি বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও যান্, তাহলে সর্বক্ষেত্রে যেন স্ত্রীকে বলে যান্—কোথায় কার কাছে কি কাজে যাচ্ছেন এবং কখন ফিরবেন। এ রকম বলে' যাওয়ার একটা বস্তুনিষ্ঠ ও একটা ভাবনিষ্ঠ সার্থকতা আছে।

আজকাল কলকাতা ও অন্যান্য ছোটবড় শহরে দেখা যায় যে, ট্রামে বাসে রিক্সায় চড়ে' বা পায়ে হেঁটে দুপুরবেলা (স্বামী-ভাশুর-দেওররা আপিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর) বাড়ির বধূরা একাকিনী অথবা একটি ছোট ছেলে-মেয়ে অথবা কোন প্রতিবেশিনীকে সঙ্গে নিয়ে বেপাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। কেউ-বা হাট-বাজারে যান, কেউ কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেও যান। কেউ-বা স্বামী কিংবা শাশুড়ির অনুমতি না নিয়েই সুবিধামতো এক বা একাধিক প্রতিবেশিনী, দেওর বা ভাশুর-পোর সঙ্গে বায়োস্কোপ প্রতিমা দেখতে,

পার্বণ-স্নানে, মিটিংএ, সিনেমায় বা থিয়েটারে চলেছেন। বহু একালিনী নায়িকা একাকিনী হোটেল-গমনে বা দূরাঞ্চল-পরিভ্রমণেও কুণ্ঠিত নন্।

অনেক সময় স্বামী কাজে ও অকাজে ব্যস্ত থাকেন। অন্য সময় তাদের ইচ্ছে থাকলেও ফুর্সৎ থাকে না, আবার কখনো ফুর্সৎ থাকলেও ইচ্ছে হয় না। কেউ কেউ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরুতে লজ্জা বোধ করেন। কেউ কেউ স্ত্রীর বাড়ির বাইরে যাওয়া ও থিয়েটার-সিনেমা দেখে বাজে পয়সা খরচ করাটা পছন্দ করেন না; তাই স্ত্রীরা স্বামীকে না জানিয়েই বাইরে বেরোন্ ও বাজে খরচ করেন। এই রকম বেরোনায় আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও নৈতিক অধোগতি কতখানি হবার সম্ভাবনা থাকে, তার সমর্থনসূচক অনেক ঘটনা আমার কানে এসেছে। কিন্তু তার একটা বল্‌তে গেলেও আমার জায়গায় কুলোবে না। দুটো-একটা বলেছি আমার "নারী বিপথে যায় কেন" নামক বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে।

সঙ্গ ও সহবাস

দাম্পত্য জীবনে 'সঙ্গ' শব্দটা বল্‌তে আমরা পুরুষরা খুব সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তার অর্থ ধরি। নারীরা সচরাচর কিন্তু তা বোঝে না, বোঝাতে চায় না। আসলে সঙ্গ মানে ইংরাজীতে যাকে আমরা company, companionship, communion বুঝি—তাই। 'সহবাস' শব্দটার অর্থও আমরা পুরুষরা জোর করে' অবনতির ধাপে নামিয়ে এনেছি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—একত্র অবস্থান, ঘন সান্নিধ্য ভোগ, living together। বৃহত্তর ও মহত্তর অর্থেই পত্নী চায় পতির সঙ্গ ও সহবাস। কিন্তু বৃহত্তর ও সঙ্কীর্ণতর দুই অর্থেই সঙ্গ ও সহবাস আধুনিক পুরুষ পত্নীকে দেয় বিয়ের পর কয়েক মাস বা বড় জোর কয়েক বছর পর্যন্ত। তারপর জীবনাহবের আহ্বান তাকে ঘরের

বাইরে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যায়; নিত্য সে ঘরে ফেরে অবসন্ন, বিষণ্ণ ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে। অবসর থাকলেও সে স্ত্রীর সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না; থাকলে হাঁফিয়ে ওঠে।

গাঢ়তম সোহাগ-আদর পাবার—রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত হবার জন্যেই যে পত্নী তার স্বামীকে দিনের কতকাংশ ও রাতের অধিকাংশ সময় কাছে পেতে চায়, অতি-কামুকী স্ত্রী সম্বন্ধেও এ অপবাদ দিতে যাওয়া ভুল হবে। অনেক স্ত্রীই স্বামীর দুটো বিনয় বচন, একটু তত্ত্বাবধান, একটু পেলব করস্পর্শ, একটু নিভৃত আলাপ, চকিতে-এঁকে-দেওয়া একটি মৃদু চুম্বনেই রতিসুখের অনুরূপ আনন্দ অনুভব করতে পারে। সুস্থ বা অসুস্থ স্বামীর ছোট-বড় সেবার মধ্যেও তাদের আনন্দের গুচ্ছমূল থাকে লুকিয়ে। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ্যার্থবোধক সহবাসেরও প্রয়োজন হয়।

সতী, সুশীলা, নিত্যগৃহকর্মরতা নারীর এ ক্রিয়াটিরও প্রয়োজন অতি অল্প বা নামমাত্র হয়, বিশেষত দু'টি একটি সন্তান-প্রসবের পর,—এই ধারণাটা অনেক উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান স্বামীর মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বরং কোন কোন নারীর একটি বা দু'টি সন্তান হবার পর কামেচ্ছা ও কামানুভূতি পূর্বাপেক্ষা বাড়ে, ভেতরকার জড়তা ও ভীরুতা যায় কেটে। প্রবল ইচ্ছা হ'লেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ না করা এবং অধীরতার কূলে দাঁড়িয়ে সলজ্জ নিস্পৃহার উত্তরীয় গায়ে জড়ানো—স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। তবে যদি দেখা যায় যে, নিশীথবিহারে বিয়ের দু'বছরের মধ্যে যারা একদিনও উপযাচিকা বা অগ্রবর্তিনী হ'ল না, অন্ততপক্ষে ভাবে-ভঙ্গীতে-লীলা-লাস্যে পুরুষকে উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস করল না, তা'হলে বুঝতে হবে—হয় তাদের কামাবেগ অত্যন্ত অল্প, নয় কামচর্যায় পুরুষ তাদের কখনো তৃপ্ত করতে পারেনি, পাচ্ছে না। যাহোক্, Balzacএর একটা কথা এইসূত্রে আমার পুরুষ শ্রোতাদের

শুনিয়ে দিতে চাই; তিনি বলছেন—"We should not forget that the chastest wife can be most voluptuous."

বধূদের সবাইকে বলে রাখি যে, তোমরা স্বামীর ওপর এমন মায়া-জাল বিস্তার করবে যে, তারা শুধু নিজের দেহের বা মনের প্রয়োজনেই তোমাদের কাছে এগিয়ে আসবে না, তোমাদের দেহের বা মনের প্রয়োজনে তাদের টেনে আনতে পারবে এবং ইচ্ছামতো ধরে রাখতে পারবে তোমাদের কাছে। কিন্তু এমনভাবে তাদের পোষ মানাবে না যাতে করে' তাদের বাধ্যতা একান্নভুক্ত সংসারের অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টিকটু হয়, ওদের প্রতি কোন অবিচারে নিয়োজিত হয় অথবা স্বামীর অর্থোপার্জনে কোন বাধার সৃষ্টি করে। ছুটির দিনে যদি কোন স্বামী নিজের শয়ন কক্ষ থেকে বেরুতে না চায়—শুয়ে-বসে গল্প করে' কাটাতে চায়, তাহলে তাকে জোর করে' সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে বলবে একটু পার্কে বা বন্ধুবান্ধব-মহলে ঘুরে আসতে। যত বেশী কাছে থাকতে দেবে তাদের, তত বেশী তারা তোমার ত্রুটি দেখার সুযোগ পাবে—তত বেশী তাড়াতাড়ি তারা তোমার প্রতি আগ্রহ হারাবে।

তোমাদের আগেই বলেছি যে, বিয়ের এক-দেড়-দু' বছর পর থেকে অথবা একটি সন্তান হবার পর থেকে পৃথক পৃথক শয্যায় শোবার ব্যবস্থা করো। আর একটা কথা বলে' রাখি এই সূত্রে। যতটা পারো স্বামীর কাছে ফিট্‌ফাট্ পরিষ্কার-ঝরিষ্কার থাকবে। নিতান্ত অসুস্থ না হ'লে বিমূত্র ত্যাগ স্বামীর সামনে করবে না। নোংরা অবস্থায় তাদের ফাই-ফরমাস্ খাটতে সামনে আসবে না। স্বামীর সামনে লজ্জা করার কিছু নেই বলে দিনের আলোয় তার সামনে কখনো বিবস্ত্রা হবে না—মুক্তস্তনা হবে না; এমন কি ছেলেপিলে হবার পরও নয়। রমণ-কালে স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও নিজের হাতে সর্বাঙ্গের বসন উন্মোচন করো না; একাধিক বার অনুরুদ্ধ হলে কোমরের কসি ঢিলে

করে' দেবে, বাকিটুকুর ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দেবে। মোট কথা, তাদের কাছে dirt-cheap হবে না কোন অবস্থাতেই। অর্থনীতির ভাষায় বলি—চাহিদার অনুপাতে সওদা বরং একটু কম করেই যোগাবে।....কারো চোখ থেকে রোম্যান্সের কাজল যেন আজীবন না মোছে। অতি-পরিচিতির সমারোহের মধ্যেও যেন একটা অপরিচিতির মোহন সুর কানের কাছে বাজতে থাকে।

স্বামীদেও দু' একটা কথা বলি। তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক, গবেষক, শিল্পী, দেশাবিষ্কারক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নিয়ত ভ্রমণকারী, দেশনেতা, দীর্ঘ একক-প্রবাসী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা রকমের নেশা ও পেশাগ্রাহী লোক আছ। যারা সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার প্রবাস থেকে স্বগ্রামে এসে অন্তত একদিনের জন্যেও পত্নী-সহবাস করার সুযোগ পায় তাদের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। কিন্তু যারা বছরে দু'বার বা একবার এসে দিন কয়েকের জন্যে পত্নীমুখ দর্শন করে' ফিরে যায়, তাদের জন্যে আর তাদের পত্নীদের জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়। প্রতিনিয়ত অতৃপ্তি ও কামনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এরা দু'দলেই দেহমনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে; নিত্য এরা চার পাশে প্রলোভনের হাতছানি দেখে শিউরে ওঠে—গুম্‌রে মরে। এই সব দীর্ঘ-প্রোষিত স্বামীদের মধ্যে যদি শতকরা পঞ্চাশজন চরিত্র হারায়, তাহ'লে যেমন তাদের দোষ দিতে পারি না, তেমনি ওই সব প্রোষিতভর্তৃকাদের মধ্যে যদি শতকরা দশজন নীতির বাঁধাঘাটে পা পিছলে পড়ে, তা'হলে তাদেরো অনুকম্পা না ক'রে পারি না।

কেউ কেউ আছে যাদের বউ নিয়ে প্রবাস-বাস করার মতো সঙ্গতি আছে, কিন্তু করতে চায় না নানা কারণে। কারো মেস্-হোটেলের প্রতি একটা অহেতুকী মোহ আছে—যদিও তারা

ওখানকার রান্না ও সেবার শতমুখে অপ্রশংসা করে। আসলে এদের অনেকেই একাকী স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতার হাঙ্গাম পোয়াতে চায় না। দ্বিতীয়ত, বাপমায়ের অতিভক্ত ছেলেরা পাছে তাঁদের সেবাযত্নের ত্রুটি হয়—পাছে তাঁরা মনে করেন 'ছেলে বুঝি আমাদের পর হয়ে গেল, এইবার বোধহয় দেশে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবে',—এই ভয়ে স্ত্রীদের যতদিন পারে দেশে ফেলে রাখে। এরা পিতামাতার প্রতি কর্তব্যটাকেই বড় দেখে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। অর্থাৎ তারা বঞ্চনা করে, বঞ্চিত হয়।

অভিনেতা, গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, নেতা, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের সংসারে পত্নীরা প্রায়ই সুখী হয় না। তার প্রথম কারণ এঁদের ভাগ্যে প্রায়ই মনের মতো পত্নী জোটে না, জুটলেও এঁরা তাদের প্রতি প্রায়ই অবিচার করেন। এঁরা স্ত্রীর চেয়ে বেশী ভাল বাসেন নিজেদের কর্মসাধনাকে, যশকে আর অপরের স্তুতিবাদকে। এর মধ্যে স্ত্রীর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ দান ও অনুপ্রাণনা কিছু থাকলেও তাকে তাঁরা বড় করে' দেখতে পারেন না। অবিশ্রান্ত উভয়জাতীয় স্তাবকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্রোতে ভেসে তাঁরা কেন্দ্রবিমুখ হয়ে পড়েন, নতুবা নিদিধ্যাসনে অবিশ্রান্ত নিমগ্ন থেকে তারা কেন্দ্রকেই ঠাঁই-নাড়া করেন। নিতান্ত পীড়াদায়ক আধিভৌতিক প্রয়োজন না হ'লে এঁরা স্ত্রীকে পটভূমিকা থেকে সাম্‌নের দিকে টেনে আনতে চান্ না। স্ত্রীর প্রগাঢ় যৌবন, প্রখর রসনা বা নীরব অশ্রুজল—এদের প্রায়ই রাখে চির-অচঞ্চল, তুহিন-শীতল।

কার্লাইল্ দম্পতি

মিসেস্ কার্লাইলের কথা মনে পড়ছে এখানে। স্বামিস্ত্রীতে বনিবনাও হয়নি কখনো। সময় বিশেষ দু'জনেই নরম, দু'জনেই

গরম হ'তেন; কিন্তু পরস্পরের প্রতি অন্তরে-অন্তরে একটা দুর্নিবার মোহ ছিল তাঁদের। এক-একখানা বই লিখ্‌তে বস্‌লে মিস্টার কার্লাইলের হুঁস থাক্‌ত না যে, তাঁর পুঁথিঘরের দ্বারের বাইরে দারা বলে' একটি সজীব পদার্থ আছে—সংসারের বাইরে একটি চলমান বিপুল বিশ্ব আছে। *Sartor Resartus, French Revolution, Hero and Hero-Worship* প্রভৃতি এক একখানা বই লেখা সুরু হ'ত আর মিসেস্ কার্লাইলের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত। স্ত্রী দু'দিন রোগে পড়ে কাৎরাচ্ছেন, স্বামী তাঁর চিলে-কোঠায় বসে' দিনরাত্রি পাণ্ডুলিপি লিখ্‌ছেন। দাসীতে আহার্য জুগিয়ে আস্‌ছে, নির্বিবাদে খেয়ে যাচ্ছেন; তা একবার জিজ্ঞাসা করা নেই—স্ত্রী কি কচ্ছে, কেমন আছে, তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না কেন!

Frederick the Great বইখানা লিখ্‌তে কার্লাইলের প্রায় তেরো বছর লেগেছিল। এই তেরো বছরের মধ্যে তেরোটা দিনও তিনি মিসেস্ কার্লাইলের শয্যাসঙ্গী হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ; সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেছে তাঁর সঙ্গে ভালো করে' একটা কথা কইবারও ফুর্সৎ পান্‌নি। স্ত্রীলোকের প্রাণ তো! যাকে তারা ভালবাসে, তাকে একটু দেখ্‌তে—তার সঙ্গে দুটো কইতে—এমন কি তার সঙ্গে একটু ঝগড়া কর্‌তে পার্‌লেও তারা খুশী হয়। মিসেস্ কার্লাইল্ একদিন পশম নিয়ে সেলাই কর্‌তে করতে স্বামীর পড়ার ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। দেখ্‌লেন যে, স্বামী একমনে লিখে চলেছেন। চুল রুক্ষ, গাল বসে গেছে, চোখের কোলে কে কালি মেড়ে দিয়েছে। দেখে ভারী কষ্ট হ'ল। ইচ্ছে কর্‌ল চুলগুলোয় একটু হাত বুলিয়ে, ব্রুশ্ করে' আঁচ্‌ড়িয়ে দেন্। কিন্তু কাছে যেতে সাহস হ'ল না।

খানিকক্ষণ আপন মনে কাঁটা চালান্ আর মুখ তুলে এক-একবার স্বামীকে দেখেন; যদি মুখ ফিরিয়ে একটা আদরের কথা বলেন!

একটু পরে মিঃ কার্লাইল্ বল্‌লেন, "ওগো, এখানে গোলমাল ক'রো না। তোমার বোনার কাঁটার শব্দ আমার কানে এসে বিঁধ্‌ছে।" তখন মিসেস্ কার্লাইল্ আর করেন কি, আস্তে আস্তে পশম আর কাঁটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে চুপটি করে' কাঠের পুতুলের মত বসে রইলেন। খানিকক্ষণ বাদে আবার কার্লাইল্ মৃদুস্বরে বল্‌লেন, "দেখ, তোমার নিঃশ্বাস বড় জোরে জোরে পড়্‌ছে। ওর শব্দে আমার লেখার ব্যাঘাত হচ্ছে।"....নিঃশ্বাস বন্ধ করে' তো আর বসে থাকা যায় না, কাজেই মিসেস্ কার্লাইল্ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।....

আধিপত্য-বিস্তারের প্রয়াস

এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তোমাদের প্রসঙ্গান্তরে বলেছি। এত বলেছি যে, আর নতুন করে' বোধহয় কিছু বলার দরকার হবে না। অনেক সময় স্বামীর ওপর স্ত্রীর অথবা স্ত্রীর ওপর স্বামীর একাধিপত্যের প্রয়াস বিবাহজীবনকে বিষময় করে' দেয়। বিয়ের পর ভালবাসা একটু দানা বাঁধ্‌তে না বাঁধ্‌তেই স্বামী মনে করে—আমার ব্যক্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই রইল, স্ত্রী তার ব্যক্তিত্ব হারাল, সে স্বামী-অন্ত-প্রাণ হয়ে রইল, তার আর আপনার বলতে কেউ রইল না। স্ত্রীকে ডেকে সে বল্‌ল, "যৎ করোসি যদশ্নাসি....তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।" আবার স্ত্রীও ঠিক ঐ কথা ভাব্‌ল, আমি বাপ-মা-ভাই-বোন ত্যাগ করে পরের ঘরে বাসা বাঁধ্‌লুম কার জন্যে? যে যদি আমার না হয়, তার সমস্ত সত্তা যদি আমাতে মিশিয়ে না দেয়, তাহলে আমি কি বাঁদীগিরি কর্‌ব সারাজীবন এখানে?

ভালবাসার প্রথম অবস্থায়—কাঁচা অথবা ফিঁকে ভালবাসায় এই রকম স্বত্বস্বামিত্ব নিয়ে কচ্‌লাকচ্‌লি চলে। ভালবাসা গভীর হলে'

এবং উভয়পক্ষে সমান হলে' তখন কে বড় কে ছোট কে কার তাঁবে —এই নিয়ে বোঝাপাড়া, রেষারেষির দরকার হয় না। তখন সময় বিশেষে দু'জনেই প্রভু, দুইজনেই দাস, দু'জনেই গুরু, দু'জনেই শিষ্য। তার মধ্যে ঈর্ষা, সন্দেহ, বিদ্বেষ, বিভেদ, বিরাগের কোন স্থান নেই। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচ রকম রস আস্বাদন করতে করতে প্রেমের পরিপূর্ণ সিদ্ধির চরমপ্রান্তে পৌছনো যায়। ভালবাসার সেই পরম সাধনায় তোমরা ক'জন মাততে পেরেছ—বলতো ?

স্বামিস্ত্রী উভয়েই তুল্যমূল্য। আপন-আপন কর্ম-গণ্ডীর মধ্যে উভয়েই প্রধান; পরস্পর পরস্পরের সুখ-শান্তির জন্যে—আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্যে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একজনকে ছোট করে' —দাবিয়ে রেখে—অসুখী করে' অন্যজন বড় হতেও পারে না, সুখী হতেও পারে না। বিশ্বাস করো—তোমরা কেউ কারো ব্যক্তিত্ব হারাও নি; যদি হারিয়ে থাক তো উভয়েই হারিয়েছ। বিয়ে করেছ বলে' তোমাদের কারো গুরুত্ব কমে নি—বরং দায়িত্ব বেড়েছে উভয়েরই। একজন তার প্রয়োজন সাধনের জন্যে অন্যজনের কাছে সব সময় হাত পাতবে, লজ্জা নেই তাতে। কিন্তু কেউ কারো কাছে অন্যায় আবদার করবে না, আকাশের চাঁদ চাইবে না। বিয়ে করা মানেই হ'ল—যার যেটার অভাব, তার সেইটার পারস্পরিক পরিপূরণ; দু'দিক থেকেই চাওয়া, দুদিক থেকে দেওয়া। এবং চাওয়ার চেয়ে বেশী দিতে তৈরি হওয়া।

অনেক স্বামীদের দেখেছি বিয়ের পর বউরা ঘন-ঘন বাপের বাড়ি যেতে চাইলে রাগ করে, অভিমান করে, তার ভালবাসার ওপর সন্দিহান হয়। শুধু তাই নয়, বাপের বাড়ি থেকে ঘন-ঘন বাপভাইরা দেখা করতে এলে মনে মনে চটে; আবার বউরা সেখানে ঘন-ঘন

চিঠি লিখলেও রুষ্ট হয়। [অথচ বাপের বাড়ি গিয়ে একদিন চিঠি লিখতে দেরি হলে স্বামীর কত অনুযোগ, কত অভিমান!] এ রকম অন্যায় রাগ যেন তোমাদের মধ্যে কোন স্বামী না করে।

আবার এমন বউও আছে—যারা দু'দিন শ্বশুরবাড়ি এসেই স্বামীকে তার পোষা কুকুরটি করে' রাখতে চায়—ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা তারা স্বামীকে একলা ভোগ করতে চায়। স্বামী যদি বৌদির সঙ্গে একটু হেসে কথা কইল অথবা বৌদি যদি তার সাক্ষাতে দেওরকে একটু নিষ্প্রস্তরের ঠাট্টা করল, তাহলে অমনি বৌয়ের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। স্বামী তার নিজের ছোট বোনকে যদি একখানা ভাল সাড়ি কিনে দিল কি মিষ্টি খেতে দুটো টাকা দিল অথবা বিধবা মায়ের জন্যে একটা গরদের কাপড় কিনে আনল কি অসুখাচির জন্যে দু' টাকার আম আর এক টাকার সন্দেশ কিনে আনল, অমনি বউয়ের মুখখানা হ'ল আষাঢ়ের নিকষ-কালো আকাশ! ছিঃ!

কোন কোন শিক্ষিত সেয়ানা বউ নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে' শ্বশুররাড়ি আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্বে একটু আঘাতের সম্ভাবনা দেখলেই অমনি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করে। নিজের ব্যক্তিত্বকে অন্তত আট আনা পরিমাণে যে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়, তার বিয়ে করাই উচিত নয়। অনেক মেয়েই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বাপের বাড়ির তুলনা করে, বাপমায়ের সঙ্গে শ্বশুরশাশুড়ির তুলনা করে। সেখানে যা পেয়েছে এখানে যদি তার অভাব দেখে, তাহলে তার ক্ষোভের আর অন্ত থাকে না। আবার সেখানে যে সব অভাব ছিল, সে সবের পরিপূরণ যদি এখানে না হয়, তাহলে তার মনের বয়লারে রোষের বাষ্প জমাট বেঁধে ওঠে।

এরা স্বামীকে সর্বতোভাবে পেতে এবং তাঁর রোজগারে পুরোপুরি ভাগ বসাতে তাঁকে নিয়ে ছোট্ট একটি 'নীড়' বাঁধতে চায়—যেখানে

অনভিপ্রেতের ভিড় হবে না মোটেই, আর যার সর্বময়ী কর্ত্রী হবে সে-ই। এই সব মেয়ে স্বামীকে নিয়ে একলা সংসার পাতলেও সব ক্ষেত্রে যে নিজে সুখী হয় এবং স্বামীকে সুখী করতে পারে—এমন নয়। তারা মানিয়ে-গুছিয়ে ক্বচিৎ সংসার করতে পারে এবং ঝিচাকরের হাতে পদে পদে ঠেকে ও ঠকে। একদিন ঝি বা পাচক কামাই করলেই, তাদের চক্ষু কপালে ওঠে। স্বামীর বা নিজের অসুখের সময় তারা একটি আপন জনের অভাব রূঢ়ভাবে অনুভব করে। গরিব স্বামীকে তারা বিনীত ক্রীতদাস করতে পারলে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হয়। সচ্ছল স্বামীকে তারা মনের মতো করে' গড়তে পারলে তাকে obliging friend হিসাবে দেখতে রাজি হয়।

আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই ওপরের বর্ণনার সঙ্গে খাপ্ খাওয়ার মতো কোন মেয়ে নেই! তোমাদের দু'দলকেই বলে' রাখছি—সংসারে বাস করতে গেলে ঝগড়া হবে, মতের অমিল হবে, মন কষাকষি হবে। কিন্তু কেউ যেন নিজের মতকে অভ্রান্ত বলে' জিদ্ করে' ঝগড়ার শক্তি ও পরমায়ুকে বাড়িয়ে দিয়ো না। একজন পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে'—বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় হয়েছে বলে'—রোজগার করে' অন্যজনকে খাওয়ায় বলে' বড় নয়।

যে মেয়েরা অন্তত পুরুষের সমকক্ষ বলে নিজেদের মনে কর, তাদের বলি—পুরুষদের ভাবরাজ্যে প্রবেশ করবার, তাদের অভাবগুলি পরিপূরণ করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধিশক্তি সঞ্চয় কর; তাদের সুখের ভাগ সাত আনা ও দুঃখের ভাগ ন' আনা নিতে শেখ, তাদের মতবাদ ও লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে শেখ, তাদের কাছে নিজেদের অনিবার্য করে' তোল; তা'হলে দেখবে তারা তোমায় উপযুক্ত মর্যাদা দেবেই; হয়তো তোমার ওপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে তোমার দাসত্ব করবার জন্যে আপনা-আপনি প্রস্তুত হয়ে' পড়বে।

পঞ্চম আলাপন

আরো কারণ ও প্রতিকার

ঈর্ষা, আলস্য, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি

অল্পে যাদের মন ওঠে না, সর্বদা অপর পক্ষের কাজে খুঁৎ ধরে, যারা তীব্র সমালোচনা করে অথচ নিজেরা কাজ করে' দেখিয়ে দিতে পারে না, তাদের পক্ষে বিবাহজীবনে সুখের আশা করতে যাওয়া বাতুলতা। এই জাতীয় লোকই ঈর্ষাপরায়ণ হয়; পরের কাজ করার শক্তিকে—পরের রূপযৌবনগুণকে হিংসা করে। যখন ভালবাসার সোনায় সোনার ওজনের চেয়ে বেশী করে' খাদ মেশানো থাকে, তখন সে খাদের নাম হয় ঈর্ষা। যার ভালবাসা হাঁটে কানা গলি দিয়ে, তার ঈর্ষার রথ ছোটে রাজপথের মাঝখান দিয়ে!···

স্বামী কবি বা ঔপন্যাসিক। তাঁর কাব্য বা উপন্যাসের প্রশংসা করে' কত যুবকযুবতী প্রৌঢ়প্রৌঢ়া পত্র লেখে; কেউ কেউ দেখা করতে আসে, কেউ-বা তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে' খাওয়ায়। বউ তা সহ্য করতে পারে না। স্বামী ভাল কাব্য বা ভাল উপন্যাস লিখতে পারেন, তাই বলে' লোকের—বিশেষ করে' যুবতীদের এত প্রশংসা পাওয়া তাঁর উচিত নয়! যুবতীদের মধ্যে যারা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদের কাউকেই সে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে' যখন তারা তাঁর কাব্য সম্বন্ধে ভাবগম্ভীর আলোচনা করে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে হাস্য-পরিহাসযুক্তিতর্ক-মণ্ডিত আলাপ জমায়, তখন স্ত্রীর তাতে যোগ দেবার প্রবৃত্তি হয় না কখনো। ওই সব অতি-প্রগল্‌ভাদের সঙ্গে কথা বলতেও

তার ঘৃণা হয়। স্বামী তাদের একটু চা তৈরি করে' দিতে বললে স্ত্রী বেশ দুটো ঝাঁঝালো কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে সে হুকুমটা চাকরের ওপর চালান করে' দিতে বলেন।···ঈর্ষা!

মন্দিরার বাপের বাড়িতে এক ছোক্‌রা মাস্টার ছিল, নাম তার ধর—অনুকূল বক্সী। ছোট একটি ভাই আর একটি বোনকে পড়াত, আর ওকেও মাঝে মাঝে পড়া বলে' দিত। গরিবের ছেলে, ওদের বাড়িতেই থেকে-খেয়ে পড়ত। ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালো বলেই সবাই জানে। আই-এস্‌সি পাশ করে' আর পড়তে পারে নি; কলকাতায় যুদ্ধের হিড়িকে বহু কষ্টে একটা অস্থায়ী চাকরি জুটিয়েছে। মন্দিরা বিয়ের পর কলকাতায় প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। তার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে' নিয়ে অনুকূল এল একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কে বউমা?" বউমা উত্তর করল—"ও আমাদের অনুকূল-দা।" ব'লেই তাড়াতাড়ি সে চা তৈরি করতে চলে গেল।

বাইরের ঘরে অনুকূলদার সঙ্গে কত সব পুরোনো গল্প, তাদের হাল জীবনের খোঁজখবর নেওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। যে ঘরে বসে তারা গল্প করছিল, তার সাম্‌নে দিয়েই আপিস্ থেকে প্রত্যাগত স্বামী ওপরে চলে গেলেন। অনুকূল বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল; মন্দিরা বলল, "ব'সো একটু অনুকূল দা, আসছি এখুনি।" বলে' সে শোওয়ার ঘরের দিকে গেল চলে। স্বামী অনুকূলকে কখনো দেখেন নি। স্ত্রীর কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বাথরুম্ থেকে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বস্‌তেই মন্দিরা স্বামীকে বল্ল, "হ্যাঁগা, অনুকূল-দা'র সঙ্গে একটু আলাপ করবে? বড় ভালো লোক। আমি বসিয়ে রেখে এসেচি ওঁকে।" স্বামী একটু ভ্রূ কুঁচকিয়ে স্বরে রুক্ষতার আমেজ মিশিয়ে বললেন, "আফিস থেকে খেটেখুটে এলুম—এখন কি আলাপ

কর্বার সময়? আর, তোমার বাপের বাড়িতে কবে কে মাস্টার ছিল, কি আলাপই বা করব তার সঙ্গে? অনাত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশা এ বাড়িতে পছন্দ করে না কেউ—বুঝলে?" মন্দিরা তাড়াতাড়ি অনুকূল বক্সীকে বিদায় দিয়ে গম্ভীর মুখে ফিরে এল ঘরে।····ঈর্ষা!····

স্ত্রী আই-এ পাশ, স্বামী এম-এ। কৈশোর কাল থেকেই মেয়েটার কবিতা লেখা অভ্যাস। কলেজে পড়বার সময় তার গোটা কয়েক কবিতা ভালো ভালো মাসিক ও সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। তা' ছাড়া রেডিওতে সে বার দুয়েক গান গেয়েছে! বিয়ের পরও সে মাঝে মাঝে কবিতা লিখে মাসিক পত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠায়। স্বামী পড়ে' 'বাঃ খাসা হয়েছে' বলেন, কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর কবিতা লেখার ক্ষমতা আর ছাপার অক্ষরে নাম প্রকাশটাকে খুশির চক্ষে দেখেন না। শেলির কবিতার ওপর সমালোচনামূলক একটা প্রবন্ধ লিখে একদিন তিনি স্ত্রীকে লুকিয়ে একটা ইংরাজী দৈনিকের রবিবাসরীয় স্তম্ভে প্রকাশের জন্যে পাঠালেন। সপ্তাহ দেড়েক বাদে সেটা অমনোনীত হয়ে ফেরৎ এল। তারপর তাঁর ধারণা হ'ল, সম্পাদকরা লেখার গুণ দেখেন না, বেশীর ভাগ প্রবন্ধ-কবিতাদি ছাপেন খাতিরে।

একবার কোন একটি সাপ্তাহিকের বিশেষ শারদীয়া সংখ্যায় স্ত্রীর একটি কবিতা আর ফটো প্রকাশিত হ'ল। আর যাবে কোথায়? স্বামী তো মহাচটিতং। "ছিঃ, ভদ্রমহিলার ছবি—এ রকম করে'; না, বিনু, এসব আমি পছন্দ করি না। বাবা দেখ্‌লেই বা কি বল্‌বেন?"····এ স্রেফ হিংসা, বুঝ্‌ছ তো?····

স্বামীর বন্ধুরা প্রায়ই ছুটির দিন বাড়িতে এসে তাঁকে মোটরে তুলে নিয়ে যায় বায়োস্কোপে থিএটারে মৎস্যশিকারে; স্ত্রী তাতে মনে মনে বেশ চটেন। তিনিও জা, আইবুড়ো ননদ বা দেওর অথবা তদভাবে প্রতিবেশিনীদের কারো সঙ্গে বায়োস্কোপ-থিএটার দেখ্‌তে যান

কোনো কোনো দিন। সখ মিটোবার জন্যে যদি মাসে একদিন যেতেন, স্বামীর ওপর ঝাল মিটোবার জন্যে যেতে লাগলেন' সপ্তাহে একদিন করে'। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চড়ে' বোনের বাড়িও বেড়িয়ে আসেন।....

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, "Jealousy is a passion desirous of creating suffering." ঈর্ষা হ'ল দুঃখকষ্ট-সৃষ্টিকামী হৃদয়াবেগ। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেয়, নিজেও দুঃখ পায়। প্রায় ক্ষেত্রেই ঈর্ষার অন্তরালে থাকে অপরের ওপর একাধিপত্য করবার—অপরকে ষোলো আনা ভোগ করবার স্বার্থকালিমামণ্ডিত এষণা। ঈর্ষা প্রকাশের দু'রকম পন্থা আছে। একরকম হ'ল প্রত্যক্ষ ও আক্রমণ-মূলক; আর এক রকম হ'ল অপ্রত্যক্ষ ও সংযমনমূলক। এই দ্বিতীয় রকমের ঈর্ষাপন্থীরা সদম্ভে ঘোষণা করে যে, তাদের মনে ঈর্ষার লেশমাত্র নেই। সাধারণত স্ত্রীলোকদেরই এই পন্থী হতে দেখা যায়।

এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরা ভালো খায় না, পরে না, কারো সঙ্গে মেশে না, স্বামী কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে যায় না; সংসারে যেটুকু নিতান্ত না করলে নয় কেবল সেইটুকু করে। এদের মধ্যে কারো হিস্টিরিয়া ব্যায়রাম হয়। এই ব্যায়রাম সৃষ্টি করে' তারা স্বামীকে জব্দ করে—তার আত্মীয়স্বজনকে জব্দ করে—নিজেরাও কম জব্দ হয় না। কেউ কেউ পাগল হয়, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে।

মেয়েদের সব চেয়ে ঈর্ষার কারণ ঘটে—তার প্রতি যতখানি নজর দেওয়া উচিত স্বামী যদি ততখানি নজর না দেন, অথবা যে ব্যক্তি বা বস্তু প্রীতি পাওয়ার যোগ্য নয় সে যদি তাঁর অর্থসামর্থ্যসময় অপহরণ করতে থাকে। সচরাচর স্ত্রীর দেখা বা শোনা, আত্মীয় বা অনাত্মীয় একটি নারী যখন স্বামীর যথাতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখনি স্ত্রীর ঈর্ষা-পারদ দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হয়। ঈর্ষা রাক্ষসীর দুই পার্শ্বচর—সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

তোমাদের সকলকে বলি—স্বামিস্ত্রীর মধ্যে কখনো ঈর্ষা উদ্রেকের কোন সঙ্গত কারণ ঘটতে দিয়ো না। তেমন কোনো কারণ ঘটলে তা নিয়ে তুল্‌কালাম বাধিয়ো না, অথবা একেবারে চেপে যেয়ো না। গোড়াতেই তা নিয়ে চুপিসাড়ে বোঝাপড়া করা ভালো; যে-পক্ষের সামান্য ত্রুটিও অপরপক্ষের ঈর্ষার খোরাক যোগায় তার নিজেকে সামলে নেওয়া উচিত। পরের লাগানিভাঙানি কুপরামর্শ শুনে এবং হীনমনোবৃত্তিসুলভ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে প্রিয়পাত্রের ছোটো দোষকে বড় করতে যেয়ো না কখনো; তাহলে সমস্ত জীবনটা বিষময় করে ফেল্‌বে।...

স্বামী বা স্ত্রী কারো অথবা দু'জনের আল্‌সেমি সুখের সংসার গড়ে' তুলতে পারে না। আল্‌সেমি আর অসুস্থতা এক জিনিস নয়। অথচ স্বভাবগত আলস্যকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে অনেককে দেখ্‌তে পাই ইচ্ছে করে' অসুস্থতা সৃষ্টি করে। ইংরাজীতে এই সব লোককে বলা হয় neurasthenic। কোথাও কিছু নেই, একদিন সকালে উঠে বল্লে—ঘাড়ে ভীষণ ব্যথা, ঘাড় নাড়তে পাচ্ছি না। গেল তাই নিয়ে দিন চার-পাঁচ মহা যন্ত্রণা। তারপর সপ্তাহ দুই যেতে না যেতে ডান হাতখানা ভীষণ কন্‌কন্ কর্তে লাগল, একটু টিপ্‌লে ভেতরটা যেন খসে পড়ে। এল এলোপ্যাথিক মালিস, তারপর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। তারপর সুরু হ'ল মাথা ধরার পালা।....এমনি করে' একটার পর একটা।

মাবাপের আদুরে বা জন্মগত আলসে নিষ্কর্মা মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে মহামুস্কিলে পড়ে। কোন কাজ জানে না, হয়তো ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ করেছে, একটু সেলাই করতে জানে, খানকয়েক গান জানে, বড় জোর একটু ছবি আঁকতে বা কবিতা লিখতে আর চা তৈরি করতে জানে। ব্যস্! নতুন বউকে শ্বশুরবাড়িতে

দু'মাস চারমাস আদরযত্নে বসিয়ে খাওয়ানো চলে, তারপর তাকে খেটে খেতে হয়—খাওয়াতে হয়। একলার সংসারে অনেক বউকে বিয়ের দিন কয়েক পর থেকেই সংসারের সব ভার নিজের হাতে নিতে হয়। সে সব ক্ষেত্রে আল্‌সে বউ নাজেহাল্ হয় এবং যুদ্ধের দামামা শুনেই কেঁদে উঠে অস্ত্রত্যাগ করে।

সংসারে স্বামী স্ত্রী কাউকে আলসে হলে চলবে না। শক্তি থাকতে তাকে কাজে না লাগানো আর শক্তি থাকতে তার অপব্যবহার করা—এই দুটো জীবনের সকল সেরেস্তারই মারাত্মক। গৃহের ভেতর স্ত্রীকে যেমন নিরলস কর্মিষ্ঠ ও চট্‌পটে হতে হবে, তেমনি পুরুষকে হতে হবে গৃহের বাইরে। কবিগুরু বলতেন—চোখের পাতা যেমন চোখের অঙ্গ, বিশ্রাম তেমনি শ্রমের অঙ্গ। আল্‌সে যে, সে শুধু বিশ্রামেরই মর্ম বোঝে, শ্রমকে ঘৃণা করে। এ যেন ঠিক কানা চোখের পাতা; যার জন্যে পাতার আদর তাই থাকে নিষ্প্রভ নিষ্ক্রিয় হয়ে'।

অনেক আল্‌সে বউদের দেখেছি ভালোমানুষ কর্মতৎপর শান্তিপ্রিয় স্বামীদের খাটিয়ে মারে। বাড়িতে ফিরে তারা এক দণ্ড বিশ্রাম করতে চাইলে—এই সব মেয়েদের বুক যেন টন্‌টন্ করে। "হ্যাঁগা, ছুটির দিন সারা দুপুর তো ঘুমিয়ে কাটালে। এখন উঠে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বালিশগুলোর ফরসা ওয়াড় ক'টা পরিয়ে ফেল তো!".... "ওগো, যাও না, ধর্মতলা থেকে পাঁচ গজ ক্রেপ্ কিনে আন না,"...."ওগো চল না, নীতিনের (ভাইয়ের) অসুখ শুনেছিলাম, একটু দেখে আসি,".... "পাশের বাড়ির পরেশ বাবু অফিস থেকে ফেরবার পথে খাশা একটা গঙ্গার ইলিস এক টাকা পাঁচ আনায় কিনে এনেছে, যাও না নিয়ে এস না একটা কিনে,"..."বড্ড গা ম্যাজ্‌ম্যাজ কচ্ছে, মাথাটাও ধরেছে, আজ চা-টা নিজে তৈরি করে খাও, পার তো আমাকেও এক কাপ দাও",...

"কলেজে পড়বার সময় তুমি নাকি পিক্‌নিকে গিয়ে তোফা খিচুড়ি রেঁধেছিলে একবার, রাঁধ দিকিনি আজকে। বাট্‌না বাটাই আছে, কুট্‌নো না-হয় কুটে দিচ্ছি আমি,"...."দু'দিন ঝিটা কামাই কচ্ছে; কাল দু'বেলা আমি বাসন মেজেছি। আজ আর পারব না। তাহলে ও বেলা থেকে আমি বিছানা নেব বলে' রাখছি। ও ঝিকে আর রাখ্‌ব না। এখুনি যাও গোয়াবাগান থেকে একটা ঝি ধরে আন,"... এমনি সব ফরমাস্। স্বামীর প্রাণ অতিষ্ঠ।...কাজেই অনেক স্বামী আফিস থেকে এসে, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে কিংবা না খেয়ে, হয় ক্লাবে নয় কোনো বন্ধুর বাড়ি পিট্‌টান মারে। ঢুলতে ঢুলতে ফেরে সেই রাত্রি এগারটা কি বারোটায়।

গৌতমের নির্লজ্জ গাফিলতি

এ ছবির আবার উল্টো দিকও আছে।...যুদ্ধের সময় গৌতম যুদ্ধ-বিভাগে কি একটা অস্থায়ী চাকরিতে ঢোকে এবং দু বছরের মধ্যে তার দু'শো টাকা মাইনে হয়। সেই সময় তার বড়দা তার বিয়ে দেন্। বছর খানেক পরে তার একটি ছেলেও হ'ল। বড় দা তাঁর একটি মেয়ের কোন মতে বিয়ে দিতে পেরেছিলেন; আরো দুটি আইবুড়ো মেয়ে আর দুটি ছেলে। বড় ছেলেটি আই-কম্ পড়ে। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে গৌতমের চাক্‌রি গেল। তার দাদাও ঐ সময় পেন্সন্ নিতে বাধ্য হলেন। সংসার চরম দুর্গতির সম্মুখীন্ হ'ল। এই সময় গৌতমের বউ তার নবপ্রসূত ছেলেটিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে এল।

গৌতম অত্যন্ত বেহিসাবী। যে চার বছর চাক্‌রি করেছে, দাদাকে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা মাসে মাসে পাঠিয়েছে বটে, বাকি মাইনে থেকে বিশেষ কিছু জমাতে পারেনি। মাত্র শ সাতেক টাকা হাতে ছিল। চাক্‌রি যাওয়ার পর থেকেই সেই টাকা থেকে নিজের হাতখরচ

আর বউ-ছেলের কাপড়-জামা-ওষুধপত্র যোগাতে লাগ্‌ল। চাক্‌রির বাজার বেজায় খারাপ, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের দাম হুহু করে' চড়ে যাচ্ছে। বড়দা প্রমাদ গণছেন। মুখ ফুটে ছোট ভাইকে কিছু বল্‌তে পারেন না। গৌতম একরকম নিশ্চিন্ত, নির্বিকার।

সে নিত্য বাড়িতে দু'কাপ, পাড়ার চায়ের দোকানে চার কাপ চা খায়; শুয়ে শুয়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র আর বাংলা ডিটেক্‌টিব উপন্যাস পড়ে। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা দেখে, সিনেমা দেখে, নেতাজীর জন্মোৎসব পালনের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে, সার্বজনীন দুর্গোৎসবের একজন পাণ্ডা হয়, আর ক্লাবে গিয়ে তাস খেলে, কোরাস গানে গলা ভেড়ায়। স্ত্রী বেচারী ভাশুরের সংসারে মুখ কাঁচুমাচু করে' দু'বেলা দুটো খায় এবং কচি ছেলে নিয়ে যতটা সম্ভব গতর খাটায়। মাঝে মাঝে রাত্রিতে স্বামীকে চুপি চুপি বলে, "ওগো, আমার হাতের চুড়ি ক'গাছা আর হারছড়া বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি ক'রে যা পাও তাই দিয়ে একটা দোকান-টোকান্ যা হয় কর এই বেলা। ভাশুরঠাকুর আর পাচ্ছেন না সংসার চালাতে। শুন্‌ছি শিগ্‌গির দেশে চ'লে যাবেন। আমি লজ্জায় মরি। তোমার কি এখনো হুঁস হ'ল না?"...স্বামী ভোঁস্ ভোঁস করে' নাক ডাকায়—বেলা আট্‌টা পর্যন্ত!...

এইবার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি।...গত পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্যবস্তু ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীসমূহের মূল্য চার-পাঁচ-ছ গুণ বেড়ে গেছে। অথচ সাধারণ লোকেদের রোজগার তদনুপাতে বাড়েনি, বাড়ছে না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই আছে। যাদের সংসারে অর্জনকারীর সংখ্যা অথবা অর্জনের পরিমাণ কম অথচ সেই অনুপাতে পোষ্যের সংখ্যা বেশী, সেখানে যে কী দুর্গতি তা তোমাদের অনেকেই হয়তো চোখে দেখেছ। তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই এইরকম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলে বা আছ।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের সংসারে আগে যে পরিমাণ মিতব্যয়িতার প্রয়োজন ছিল, আজ অন্ততপক্ষে তার তিন-চার গুণ পরিমাণ মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে। যে সংসারে ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না—প্রতিমাসে মোটাভাত মোটা কাপড় যোগাতে গিয়েই জমার চেয়ে খরচ ফাজিল হয়, সেখানে সাধারণত অমিতব্যয় ও বিলাসিতা প্রবেশের রন্ধ্র থাকে না। কিন্তু যেখানে টায়ে-টোয়ে সংসার চলে, অন্নবস্ত্র ও মামুলি সংসার-খরচের জন্যে ঋণ করার প্রয়োজন হয় না, সেখানে একটু বিলাসিতা বা বেহিসাবী খরচ করার মোহ জন্মাতে পারে। অনেক মধ্যবিত্তের সংসার অর্থনীতির আইন-কানুন মেনে না চলায় ধ্বংস হয়েছে, এখনো হচ্ছে। যে সংসারে কর্তা বা গিন্নি একপক্ষ মিতব্যয়ী আর অন্যপক্ষ অমিতব্যয়ী, সে সংসার ডুব্‌তে ডুব্‌তেও কিছুদিন ভেসে থাকে; কিন্তু যে সংসারে কর্তাগিন্নি দুজনেই বেহিসাবী, সেখানে ভরাডুবি হ'তে বেশী দেরি লাগে না।

হিসাবী ও বেহিসাবী দুইপক্ষের মধ্যে মনের মিল যদি না হয়, তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবার একজন যদি হাড়-কঞ্জুস আর অন্যজন যদি দেদার খরুচে হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে নিয়ত ঝগড়াঝাঁটি বাধে, মাঝে মাঝে লাঠালাঠিও হ'তে পারে। এরকম অনেক সংসারে হ'তে দেখেছি। কোন জিনিসের বা কোন গুণেরই প্রান্তিকতা ভালো নয়। অল্পব্যয়িতা-গুণের চর্চা করতে গিয়ে যে লোক জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য ব্যয়কে সংযত করে, তার গুণ তখন দোষের পর্যায়ে নেমে আসে এবং সমাজে সে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হয়। মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অব্যয় কোনটাই সমর্থনযোগ্য ও মঙ্গলজনক নয়।

হিসাবী ও বেহিসাবীর দৃষ্টান্ত

দুটো দিকেরই গোটা দুইতিন দৃষ্টান্ত দিলে, ব্যাপারটা আরো পরিস্ফুট হবে।…স্বামীর মাসিক রোজগার ২২০৲ টাকা, দু'খানি ঘর ভাড়া করে' কল্‌কাতা শহরে স্ত্রী, একটি ছেলে, বিধবা মা, একটি ভাই ও একটি বোন নিয়ে থাকেন। ছোট ছেলেটিকে রোজ এক পোয়ার বেশী দুধ খাওয়াবার সংস্থান নেই, ছোট ভাইটি স্কুলে ফ্রী পড়ে, বোনটি হাফ ফ্রী, প্রত্যহ মাছ কিনে খাবার সঙ্গতি নেই, মাসের শেষ সপ্তাহে রেশন্ কেনবার টাকা প্রায় মাসেই কিছু কম পড়ে। অথচ এই বাবুটি রোজ সকালে-বিকেলে চায়ের দোকানে আট-ন আনা ও সিগারেটে আট-ন আনা খরচ করেন। হেয়ার কাটিং সেলুনে চুল ছাঁটান্, ট্রামে ফার্স্ট ক্লাসে ছাড়া চড়েন না ; সপ্তাহে একদিন ন' আনার টিকিট কিনে সিনেমা দেখেন, মাসে একবার স্ত্রীও সঙ্গে যায়। মাঝে মাঝে এক টাকা দু' আনার টিকিট কিনে ফুটবলের চ্যারিটি ম্যাচ দেখেন। এক আধ শনিবার বন্ধুদের সঙ্গে চাঁদা দিয়ে মদ খান্। সেদিন গোড়ের মালা পরে' রিক্স চড়ে' বাড়ি ফেরেন।…এগুলোকে অপব্যয় বা বেহিসাবী খরচ ছাড়া আর কি বলবে?

আর একটি ভদ্রলোক মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে পান। ধর, তাঁর নাম কুলদা বাবু। সংসারে একটি মাত্র ছেলে, স্ত্রী, তিনি নিজে, আর একটি ভাই—কলেজে পড়ে। ছেলে হওয়ার কিছুদিন পর থেকে স্ত্রীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে ; হাঁপানি, অম্ল, অনিয়মিত ঋতুস্রাব…এই রকম নানা অসুখে তিনি প্রায় ভোগেন। কুলদাবাবু অত্যন্ত হিসাবী, অর্থাৎ বেশ একটু কৃপণ। বাড়িতে ঝি চাকর পাচক নেই। স্ত্রী অসুস্থ শরীর নিয়ে সংসারের সব কাজ করেন। এক এক সময় যখন তিনি শয্যাশায়ী হন্ বেশ কিছুদিনের জন্যে,তখন ভদ্রলোকটি দেশ থেকে তাঁর মাকে অথবা বিধবা বোনকে এনে বাড়ীতে রাখেন।

স্ত্রীর হাঁপানির জন্যে তিনি তিন-চার জায়গা থেকে তিন-চার রকমের মাদুলি যোগাড় করে' এনে দিয়েছেন। অন্যান্য অসুখের জন্যে নিজেই হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসার বই পড়ে' ওষুধের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনিও নিয়মিত ওষুধ দেন না, স্ত্রীও নিয়মিত ওষুধ খান না। স্ত্রীর শয্যাধরা কোন অসুখ হ'লে একজন বিনা-ভিজিটের হোমিওপ্যাথ বন্ধুকে ডেকে এনে দেখানো হয়। অন্নপথ্য করার দু'এক দিন পরেই ভদ্রলোক তাঁর মাকে বা বোনকে দেশে রেখে আসেন। দেশে তাঁদের মোটামুটি ভাতকাপড়ের সংস্থান আছে, কাজেই কল্‌কাতায় তাঁরা অতি-প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিন থাক্‌লে কুলদাবাবু বাজে খরচের আশঙ্কায় বিব্রত হন্।

ছেলেটির অষত্নের সীমা নেই। সে অস্থিক্ষীণতা রোগে ভোগে, মাঝে মাঝে আমাশা ও সারা শীতকাল সর্দিকাশিতে কষ্ট পায়। তার ওপরও কুলদাবাবুর হোমিওপ্যাথি ওষুধের অব্যর্থতার পরীক্ষা চলে। আপিসের এক বন্ধু ছেলেটিকে ডি, জন্‌স্ কড্‌লিবার অএল্ খাওয়াতে বলেছিল, কিন্তু দাম শুনে পেছিয়ে গেছেন। স্ত্রী ছোটখাটো অসুখে পড়ে' দু'একদিন কাজকর্মের অযোগ্য হ'লে তিনি আর তাঁর ছোট ভাই দু'জনে মিলে সংসারের কাজকর্ম করেন। ছোট ভাইয়ের সেদিন কলেজ কামাই করতে হয়। ভাতডাল রাঁধা, বউদিকে ওষুধ খাওয়ানো বা তাঁর পথ্য প্রস্তুত করা, ভাইপোকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো ও নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো…সবই বেচারাকে একা করতে হয়। লেখা-পড়ার চূড়ান্ত ক্ষতি হয় তার।

বাড়িতে চা-জলখাবারের পাট নেই। ভোরবেলা উঠে কুলদাবাবু পাশের এক প্রতিবেশীর রোয়াকে গিয়ে বসেন, সেখানে বিনামূল্যে অযাচিতভাবে এক কাপ গরম চা এসে হাজির হয় তাঁর সুমুখে। উপরন্তু আনন্দবাজারখানায় মোটামুটি চোখ বুলোনোও হয়ে যায়।

আফিসে দু'পয়সা দিয়ে টিফিন সারেন তিনি। পান-বিড়ি-সিগারেট বন্ধুরা দিলে খান নতুবা কিনে খাওয়াটা অপব্যয় মনে করেন। র‍্যাম্পার্টের দিকে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ্ দেখার সখ ছাড়া আর কোন সখ নেই তাঁর। ছুটির দিনে সকালে কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে গোবর মিশিয়ে তিনি 'গুল্' তৈরি করে' রোদ্দুরে দেন্, আর দুপুর বেলা ছেঁড়া কাপড়-জামায় রিপুকর্ম করেন; কখনো-বা পরিত্যাজ্য ধুতি বা সাড়ি কেটেকুটে সেলাই করে' গৃহব্যবহার্য লুঙ্গি প্রস্তুত করেন। সংসারে কেউ অর্ধাশনে থাকলে বা অনশনে মারা গেলেও কুলদাবাবু মাসে একশো টাকার বেশী খরচ করবেন না; দেড়শো টাকা তাঁকে ব্যাঙ্কে রাখতেই হবে—এই তাঁর পণ।....

আজকালকার বাজারে অধিকাংশ স্বামিস্ত্রী মিতব্যয়িতার অ-আ-ক-খ না শিখেই সংসারে ঢোকে। এক-এক স্বামী বা স্ত্রীর এক একরকম জিনিস কেনার সখ আছে, যে সখটা রোগ বিশেষে পরিণত হয়। কারু রকমারি সাড়ি কেনার সখ, কারু রকমারি ছিট্ কেনার সখ, কারু নতুন নতুন প্যাটার্নের গহনা গড়ানোর সখ, কারু ঘর-সাজাবার আসবাব কেনার সখ; কারু বই কেনার—কারু ছবি কেনার—কারু দেশভ্রমণের—কারু বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে' খাওয়ানোর —কারু আমোদ-প্রমোদের সখ। এই সব সখকে তখনি আমি রোগ বল্‌ব, যখন মানুষ সংসারের একান্ত আবশ্যকীয় কৃত্যের দাবিকে সরিয়ে রেখে এবং আয়ের পরিমাণকে হিসাবের আমলে না এনে ক্রমাগত এগুলো মেটানোর উদ্দাম প্রয়াসে প্রমত্ত থাকে! সেকালের সুখবাদী ঋষিরা স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে ঋণ করেও ঘি খেতে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন, কিন্তু আসবাবপত্র অথবা সাড়ি-অলঙ্কার কিন্‌তে পরামর্শ দেন্ নি। 'দাল্‌দা'র কল্যাণে আজকাল আর কারো বোধ হয় ঋণ করে' ঘি খেতে হয় না; কিন্তু রুগ্ন সখ্ মেটানোর জন্যে অনেকেই ভগ্নদেহ নিয়ে

'দাল্‌দা'র খরচটাও অন্যদিকে চালিয়ে দিচ্ছে। গরিবের ঘোড়া-রোগ অনেক ঘরেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।

পাশের বাড়ির নতুন বউ

আমাদের বাড়ির পাশে বছর খানেক আগে একটি নতুন বিয়ের বউ ভাড়াটে এসেছে। স্বামী, স্ত্রী, আর একটি দেওর। একটি ছোক্‌রা চাকর আছে, সে 'বাবাজীকে বাবাজী তরকারিকে তরকারি'। স্বামী সম্ভবত একশো টাকার কিছু বেশী মাইনে পায় এবং অনেকটা হিসাবী বলেই মনে হয়। কিন্তু স্ত্রী এসেছেন মফস্বল শহরের কোন বড় লোকের ঘর থেকে, লেখাপড়াও কিছু জানে। কিন্তু যে হারে সে খরচ কর্তে সুরু করেছে, তাতে তার স্বামীকে হয় কিছুদিন বাদে দেউলে হতে হবে, নয় স্ত্রীর এই ক্রয়-বাতিকের বিরুদ্ধে সদর্পে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে।

অনবরত বাপের বাড়ির তরফ থেকে নিকট-ও-দূরসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষবালকবৃদ্ধ আত্মীয়রা দলে দলে সাক্ষাৎ কর্তে আস্‌চে; তাদের চা-জল খাবার যোগাতে রোজ অন্তত দুটো টাকার কম খরচ হচ্ছে না। প্রতি রবিবারে এঁদের কারো কারো পাত পেতে খাওয়ানোর নিমন্ত্রণও হয়। কুটুম্বদের কেউ কেউ দু'চারদিনের জন্যে এসে আতিথ্য-গ্রহণও কচ্ছেন। স্বামী আপিসে বেরিয়ে যাবার পর বউটি দুপুর বেলা নিত্য আইস্‌ক্রীম্ বরফ কিনে খায়। তখন কোন আত্মীয় কাছে থাকলে তাকেও কিনে খাওয়ায়। রঙীন্ কাগজের ফুলওয়ালা, ছিটের কাপড়ওয়ালা, বাসনওয়ালা, ছবিওয়ালা, পুতুলওয়ালা, আমওয়ালা, কমলা-আঙুর-সোন্‌পাপড়িওয়ালা রাস্তা দিয়ে হাঁক পেড়ে যাচ্ছে, রক্ষে নেই তাদের—অম্‌নি দোতলায় ডাক পড়্‌ল। কিছু-না-কিছু সওদা না করে' বধূটি কাউকে ছেড়ে দেবে না।

তা ছাড়া সিনেমা-থিএটারে স্বামীর সঙ্গে এক প্রস্থ যাচ্ছে, দেওরের সঙ্গে একপ্রস্থ যাচ্ছে, আবার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আর একপ্রস্থ যাচ্ছে। স্বামীর যে ক'টা টাকা ব্যাঙ্কে জমানো ছিল, তা দ্রুত পাৎলা হতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন বাদে পাশের বাড়ির অন্য ভাড়াটে বউরা আমার স্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিলেন—নতুন বউয়ের আমদানী খরচের ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অস্ফুটস্বরে কথা-কাটাকাটি চল্‌ছে মাঝে মাঝে। শেষে একদিন সন্ধ্যার পর স্বামিস্ত্রীতে বেশ শ্রাব্যভাবেই কটুকাটব্য চল্‌ল। বউ অতঃপর নাকি ২৪ ঘণ্টা কাল চা ছাড়া আর অন্য কিছু ওষ্ঠে স্পর্শ করল না; দেওর পায়ে ধরে' সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে ভাত খাওয়াতে পারল না। পরদিন বউটি নাকি তার একটি বোনপোর সঙ্গে চলে গেল শিবপুরে ভগ্নীপতির বাড়ি। আজো ফেরেনি সে!···

জেনে রাখ, 'অগ্নিপুরাণ' অমিতব্যয়িনী ভার্যাকে পরিত্যাগ করার পর্যন্ত বিধান দিয়াছেন।

সঞ্চয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্য

তোমাদের দু'দলকেই বলি—বিয়ের পর থেকেই হিসাবী হও, আয় বুঝে ব্যয় করো। বাঁচাবার যদি কোনো পন্থা থাকে, কিছু করে' বাঁচিয়ো। সচ্ছল অবস্থার যারা, তারাও অর্জনের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ বাঁচাবে প্রতি মাসে। কোটি টাকার অধিপতিরও জীবনে এমন দুর্দিন আসতে পারে যখন তাঁর একশো টাকার জন্যে পরের কাছে হাত পাত্‌তে হয়। সাধ্য থাকলে, পরের জন্যে—জনসেবার জন্যে কিছু ব্যয় ক'রো; সঞ্চয়ের মতো তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু বাহবা নেবার জন্যে অথবা ক্ষণিক উন্মাদনা-বশে সাধ্যাতীত খয়রাৎ করার বোকামিকে কেউ ডেকে এনো না। দেশের কাজে গলার হার, হাতের চুড়ি বা কানবালা খুলে দান করে দিয়ে অনেক গৃহস্থ বধূ শেষকালে আপ্‌শোষে মরে, স্বামীর কাছে তীব্র তিরস্কার লাভ করে।

সকলকে সুস্থ রাখবার ও করবার জন্যে যেটুকু খরচ করার প্রয়োজন—তা কর্‌বে, তাতে যদি কিছু না বাঁচে উপায় কি? খবর্দার, কুলদাবাবুর মতো হ'য়ো না কেউ। যে জিনিস শুধু নয়নকে রঞ্জন করে—মনের ক্ষণিক আবেগকে প্রশমিত করে, সে জিনিসের প্রতি প্রলোভনকে যথাসাধ্য সংযত করে' চল্‌বে। পেটের ক্ষুধাকে অস্বীকার করে' মনের দুষ্ট ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে অর্থব্যয় করা এবং কোঠাবাড়ির একতলা না তৈরি করে' দোতলা গাঁথ্‌তে যাওয়া—দুটোই সমান মূর্খতার পরিচায়ক।

স্বামী তার রোজগারের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সর্বদা স্ত্রীকে শুনিয়ে রাখ্‌বে এবং উপেক্ষণীয় ছোটখাটো খরচ ছাড়া একটু বড় খরচ কর্তে গেলেই স্ত্রীর পরামর্শ নেবে। তোমাদের মধ্যে এমন যুবক অনেক আছ—যারা কিছু উপরি রোজগার করলেই কিছু উপরি খরচ করা আমি আপত্তি করি না তাতে; কিন্তু ঐ সঙ্গে কিছু উপরি সঞ্চয়েরও প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলো। সাধারণ অবস্থায় যে রোজগার করো, তার মধ্যে থেকে বাজে খরচ কিছু কর্তে গেলেই যেন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাতে করে' কোন কাজের খরচের ব্যাঘাত হচ্ছে কি না। ঘরে চাল ফুরিয়েছে, দু'টাকার আম কিনে এনো না; সমস্ত লেপতোষক ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে, একখানা গদি-আঁটা চেয়ার কিনে এনো না; ছেলে বা ভাইয়ের স্কুলে তিন মাসের মাইনে বাকি পড়েছে, এক জোড়া গঙ্গার ইলিশ কিনে এনো না। দোহাই!

স্ত্রীদেরও বলে' রাখি, স্বামী তোমাদের কাছে মাইনের সমস্ত টাকা ফেলে দেন বলে' অথবা একটা হাতখরচ মাসে মাসে দিয়ে যান্ বলে' তোমরা তার অপব্যয় ক'রো না। গয়নাগুলোকে আমি কোম্পানির কাগজ, ক্যাশ-সার্টিফিকেট্ বা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের প্রায়-সামিল কর্‌তে বরং রাজি আছি; কিন্তু সেগুলোকে বছর-বছর ভাঙ্‌তে

অথবা মাসে-মাসে রকম-বেরকমের সাড়ি কিন্‌তে কিছুতেই বল্‌ব না। এক এক বাড়ির একলাঘরের গিন্নি স্বামিপুত্রদের ডালভাত খাইয়ে, ও মাছদুধঘি থেকে বঞ্চিত করে' যে টাকা জমান্, তাই দিয়ে মাসে একখানা করে' হালফ্যাশনের সাড়ি কেনেন দেখি। তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো এক এক গৃহস্থবাড়ির বউদের তিন-চার বাক্স ভর্তি সাড়ি-ব্লাউজ রয়েচে; তার কোনটা হয়তো একবার কোনটা হয়তো দু'বার তাদের গায়ে উঠ্‌ল, তারপর সেটা হয়তো out of fashion হয়ে গাদা-চাপা রইল।....অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের বউদের সাড়ি কেনায়, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ভাড়ায় ও সিনেমা-থিএটারে যে খরচ হয়, তার বেশীর ভাগ যদি তারা হাতে রাখে, তাহলে তা দিয়ে স্বামিপুত্রের কঠিন অসুখের সময় সুচিকিৎসা করাতে পারে, নতুবা এক টুকরো জমি বা ছোট্ট একখানা বাড়ি কেনার সময় স্বামীকে সাহায্য করতে পারে।

স্বামীর হঠাৎ চাক্‌রি গেল, ব্যবসা ফেল্ পড়ল কিংবা কঠিন অসুখে ছ'মাস শয্যাশায়ী হয়ে রইল সে। হাতের পাতের সব খরচ হয়ে গেল, সংসার অচল, ওষুধপথ্য জোটানো দায়; বন্ধুদের কেউ কেউ কিছু ধার দিয়ে শেষে হাত গুটোলো। বাড়িওয়ালার পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি, নালিশের ভয় দেখাচ্ছে। উপায়? ছেলেপিলেরা ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে, বাক্স গড়ের মাঠ, হেন্‌সেলে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্ কচ্ছে। সেই সময় বাড়ির গিন্নি যদি তার কিছু-কিছু-করে'-সঞ্চয়-করা লুকোনো তহবিল থেকে বিশ পঞ্চাশ একশো টাকা বের করে' দিতে পারে, তবেই সে সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মী বলে' মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে। নয় কি?

বউদের বল্‌ছি। সঞ্চয় করলে ও স্বামীকে দিয়ে সঞ্চয় করালে উপকারের সম্ভাবনাটা তোমাদেরই বেশী। স্বামীর দিক থেকে যদি কখনো তোমাদের চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে, তাহলে সেই দুর্যোগের

দিনে সঞ্চয়ই তোমাদের চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে—পরের গলগ্রহ হওয়ার দায় থেকে বাঁচাবে, পুত্রকন্যা নিয়ে চোখে আঁধার দেখ্‌তে হবে না তোমাদের। সেইজন্যে বউদের প্রত্যেককে বলে রাখ্‌ছি—বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্বামীকে দিয়ে একটা দুই, চার বা পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা করাবে। তোমার স্বামীর নামে একটা আর তোমার নিজের নামে একটা ব্যাঙ্কে হিসাব খোলাবে। যেখানে ব্যাঙ্ক নেই, সেখানে পোস্ট আফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কের আশ্রয় নেবে।

ভুলো না, লীস্কটি।

ষষ্ঠ আলাপন

মিলন-বাঁধন অটুট কিসে ?

গোড়াতেই তোমাদের দু'দলকে বলেছি যে, বিয়ের আগে তোমরা যেমনটি ছিলে. আজ আর তেমনটি নেই, তোমাদের জীবনে এসেছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। কিন্তু সকলেরই কি আসে ? না। যাদের উভয়ের মনের ও মতের অন্ততপক্ষে বারো আনা মিল হয়, তাদেরই ভেতর পরিবর্তন কিছু স্পষ্ট সম্ভবপর হয়। তারা ব্যক্তিত্ব খানিকটা করে' হারায়; 'হারায়' বলি কেন, স্বেচ্ছায় অপরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিলীন করে' দেয়। যার যেখানে শূন্যতা ছিল তা পরিপূর্ণতায় ভরে' ওঠে। বিশ্বসংসারের সঙ্গে তার আদানপ্রদানের রীতিনীতি যায় বদ্‌লে।

উভয়ের স্বার্থত্যাগ

এতকাল ধরে' দুনিয়ার কাছ থেকে যে শুধু নিতে শিখেছে, সে প্রেমপাত্রের মাধ্যমে দুনিয়াকে কিছু কিছু করে' দিতে শেখে। অর্থাৎ বিয়ের মধ্য দিয়ে সে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। বিয়ের পর দেখেছি—চোর চুরি ভুলেছে, লম্পট পরনারীর মুখের দিকে তাকানো ছেড়েছে, খুনী তার হাত থেকে ছোরা ফেলে দিয়েছে। চোখের কোল পর্যন্ত ঘোমটা-টানা চোদ্দ বছরের একটা ক্ষীণকায়া মেয়ে এসে একটা দুর্দান্ত দৈত্যকে এক ফুস্-মন্তরে শান্ত শিশুতে পরিণত করে। আশ্চর্য!

একের জন্যে আর একজনে কিছু স্বার্থত্যাগ করলে, একে অপরের গুণ খানিকটা নিজের মধ্যে টেনে নিলে, তবে উভয়ের স্বভাবের পরিবর্তনটা সম্ভবপর হয়; তবে মন্দ ভালো হয়, ভালো আরো ভালো

হয়। স্ত্রীর তৃপ্তির জন্যে স্বামীকে—স্বামীর তৃপ্তির জন্যে স্ত্রীকে কিছু মন্দ অভ্যাস ছাড়তে হয়—কিছু সদ্‌গুণ অর্জন করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে মনের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করতে হয়, সমস্ত ইচ্ছাকে উন্মুখ করে' তুল্‌তে হয়।...এতদিনে তোমরা পরস্পরের স্বাস্থ্য-সুখ-উন্নতির জন্যে নিশ্চয়ই ছোটবড় স্বার্থকে বলি দিয়েছ এবং পরস্পরের ওপর নির্ভয়ে নির্ভর করবার মত বিশ্বাস অর্জন করেছ।

এইখানে একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত শোনাচ্ছি তোমাদের।...বছর কয়েক আগেকার কথা। শহরবাসী একজন মোটামুটি শিক্ষিত যুবক একটি তেরো-চোদ্দো বছর বয়সের পল্লীবাসিনী মেয়েকে সদ্য বিয়ে করে' নিজের বাড়িতে এনেছে। মেয়েটি মাতাপিতার আদুরে মেয়ে,লেখাপড়া কিছুই শেখেনি, বাঙ্‌লা বই দু'তিনখানা কোনমতে পড়েছে। বিয়ের পর স্বামী তাকে ভালো ভালো উপন্যাস এনে দিল পড়্‌তে। সে খান-কয়েক অতিকষ্টে পড়্‌ল, খান কয়েক পড়্‌ল না, কয়েকখানা অর্ধেক পড়ে' ছেড়ে দিল। বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে স্বামী তাদের সম্বন্ধে স্ত্রীর নিকট মাঝে মাঝে বক্তৃতা করে, স্ত্রী বেচারী তার কতক বুঝ্‌তে পারে, কতক পারে না। শেষে স্বামী তাকে ক'খানা বাংলা টেক্সট্‌বুক আর একখানা ইংরাজী প্রাইমার কিনে এনে পড়্‌তে দিল এবং অবসরমতো নিজে তাকে পড়াতে লাগ্‌ল।

বউয়ের পড়তে ভালো লাগে না। স্বামীর ঘরকে সে কিছুতেই পাঠশালা বলে' মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া তার বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন প্রখর নয়। সে বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারে না। ইংরাজী প্রাইমারের প্রথম দশখানা পৃষ্ঠা আয়ত্তে আন্‌তে তার দশ মাস কাট্‌ল। স্বামী এক-এক সময় লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্যে তাকে বকে, এক এক সময় কিছু বিলাসদ্রব্য কিনে এনে দিয়ে তুতিয়ে-পাতিয়ে তার মন বসাবার চেষ্টা করে।....

একদিন নিশীথে স্বামিস্ত্রী বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন। হঠাৎ বউ বল্ল, "দেখ, তুমি ভয়ানক সিগারেট্ খাও। দেখছি রোজ দু'প্যাকেটের কমে তোমার চলে না। কি হয় ঐ ছাই খেয়ে ? সবাই বলে ওতে ফুস্‌ফুস্ খারাপ হয়। পয়সা নষ্ট, শরীর নষ্ট, মুখে বিশ্রী গন্ধ হয়। ছেড়ে দাও না এই বদভ্যাস। হ্যাঁ গা, বলনা কবে থেকে ছাড়বে ?" এই বলে' বউটি স্বামীর গলা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌ল। স্বামী তার কপালে একটা চুমো এঁকে দিয়ে হাসতে হাসতে বল্ল, "বেশ, আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব। তবে এক সর্তে ছাড়্‌ব। যেদিন তুমি বাপের বাড়ি থেকে খামের ওপর আমার নামঠিকানা ইংরিজিতে লিখে পাঠাবে, সেইদিন সত্যি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব।"....

তোমরা শুনে দুঃখিত হবে যে, বউটি তার তরফ্ থেকে সর্ত পূরণ করেনি আজ পর্যন্ত। আজ তারা দুজনেই প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় এসে পৌঁছেছে, তারা চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের জনকজননী। অতঃপর স্ত্রী যতবারই স্বামীকে সিগারেট ছাড়তে বলেছে, ততবারই সে স্ত্রীকে তার পূর্ব সর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীটি ইংরিজিতে নামঠিকানা লেখা দূরের কথা ইংরাজি বর্ণমালা ভুলে গেছে এবং ভাজের পাল্লায় পড়ে' দোক্তা খেতে শিখেছে। যুদ্ধের বাজারে অপ্রত্যাশিত-ভাবে রোজগার বাড়ায় স্বামীটি 'কাঁচি' থেকে 'ক্যাপ্‌স্টানে' উঠেছে এবং দু'প্যাকেটের জায়গায় রোজ তিন প্যাকেট সিগারেট খরচ কচ্ছে।....

এর ওপর টীকাটিপ্পনী আমি কিছু দিতে চাই না, তোমরা যে-যার নিজেরা দাও।

তবে একটা ছোট্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ স্বামীদের দিয়ে যাই। বিয়ের পরই স্ত্রীদের রুদ্র শিক্ষকের আসনে কখ্‌খনো বস্‌বে না। বাপের বাড়ি থেকে যে শিক্ষাদীক্ষা স্বভাবচরিত্র তারা নিয়ে এসেছে তা বেত্রদণ্ড হাতে করে' তিনদিনের মধ্যে বদ্‌লাবার ও

তাদের নিজেদের মনের মতো করে' গড়ে তোল্‌বার দুর্মতি যেন তোমাদের কারো না হয়। তোমাদের যে সব ত্রুটি ও ন্যূনতা তাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে, সেগুলো আগে তাড়াতাড়ি সংশোধন করতে থাক। ঐ সঙ্গে তাদের চোখে তোমার আত্মসংস্কারের দৃষ্টান্তগুলি ধরে' দিয়ে সুমিষ্ট বচনে তুতিতে-পাতিয়ে তাদের সংশোধনের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দাও। কোন নতুন জিনিস শেখার আগ্রহ তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে পার তো ভালো ; যদি না জাগে, তাহলে' পাঁচন গেলাবার মতো জোর করে' তাদের মনের মধ্যে কোন শিক্ষাকে বসাতে যেয়ো না।

বিয়ের আগে শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে প্রেম অবাধে চল্‌লেও চল্‌তে পারে, বিয়ের পর প্রেমের মধ্য দিয়ে শিক্ষকছাত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাওয়ায় নানা বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। স্থির জেনো, স্বামী ও স্ত্রী কেউ কাউকে ষোলো আনা মনের মতো করে' গড়তে পারে না, তবু তারা পরস্পরকে ষোল আনা ভালবাসতে পারে। সদৃশে-বিসদৃশে, কালোয়-ফরসায়, বেঁটেয়-লম্বায়, মূর্খে-বিদ্বানে প্রাণভরা ভালোবাসা জন্মানোটা বিস্ময়ের বস্তু নয়।

আর একটা বিষয়ে সাবধান করে' দিই। নিজেদের মা-বোনের চোখ দিয়ে বউয়ের দোষগুণ দেখো না বা তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে তার বিচার করতে যেয়ো না ; তাহলে চিরকালের জন্যে ঠক্‌বে। আর, মায়ের স্বভাবচরিত্রের প্যাটার্নে বউকে পুরোপুরি গড়্‌তে চেয়ো না। দৈবী ভক্তির ও মানুষিক ভালবাসার পাত্রকে আকারেপ্রকারে একটু আলাদা করে' দেখা ও রাখাই আমি সমীচীন বলে' মনে করি।

বিশ্বাস ও অকপটতা

প্রেম যেখানে পূর্ণ, বিশ্বাসকে সেখানে খাটো করা চলে না। সন্দিগ্ধচিত্ততা অনেক সময় অভিমান-বশে ভালোকে খারাপের দিকে

ঢলে' পড়্বার প্ররোচনা যোগায়। মনে কোন পাপ পুষে, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের কণ্টকগুল্মকে জিইয়ে রেখে স্বামিস্ত্রীর ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় কর্বার আশা ক'রো না। বিয়ের আগেকার জীবনের সব কথা খুলে বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বিয়ের পরের প্রতিদিনের চিন্তাকার্যবাক্যের সঙ্গে যেন পরস্পরের পরিচয় ঘটে; কেউ কাউকে যেন নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক না খায়।

তোমার যেটুকু আত্মগোপনতা অপর পক্ষের সন্দেহের উদ্রেক করবে না—বরং মুগ্ধ অভিনিবেশের সঞ্চার করবে, যেটুকুতে তোমার অনুশোচনা নেই—নির্দোষ কৌতুক জড়িয়ে আছে, যেটুকুতে সংসারের শান্তি ও সৌন্দর্য বিপর্যস্ত হবে না, সেইটুকুকে আমি আমল দিতে রাজি আছি। দোষ করলে তা অকপটে স্বীকার করবে। ভয় কিসের? বকুনির? তা হোক। ঢেকে রাখলে আরো বেশী সর্বনাশ হবে। নিশ্চিত জেনো, ছোটখাটো পাপচিন্তা ও পাপকার্য যারা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে গোপন করতে অভ্যস্ত হয়, তারা বড় পাপচিন্তা ও পাপকার্যে প্রবৃত্ত হতে সহজে প্রলুব্ধ হয়। শেষোক্তগুলি গোপন রাখ্‌তে গিয়ে অকস্মাৎ তারা একদিন ধরা পড়েও যেতে পারে। ফল তার বড় বিষময়।

স্মরণ রেখো, চরিত্র বিষয়ে একপক্ষ যখন ক্রমাগত বিশ্বাস ভেঙে চলে, তখন অপর পক্ষ গোপনে সেই বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিশোধ দিতে সচেষ্ট হয়। পুরুষপক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ও সগর্বেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যাদের প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি ও প্রবৃত্তি থাকে না, তারা কিছুদিন চেপে-চুপে থেকে একদিন নাটকীয় বিদ্রোহ বাধিয়ে বসে। এস্পার কি ওস্পার। অভিজাত পরিবারের লম্পটদের পর্দানশীন পত্নীগণ অনেক সময় গৃহের বাবুর্চি খানসামা পাচক ভৃত্য বা নিয়তন কর্মচারীদের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়। বহু ক্ষেত্রে

দুরতিক্রম্য কামাবেগই এর উত্তেজক কারণ নয়, প্রধান কারণ হ'ল—হৃদয়হীন দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি বৈরশুদ্ধির প্রয়াস।

লোক-দেখানো ভালবাসার বাড়াবাড়ি

পরিচিত বা অপরিচিত সাক্ষীর সাম্‌নে, বাড়ির ঝিচাকর, ননদ-ভাজ বা ছেলেমেয়ের সাম্‌নে স্বামীস্ত্রী যেন খুব মাখামাখি ভাব না দেখায় কিংবা মান-অভিমানের পালা না গায়। আমি এমন এক নামজাদা স্বদেশী বীরের নাম জানি যিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ ভাগে বিয়ে করে' বাড়ির স্নেহভাজনদের সাম্‌নে স্ত্রীর পায়ে আলতা পরিয়ে দিতেন। শুন্‌লে যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। একে চূড়ান্ত নির্লজ্জতা ছাড়া আর কি বল্‌বে?....

কোন কোন পতিপত্নী এজমালি সংসারে ছুটির দিন দুপুর বেলা শয়নকক্ষের দরজাজানালা সমস্ত বন্ধ করে' দিয়ে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত শুয়ে থাকেন। এ-ও আপত্তিকর। কোন কোন ভার্যা ননদ, জা, অল্পবয়স্ক দেওর বা দাসীর গোচরে স্বামীর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে' এমন সব হাসিঠাট্টা করে যেগুলো গভীর নিশীথে দুজনের মধ্যে একান্তে হলেই শোভন ও সঙ্গত হয়। লোক-দেখানো ভালবাসা যত কম করতে পারো ততই ভালো, কারণ এটা মর্মমী বিলাতী ফুলের মতো; দেখ্‌তে চমৎকার, কিন্তু শুঁকলে গন্ধ নেই। গভীর ভালবাসায় আড়ম্বর, উচ্ছ্বাস, ফেনিলতা নেই—জেনো।

যে সব বউ স্বামী দু'দশ দিনের জন্যে বিদেশ যাবার সময় কেঁদে ভাসায়, রোজ তার কাছ থেকে চিঠি না পেলে মূর্চ্ছা যায়, স্বামী অফিস থেকে ফির্‌তে পাঁচ মিনিট দেরি কর্লে অনবরত শুষ্কমুখে ঘর আর বারান্দা কর্‌তে থাকে, স্বামীর মুখ থেকে একটু কড়া কথা শুন্‌লে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে, স্বামীকে চোখে চোখে রাখে এবং তার অভিভাবকত্ব

নিত্য দাবি করে, তাদের ভালবাসা পউনে ষোল আনা রাংতা-মোড়া। জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ তাঁর চিররসোজ্জ্বল *Letter to a Young Lady on Her Marriage*এর এক জায়গায় এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটা ফলিত মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে একবারে অভ্রান্ত বলা চলে। তিনি বলেছেন, "I can only say that those ladies who are apt to make the greatest clutter upon such occasions would liberally have paid a messenger for bringing them news that their husbands had broken their necks on the road." উক্তিটি খুব রূঢ় হলেও সত্যি। হেসে উড়িয়ে দিয়ো না।

স্বামীর বন্ধুরা

নতুন বউদের বলি, স্বামী যে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, কেবল তার সঙ্গেই কথা কইবে। স্বামী যদি কখনো তার সাম্‌নে কোন অভব্য ইয়ার্কি করেন, তাহলে আপত্তি করবে। স্বামিবন্ধুর সঙ্গে কখনো স্বামীর অসাক্ষাতে একলা বসে' আলাপ করবে না। বাড়িতে কেউ নেই, এমন সময় যদি কোন বন্ধু কোন অছিলা করে' তোমাদের বাড়িতে আসে, তাহলে তাকে দরজার বাইরে থেকেই বিদায় দেবে। স্বামীর বা সংসারের গাঢ়তম বিপদের সময় ছাড়া কখনো একাকী কোন স্বামিসখার সমীপবর্তী হবে না বা তার সাহায্য প্রার্থনা করবে না।

কোনো কোনো বেআক্কেলে স্বামীর অভ্যাস আছে—নিজে কর্মান্তরে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে স্ত্রীকে বন্ধুর সঙ্গে একাকী সিনেমা-থিএটার-সভা-সমিতিতে পাঠায়। সে অভ্যাসকে কখনোই প্রশ্রয় দিয়ো না তোমরা। এমন কি, বন্ধুটির সঙ্গে যদি তাঁর স্ত্রী থাকেন, তাহলেও নয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, গৃহে

ফিরিয়ে দিয়ে যাবার সময় সঙ্গে শুধু বন্ধুটি থাকেন—তাঁর স্ত্রীটি নিজেদের বাড়ির দরজায় নেমে যান্। কোনো বন্ধুকে ভাল লাগ্‌ছে অর্থাৎ তার একটি বিশেষ গুণ তোমাকে একটু একটু আকৃষ্ট কর্‌ছে বলে' যদি মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারে, তাহলে কিছুদিন বাপের বাড়ি বা অন্য কোথাও বেড়িয়ে আসবে। ফিরে এসে বন্ধুটিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চল্‌বে। বন্ধুকে যদি একটু ওপর-পড়া দেখ, তাহলে স্বামীকে সব খুলে বল্‌বে। স্বামীর বন্ধু অনেক সংসারে আগুন জ্বালায়। "ঘরে-বাইরে"র সন্দীপ অনেক বিমলার কপাল পুড়িয়েছে। সাবধান!

অবকাশরঞ্জন ও বৈচিত্র্যবিধান

দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্যহীনতা ও নিরবসর কর্মব্যাপৃতি অনেক পতিপত্নীর ভালবাসাকে তিক্ত বিস্বাদ করে' দিতে পারে। দুজনার মধ্যে যেজন একটু বেশী স্বাচ্ছন্দ্য, কর্মবৈচিত্র্য ও অবকাশ ভোগ করে, অন্যজন তাকে মনে মনে একটু হিংসা না করে' পারে না। একটানা বৈচিত্র্যহীন নিষ্ক্রিয়তাও কোন স্বাভাবিক স্ত্রীপুরুষের বেশীদিন ধরে' ভালো লাগে না। কর্মক্লান্তের মাঝে মাঝে বিশ্রাম চাই, অবসরভোগীর মাঝে মাঝে কর্মক্লান্তি চাই। "খেটে খেটে প্রাণ গেল, আর পারি না"—এই কথা স্ত্রীর মুখ থেকে যে স্বামী শোনার আগেই তাকে একটু অবসর দেয়, সে পুরো বুদ্ধিমান। যে স্বামী ওই কথা শোনার পরে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, সে আধা বুদ্ধিমান। বার বার ওই কথা শুনেও যার চেতনা হয় না, সে হয় গাড়োল নয় নির্মম। কোন কোন স্ত্রী স্বামীর মনে ব্যথা দেবার ভয়ে মুখে ফুটে কোন কথা বলে না, কিন্তু মনে মনে দুর্মদ অভিমানকে চেপে রেখে, কাজে ও অকাজে ইচ্ছে করে' এমন করে' ডোবে যে, অতঃপর স্বামী শ্বশুর দেবর তাকে কোনরূপ অবকাশরঞ্জনে আমন্ত্রণ করলেও সে ছলে-ছুতোয় তা গ্রহণ

করে না। এমনি ভাবে তারা ক্ষীয়মান শরীরমন নিয়ে তলে তলে ভেঙে পড়ে। তখন তারা একটার পর একটা অসুখে ক্রমাগত ভুগতে থাকে ; শেষে হয়তো শয্যাধরা হয়ে পড়ে, নয় অকালে মারা পড়ে।

জলের মাছও মাঝে মাঝে জলের উপরিতলে ভেসে ওঠে, ডাঙ্গার জীবও মাঝে মাঝে জলে নেমে ডুব দেয়। সেইজন্যে স্বামীদের বার বার বলছি (ওদের মা-বোনদের কাছে পেলেও বলতুম) বউকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিও, বৈচিত্র্য দিও, বাপের বাড়ি পাঠিয়ো, নিজেরা সঙ্গে করে' এখানে-ওখানে নিয়ে যেয়ো। সঙ্গতি ও সময় বুঝে সিনেমা থিএটার প্রভৃতিতে নিয়ে যাবার কথা তো আগেই বলেছি। যাদের বাপের বাড়িতে আদর নেই চাহিদা নেই, তাদের দু'চারদিনের জন্যে পারতো মামাশ্বশুর মাসশ্বশুরের বাড়ি পাঠিও ; নতুবা পূজোর ছুটিতে বা বড়দিনের ছুটিতে পুরি, বৈদ্যনাথ, দার্জিলিং, মধুপুর, ভুবনেশ্বর, শিমুলতলা বা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর দ্রষ্টব্য স্থানে সঙ্গে করে' বেড়িয়ে এনো। যদি প্রবাসে কোন বন্ধু বা কুটুম্ব সস্ত্রীক বাস করে, তাহলে সেখানে গিয়েও দু'চার দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসতে পারো। মাবাপ যদি কিছু মনে করেন—করুন। উপায় কি ? তোমাদের স্ত্রীরা অসুস্থ বা অসুখী হলে অথবা তাদের কারো অকালমৃত্যু ঘটলে দুর্ভোগটা তোমাদেরই ভুগতে হবে সব চেয়ে বেশী করে'। তবে বাপমায়ের মুখ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে—যদি সাধ্যে কুলোয়—কোনোবার একটি ছোটভাই বা একটি ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেও। বিদেশে তাদের দিয়ে ফাই-ফরমাসটা খাটানোও চলবে। ফেরবার সময় বাপমায়ের পছন্দসই কিছু জিনিস কিনে এনো। যাদের মাথার ওপর বাপমা নেই অথবা থাকলেও তাঁরা দূরে থাকেন, তাদের তো এসব বিষয়ে ষোল আনা স্বাধীনতা !

জীবনটাকে সত্যিকার উপভোগ করতে গেলে, পাঁচটা জিনিস দেখা চাই, পাঁচটা জিনিস চেনা চাই, পাঁচটা জিনিস পড়া চাই, আর পাঁচ

জায়গায় বেড়ানো চাই। মনটাকে তরুণ দেহটাকে তাজা রাখতে হলে, কর্মে ও নর্মে আহারে ও বিহারে বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজন। বিহার কথাটা আমি দুই অর্থেই ব্যবহার কচ্ছি। রতিক্রিয়ায় বৈচিত্র্য বলতে আমি মাঝে মাঝে পাত্র-পরিবর্তনের ইঙ্গিত কচ্ছি বলে' কেউ না আমায় ভুল বোঝে। এ ব্যাপারে আমি শুধু স্থানের বদল, কালের বদল, ভঙ্গীর বদল প্রভৃতি বোঝাতে চাই।…তাহলে আর একটু খুলে বলি শোন।

বিহারে স্থান-কাল-ভঙ্গীর বদল

স্থানের বদল বলতে আমি কি বুঝি জান ? যে ঘরটিতে সাধারণত তোমরা দুজনে মিলিত হও, পার তো মাঝে মাঝে অন্য ঘরে গিয়ে মিলিত হ'য়ো। নতুবা সুবিধামতো ছাতে, চিলে-কোঠায়, বারান্দায় বা বাগানে। শ্বশুরবাড়ি, মামাশ্বশুর মাসশ্বশুর পিসশ্বশুর বা বন্ধুর বাড়িতে অথবা বায়ু-পরিবর্তনে অন্যত্র গিয়ে পতিপত্নীর মিলনের মধ্যেও একটা নতুন ছন্দ একটা নতুন আনন্দ উপভোগ করা যায়। জামাই-ষষ্ঠীর দিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিগতযৌবন পতিপত্নী যখন একশয্যায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, তখন তাদের দেহে ও মনে যেন কয়েক মিনিটের জন্যেও বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার স্ফূর্তি ও দীপ্তি ফিরে আসে।

কালের পরিবর্তন মানে—যদি সাধারণত রাত্রিকালীন ভোজনের আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তোমাদের মিলন সম্পন্ন হয়, তাহলে সেটা মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে সমাধা ক'রো। ছুটির দিন ফাঁক্ পেলে (অর্থাৎ বাড়িতে কেউ না থাকলে) ক্বচিৎ এক-আধদিন দুপুরেও চলতে পারে। কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় কখনো নয়।

ভঙ্গীর পরিবর্তন ব্যাপারটা তোমরা অনেকেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। সাধারণত আমরা যে ভঙ্গীতে শৃঙ্গারে রত হই—সেটা

হ'ল স্ত্রীর চিৎ হয়ে' শয়ন ও পুরুষের তদুপরি উপুড় হয়ে আরোহণ। মাঝে মাঝে উভয়ের উপবিষ্ট সংস্থা, মুখোমুখী পার্শ্ব-সংস্থা অথবা স্ত্রীর স্বামীর ওপর আরোহ-পদ্ধতি গ্রহণ, নতুবা নিম্নমুখী শায়িতা স্ত্রীর পশ্চাদ্দিক থেকে পরিরম্ভণ প্রভৃতির দ্বারা রুচিবদল করা উচিত। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের ভাববিলাস ছলাকলা সাজসজ্জারও একটু ইতর-বিশেষ কর্‌তে পারলে মন্দ হয় না।

ধর,—একদিন খোঁপায় কাঁটালি চাঁপা গুঁজে, আর একদিন হ'ল এলো চুলে। একদিন থাক্‌বে কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, আর একদিন ঠোঁটে ও গালে গোলাপী গন্ধসার মাখা। একদিন গলায় ঝুলবে সোনার হার, অন্যদিন জুঁইবেলাবকুল ফুলের মালা। একদিন দ্রুত, আর একদিন বিলম্বিত লয়ে। একদিন একজন সক্রিয়, আর একজন নিষ্ক্রিয়, আর একদিন দুজনে ভাগাভাগি করে' সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন করবে।....এমনি করে' আমরা একই পাত্রের মধ্যে নব নব রূপ ও রস উপভোগ করতে পারি—এমনি করে' অন্তরোত্থিত বহুমুখী কামের বৈধভাবে প্রসাদন কর্তে পারি—এমনি করে' দাম্পত্যজীবনের প্রারম্ভিক উন্মাদনাকে জিইয়ে রাখ্‌তে পারি। ব্যাল্‌জাক্ এক জায়গায় বলছেন, "If there are varieties (as of melody) between one erotic occasion and another, a man can always enjoy happiness with one and the same woman."

শৃঙ্খলা, শুচিতা ও কান্তিরস

শুধু শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে নয়, সমস্ত সময়ই পরস্পর পরস্পরের কাছে ফিট্‌ফাট ছবিটির মতো থাক্‌বে। বাইরের লোকের বাহবা ও ব্যাজস্তুতি আহরণের জন্যে নয়, স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি

মোহাবেশকে চিরন্তন করার জন্যেই পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও প্রসাধন-দ্রব্যের উদ্ভব ও প্রয়োগ। আমাদের মেয়েরা সে কথাটা অনেক সময় ভুলে যায়। স্বামীর সাম্‌নে তারা কদর্য পোষাকে ঝুল-কালি-ধুলি-গোময় মেখে সর্বদা ঘোরাফেরা কর্‌বে; কিন্তু বেরোবার সময় বাক্স থেকে ভালো ভালো কাপড় টেনে বের করবে, গয়না পরবে, আলতা পরবে, দশ গুছির বিনুনি দিয়ে খোঁপা বাঁধ্‌বে, এসেন্স-আতর-লোশনে আপাদমস্তক ভিজিয়ে ফেল্‌বে। বাইরের স্ত্রীপুরুষের সরব ও নীরব প্রশংসাকুসুম চয়নের জন্যে সাজীর যেন এত সাজ-গোজ!

বিয়েটা দু'এক বছরের পুরোনো হয়ে গেলে প্রায় বউদের যেন স্বামীদের মনোহরণের আর কোন দরকার থাকে না। একটা ছেলে-মেয়ে হলে' প্রসাধনের আয়োজন ও উপকরণগুলো একে একে গুরুত্ব হারাতে থাকে। তারপর, কাপড়চোপড় কেন্‌বার দুর্বার দুষ্পূরণীয় আকাঙ্ক্ষাটা যত নারীর থাকে, সেগুলোকে মট্‌মট্ করে' ভেঙে পরার মনোরম সাধটা তত নারীর থাকে না। যতদিন তোমাদের জ্যেষ্ঠপুত্রটি সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হয় অথবা একটি মেয়ের বিয়ে না হয়, ততদিন তোমাদের যৌবন গেছে বলে' মনে করবার দরকার নেই। মেয়েদের দেহের যৌবন থাকে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত বটে; তাদের মনের যৌবন যেতে সুরু করে যেদিন তাদের একটি দৌহিত্র বা পৌত্র জন্মায়।...মনে রেখো, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে; যে বাসন মাজে সে সাবানও মাখে।

আজকাল অনেক মেয়েদের দেখি—তারা শুধু কাপুড়ে বিলাসিতার পক্ষপাতী অথচ পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না। শীতকালে তারা ঠাণ্ডা জলের ধারে যাবে না। নায় যদি তা গরম জলে। সাবান মাখ্‌ল যদি, তাহলে শুধু মুখে, গলায় ও শরীরের যে অংশগুলো বেরিয়ে থাকে সেইগুলোতেই বেশী ঘষে। ভালো ভালো কাপড়-ব্লাউজ-কাঁচুলি দিয়ে

—এসেন্স-স্নো-লিপ্‌স্টিক্ দিয়ে তারা শরীরের ন্যূনতা, স্বেদ ও ক্লেদ ঢাক্‌তে চেষ্টা করে। তারা সপ্তাহে একদিন করে' নখ্ কাটবে না, মাসে একদিন করে' মাথা ঘষ্‌বে না, রোজ ভালো করে' দাঁত মাজ্‌বে না, শৌচক্রিয়ায় চরম অবহেলা করবে, কিছু খেয়ে ভালো করে' কুল্‌কুচো কর্‌বে না। শুচিতার মামুলি নিয়মগুলি এরা পদে পদে পদদলিত করে।

বহুদিন আগে সুইফ্‌ট যে বলেছিলেন—"It is not impossible to be very fine and very filthy; and the capacities of a lady are sometimes apt to fall short in cultivating cleanliness and finery together," আজকালকার শিক্ষাভিমানিনী প্রগতিশীলা মেয়েদের হাঁড়ির খবর নিলে সেটা কতখানি সত্যি তা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। তোমাদের বার বার বলে রাখ্‌ছি, গ্রীষ্মকালে রোজ সাবান মাখ্‌লে বিশেষ আপত্তি কর্‌ব না, কিন্তু হেমন্তেশীতে রোজ কিছুতেই নয়। ভিজে গামছা দিয়ে গা ডলা ও গায়ে তেল মাখার রেওয়াজটা একেবারে তুলে দিয়ো না। সর্বাঙ্গ পরিচ্ছন্ন রেখো যাতে তোমাদের শরীরের কোন অংশই স্বামীদের রুচিকে বিদ্রোহী না করে। দারুণ গ্রীষ্মে খুব পাৎলা কাপড়ের শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ্ প'রো, কাঁচুলি এঁটো না; মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে বাতাস খেলার সুযোগ দিয়ো।

দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। তোমাদের মিনতি করে' বলছি, ঐ অভ্যাস যত শিগ্‌গির পার ছাড়ো। কিন্তু খাওয়ার পর একটা করে' পান খাওয়ার অভ্যাসটা ভালো; পান না খাও, অন্তত মশলা চিবিয়ো। আজকালকার মেয়েদের অনেকেই পানকে কুসংস্কার বলে' পরিত্যাগ করেছে। তাদের দাঁতের ফাঁকে ও নিঃশ্বাসে যে দুর্গন্ধ বাসা বাঁধে, তা লিপ্‌স্টিকের হাল্কা সুগন্ধকে ছাপিয়ে দিয়ে প্রিয়ভাজনের নাসিকাকে পীড়িত করে। পাউডার-পমেটম-রুজ্-স্নো-ক্রীম প্রভৃতির

খরচ যতসাধ্য কমিয়ো। অর্থনীতি ও উভয়ের স্বাস্থ্যনীতির দিক্ থেকে এদের ব্যবহার ঘোর আপত্তিকর। লিপ্‌স্টিক্, রুজ্, স্নো, ক্রীম প্রভৃতি তোমাদের চর্মের স্বাভাবিক সুস্থতাকে ব্যাহত করে, এগুলো কালে-ভদ্রে পালে-পর্বে ব্যবহার করতে পারো। বাড়ির মধ্যে দিনরাত এগুলোর ব্যবহার ছাড়ো। এদের খানিকটা তোমাদের পেটে ও তোমাদের প্রেমাস্পদেরও পেটে যায়। এদের মধ্যে অল্পবিস্তর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য আছে। ঘরে ধূপ পুড়িয়ো, ধুনা-গুগ্‌গুল-মুশব্বর-অগুরুর ধোঁয়া দিয়ো, ফুলদানিতে সুগন্ধি ফুল রেখো—আপত্তি নেই। সুমিষ্ট বচন, সুপ্রসন্ন দৃষ্টি, সুপবিত্র দেহমনের একটা নিজস্ব সুরভি আছে যেটা এসেন্সের গন্ধকে ছাপিয়ে ফুটে ওঠে। এ কথাটা ভুলো না কখনো।

স্বামীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা-জ্ঞান জাগিয়ে তুলো। শোওয়ার ঘরে বাইরের জুতো ঢুকতে দিয়ো না। স্বামীদের বাড়িতে ময়লা-ইচুটি কাপড় বা লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়ে রেখে নির্বিকার থেকো না অথবা প্রতিবেশীদের মনে মনে কৌতুক অনুভব করতে দিয়ো না। অল্প মূল্যের ছিন্ন বসনও পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। ধোপার আশায় না থেকে কাপড়-কাচা সাবানের ব্যবহারটা নিজের হাতে কর্‌তে শিখো; রাতদিনের ঝি থাক্‌লে তাকে দিয়েও করিয়ে নিও। কবিগুরু নিজের হাতে সময়-সময় কাপড়জামা কাচতেন এবং নিজের হাতে সেগুলো ইস্ত্রি করতেন। কাপড় কোঁচাতেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি। ইস্ত্রি করা ও কাপড় কোঁচানো বিদ্যেটা তোমরা বিনা গুরুতেই শিখে নিতে পারো—কিছু শক্ত নয়।

দুই-একটি সন্তান জন্মানোর পর তোমরা কেউ ত্রিকালজ্ঞ হাড়পাকা বুড়োবুড়ী হবার চেষ্টা ক'রো না, অথবা জামাই-পুত্রবধূ হওয়ার পর মেয়ে-বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যৌবন ফেরাবার কলাকৌশল-প্রয়োগে

মন দিয়ো না। স্পেন দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যদি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচতে চাও, তাহলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলো (*Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano*)। আমাদের যুবকযুবতীরা বয়সের অনুপাতে হয় খুব বেড়ে চলে, নয় খুব খাটো থাকে। কোনটাই ভালো নয়। একটু সংস্কারপন্থী গৃহস্থসংসারে দেখি—বিয়ের বছর দুই-তিনের মধ্যে নির্মম বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে দুজনার চোখের কোল থেকে স্বপ্নসুষমামাখা মাদকতাভরা রোমান্সের মায়া-কাজল মুছে গেছে। ছিন্ন মলিন সাড়ি আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিনরাত চলে গম্ভীরমুখে সংসারখরচের হিসাব-নিকাশ, কুটুম-বাড়ির তত্ত্ব-তল্লাস, খোকাখুকুর দুধ-অসুখ-বায়নার আলোচনা, তুচ্ছ-বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি, আপিস ও রান্নাঘরের গুরুত্ব-বিচার! রবীন্দ্রনাথ "শেষরক্ষায়" চন্দ্রকান্তের মুখ দিয়ে এক জায়গায় বলছেন—"আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দু'দিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা ছিঁড়ে ঢলঢল্ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ!"....কথাটা সাধারণভাবে সত্যি হলেও তোমরা ওটাকে আযৌবন মিথ্যা বলে' প্রমাণ কর্তে সচেষ্ট হ'য়ো।

সপ্তম আলাপন

ঘর-সংসারের দু'চার কথা

আমার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নিশ্চয়ই দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য ঘরের বর-বউ আছ। তোমাদের ঘর-সংসারের আকারপ্রকার ও পরিচালন-পদ্ধতি পৃথক না হয়ে পারে না। আবার বড় শহরের, ছোট শহরের, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গীয় শহরে, পল্লীতে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের মধ্যে জীবনযাত্রাপ্রণালীতে পার্থক্য আছে। আমি সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুটি কয়েক উপদেশ দিয়ে যেতে চাই সংসার পরিচালন সম্বন্ধে। মেয়েদের দেব বেশী করে', পুরুষদের দেব কম করে'; কারণ মেয়েরাই হ'ল সংসার-মৌচাকের মক্ষিরাণী।

বড়লোকের বৌদের সংসারে খাট্‌বার অনেক লোক আছে, সুতরাং তাদের আর খাট্‌বার কোন দরকার নেই—শেখবার কিছু নেই, এ ধারণাটা মনগড়া ও যুক্তিহীন। খনার বচনে একটা ছড়া আছে তোমরা কেউ কেউ জানো বোধ হয়—"খাটে খাটায় লাভের গাতি, তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।"....যারা জমিজেরাত থেকে ন্যায্য লাভ আদায় করে, তারা তাদের অধীন লোকগুলোকে সমানে খাটায় এবং নিজেও তাদের সঙ্গে সমানে খাটে। যারা শুধু জমির কাছে খানিকক্ষণ কাঁধে ছাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ পরিদর্শন করে ও দু'চারটে উপদেশ দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হয়, তারা লাভের অর্ধেক পায়। আর যারা ঘরে বসে' শুধু হুকুম চালায় ও লোকমুখে সংবাদ নেয়, তাদের কিছুই লাভ হয় না। সংসার-ক্ষেত্র সম্বন্ধেও এই কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য।

তাই বড়লোকের বউদের গোড়াতেই বলি, আল্‌সেমি করে' শুয়েবসে হুকুম চালিয়ে সংসার-পরিচালন করার কল্পনাকে মনে ঠাঁই দিয়ো না। ঝি-চাকর-পাচক খানসামা বা বাবুর্চিদের দিয়ে মনের মতো কাজ করিয়ে নিতে গেলে, তাদের পালনীয় কাজকর্মগুলিতে নিজেকে অভিজ্ঞ হ'তে হয়, মাঝে মাঝে নিজের হাতে এক-একটি কাজ করে' তাদের দেখিয়ে দিতে হয়; নইলে তারা ফাঁকি দেবে অথবা তোমাদের মনের মতো কাজ করবে না। তাছাড়া তাদের কাজকর্মের ওপর কড়া নজর না রাখ্‌লে তারা চুরি কর্বেই। এক-একটা বড়লোকের সংসারে গৃহিণীদের পরিদর্শনের অভাবে অর্ধেক চুরি যায়। তা ছাড়া কত নোংরামি, ইতরামি ও ব্যাধিবীজাণু যে চাকরবাকরদের মারফৎ সংসারে প্রবেশ করে তার আর ইয়ত্তা নেই।

লীলার সংসার

ধরা যাক্—লীলার স্বামী দীপ্তেন্দু পশ্চিমের কোন শহরে সাড়ে-সাত শো টাকা মাইনের বড় চাক্‌রি করেন। বছর দেড়েক হ'ল তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর কিছুদিন লীলা বাপের বাড়ি ছিল, তারপর কিছুদিন মুন্সীগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়িতে ছিল। শ্বশুররা মাঝারি ধরণের জমিদার। শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য সকলে মাস কয়েক আগে বাস্তত্যাগ করে' বরাহনগরে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে' বাস কচ্ছিলেন। বাড়ীখানায় একটা বড় বনেদী পরিবারের কিছুতেই আঁটে না। কিন্তু উপায় নেই, বাস্তত্যাগী আতঙ্কগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড়ে কল্‌কাতার শহর ও আশেপাশের শহরতলিগুলি ভরে' গেছে। সম্প্রতি শ্বশুরশাশুড়ি কাশীতে একখানা ছোট্ট বাড়ি কিনে সেখানে এসে উঠেছেন; লীলা ও তার পনেরো বছর বয়স্কা একটি আইবুড়ো ননদ দীপ্তেন্দুবাবুর কর্মস্থলে এসেছে।

তারা এসে দেখ্‌ল দীপ্তেন্দুর ক্ষুদ্রতম সংসারে চৌর্য ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। দেশ-থেকে-আনা একটি বাঙালী চাকর আছে, একটি বাসন-মাজা ঝি আছে, একটি হিন্দুস্থানী পাচক আর একটি ড্রাইভার আছে। আদালতের চাপরাশীটাও বাবুর ছোটখাটো ফাইফরমাস্ খেটে দিয়ে একবেলা খাওয়ার মৌরসী ব্যবস্থা করে' নিয়েছে। লীলা শুন্‌ল—স্বামীর একলার সংসারে মাসে চার শো টাকা করে' খরচ হয়। অথচ পূর্ব-পাকিস্থানের বা পশ্চিম বাংলার যে-কোন জায়গার চেয়ে এখানে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত কম।

লীলা কি এই অব্যবস্থার রাজত্বের মাঝখানে শুধু হুকুমদাত্রী নিশ্চেষ্টা কর্ত্রী হয়ে বসে' থাক্‌বে? সে যদি সত্যিকারের গৃহিণীপদ-বাচ্যা হ'তে চায়, তাহলে তাকে নির্মম সবল হস্তে এই অজিয়াস্ রাজার আস্তাবলকে পরিষ্কার করতে হবে।....লীলা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি ও কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিল। বাজারের ফর্দ নিজের হাতে করতে লাগ্‌ল ও চাকরের কাছ থেকে বাজারের হিসাব নিয়ে বাকি পয়সা ফেরৎ নিতে লাগ্‌ল। তোলা মাইনের ঝি,—আরো তিন বাড়িতে কাজ ক'রে সে; তার খোরাক পাবার কথা নয়। কিন্তু সে রসুইকারের সঙ্গে রসিকতা করে' ও অক্ষমতার অজুহাত দেখিয়ে মাঝে মাঝে ভাত-তরকারি চেয়ে নিয়ে যেত। লীলা দিল সেটা বন্ধ করে'। আদালতের চাপরাশীর একবেলা পাত পাতাটাও উঠে গেল। পাচকটি ভাত, রুটি, ডাল আর চচ্চড়ি ছাড়া আর কিছুই রান্‌তে জানে না, তবু রাঁধে; মাছের ঝোলে সে গরম মশলা পেঁয়াজ-বাটা দেয় আর কালিয়ায় দেয় সরষে-বাটা। নুন-হলুদের পরিমাণ তার কোনদিনই ঠিক থাকে না। মাংসে সে এত ঝাল দেয় যে, তিন দিন ধরে' জিব্ থেকে তলপেট্ পর্যন্ত খাণ্ডব-দাহন চলতে থাকে। ডিম সে ছোঁয় না, রাঁধা তো দূরের কথা।

লীলা সচ্ছল গৃহস্থের মেয়ে, তার বাপের বাড়িতে বৃহৎ পরিবার। কিন্তু সেখানে পাচক রাখার রেওয়াজ নেই কোনদিন। বাড়ির গিন্নি, বউ আর মেয়েরা সবাই পালা করে' রাঁধে। অথচ প্রত্যেক মেয়েটিই স্কুল-কলেজ পড়েছে বা পড়ে। মা-খুড়ি-জ্যাঠাইয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মেয়ে ও বউকে রন্ধন ও ঘর-গৃহস্থালির সমস্ত কাজ শিখ্‌তে হয়েছে ও নিত্য তার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। লীলা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় "গৃহস্থালি-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য" নামক ঐচ্ছিক বিষয়টা গ্রহণ করেছিল এবং তাতে উচ্চতম মার্ক রেখেছিল। তারপর সে বি-এ পাশ করেছে ডিস্টিংশন পেয়ে। লীলা পাচককে সানন্দে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করল; শুক্তুনি থেকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি পর্যন্ত মোটামুটি সমস্ত পদের রান্না তাকে সযত্নে শিখিয়ে দিল মাস দুইয়েকের মধ্যে। বেলা বারোটার মধ্যে পাচককে বিদায় দিয়ে সে নিজে জলখাবার তৈরি করে; এক-একদিন সন্ধ্যার সময় স্টোভ জ্বালিয়ে মাংস ও ডিমের রকমারি পিষ্টক-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। স্বামী তরিবৎ করে' দু'বেলা আহার করেন, আর পার্শ্বোপবিষ্টা প্রসন্নদৃষ্টি পত্নীকে লক্ষ্য করে' বলেন—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে," কখনো বলেন—"A ministering angel thou !"....

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটুকরো ও এক-পাশে এক ফালি জমি ছিল। সাম্‌নের জমিটুকুর কিনারায় গোটাকয়েক চাইনিজ পাম্ ও ঝাউ গাছ লাগানো হ'ল। আগেই ওখানে একটা গন্ধরাজ, একটা চাঁপা ও গোটা তিনেক চীনে জবার গাছ ছিল। চাকরকে দিয়ে জমি পরিষ্কার করিয়ে সেখানে স্তরবিন্যাস করে' লাগানো হ'ল দোপাটি, জুঁই, বেলা ও চামেলির চারা। রোয়াকের কোল দিয়ে চওড়া পাড়ের মতো পুঁতে দেওয়া হ'ল বিলিতী মর্ম্মী ফুলের চারা। ফটকের মাথায় জাফ্‌রি-করা বাঁশের মাচায় হাস্নাহানার গাছের ঝাড় লতিয়ে ওঠার

ব্যবস্থা করা হ'ল। পাশের ফালিটায় গোটা কয়েক পেঁপে গাছ ছিল; সেখানে মাচা বেঁধে শিম, ঝিঙে আর কুমড়ো গাছ লাগানো হ'ল; গোটা কয়েক ঢ্যাঁড়সের চারাও মাথা খাড়া করে' উঠ্‌ল।

বাইরের ঘরে সোফাগুলোর ওপর তেলসিটে পড়তে আরম্ভ করেছিল; লীলা সেগুলোতে খাসা ঝালর-দেওয়া ঢাক্‌নি করে' দিল। টেবিলগুলোতে চমৎকার ফুল-তোলা ঢাকা করে' দিল। ঘরের ঝুল, শার্সির ধুলো নিয়মিত সাফ্ হ'তে লাগ্‌ল। একটু কোথাও ভুলচুক্ হ'লে—কোথাও একটু ময়লা থাক্‌লে ঝিচাকরের ওপর বেজায় তম্বি চলে। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে পনেরো দিনের বাসি ফুলের গোছার বদলে নিত্য নতুন ফুলের তোড়া বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা হ'ল।

স্বামীর বদ্ অভ্যাস ছিল সিগারেট্ খেয়ে যেখানে-সেখানে ফেলার। বৈঠকখানায় ও শোওয়ার ঘরে অ্যাশ-ট্রে রেখে লীলা ঘোষণা করল, মেঝেতে সিগারেটের ছাই ও টোটা পড়ে' থাক্‌লে সিগারেটের প্যাকেটগুলো সে নিয়মিতভাবে অগ্নিসাৎ করতে থাক্‌বে। নিয়ম হ'ল যে, আফিসের জুতো ওপরে উঠ্‌বে না; বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে এক জোড়া ভেলভেটের শ্লীপার পৃথক রইল। এখন আর চাকরের অসুখ করলে বাজার বন্ধ থাকে না, লীলার জোর তাগাদায় পড়ে' দীপেন্দু বাবুকে আপিসের চাপ্‌রাশিটাকে নিয়ে বাজারে ছুট্‌তে হয়। চাক্‌রানি কামাই করলে এঁটো বাসন আর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে' থাকে না অথবা কাউকে শালপাতায় খেতে হয় না।

ননদ ঋতা শহরের এক মিশনারী মেয়ে-স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। সে ফাঁক্ পেলেই বৌদির গৃহকাজে সাহায্য করে, তার কাছে নানা রকমের খাবারদাবার তৈরি করতে—রকমারি সেলাইয়ের কাজ শেখে।

মোদ্দা কথা, লীলা দু'মাসের মধ্যে তার স্বামীর সংসারের শ্রী ফিরিয়ে ফেল্‌ল। সংসারে দুটো মাথা বাড়্‌ল, অথচ লীলার তত্ত্বাবধানে খরচ চারশো টাকা থেকে তিনশো টাকায় নাম্‌ল। শহরের যত বড় চাকুরেদের বাঙালী বউ-ঝিরা লীলার সঙ্গে আলাপ করতে এসে তার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হ'ল। সে সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারে, ননদটি আবার স্বরোদ বাজাতে ওস্তাদ। এ মেয়ে বলে—আমাদের বাড়ীতে কবে বেড়াতে যাবেন বলুন, ও বউ বলে—আমাদের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন আপনাদের কালকে; এ গিন্নি বলেন—দীপ্তেন্দু বাবুর বউয়ের জোড়া আর এ শহরে নেই, ও গিন্নি বলেন—যেমন রূপ তেমনি গুণ, এমনি একটি বউ আমি পেতুম!…

কারু বাড়িতে কেউ টেনে নিয়ে না গেলে লীলা বড় একটা যায় না; কারু সঙ্গে বেশী মেশামিশি করা বা ঘোঁট পাকানো মোটে ও পছন্দ করে না; মেয়ে-মজলিস্ বা সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়াটা ওর রুচিবিরুদ্ধ। একদিন জনকয়েক মেয়ে আর বউ এসে ওকে বল্ল, "আমাদের বিধবা-শিল্পাশ্রমের একজন ভালো অনারারি সেক্রেটারির প্রয়োজন। আমরা আপনাকে ঠিক করেছি, রাজি আছেন তো?" লীলা ঠোঁটের কোণে একটু মিষ্টি ও দুষ্টু হাসির রেখা টেনে বল্ল—"আমি কিন্তু রাজি নই ভাই। আপাতত সধবা-শিল্পাশ্রম নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত আমি; তার-ওপর মাস কয়েকের মধ্যে হয়তো আমায় শিশু-কল্যাণ-আশ্রমের ভার নিতে হবে। সুতরাং….।"…

লীলার মতো সব বড়লোকের মেয়ে-বউ হ'ত যদি, তাহলে তো বেঁচে যেতুম। আমার বকুনি খাওয়ার বা উপদেশ পাবার আগেই তোমরা নিশ্চয়ই লীলার চেয়ে আরো ভালো হবার সাধনায় তনুমন সমর্পণ করেছ।

রসুইকার রাখার রেওয়াজ

শুধু বড়লোকের বাড়িতে নয়, সচ্ছল বা অর্ধসচ্ছল শহুরে মধ্যবিত্তের বাড়িতেও একটা করে' পাচক বা পাচিকা বা বাবুর্চি রাখার রেওয়াজ হয়েছে। সেই সঙ্গে ঝি চাকর খানসামা মালী দরোয়ান্ রাখারও বাতিক বেড়েছে অত্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বড় বড় জমিদার-বাড়িতেও কখনো নিত্যকার রন্ধন-ব্যাপারে পাচকের সাহায্য গ্রহণ করার প্রথা ছিল না। এমন কি, বড় বড় ক্রিয়া-কর্মের সময়ও গ্রামের বিধবা বর্ষীয়সীরা কোমর বেঁধে রান্নাঘরে প্রবেশ করতেন, তাঁদের সাহায্যকারিণী হিসেবে জন কয়েক রন্ধন-কলাভিজ্ঞা সধবাও পেছনে পেছনে যেতেন। হাজার দেড় হাজার লোকের ষোলো ব্যঞ্জনের রান্না তাঁরা কোন গুঁফো দ্রৌপদীর সাহায্য না নিয়েই সুন্দরভাবে ও অবলীলাক্রমে রাঁধ্‌তেন; কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশনও করতেন। লোকে তৃপ্তির সঙ্গে খেত এবং অতিবড় নিন্দুকও 'এটায় নুন কম ওটায় ঝাল বেশী' বল্‌তে সাহসী হত না।

তখনকার কালে কেবল মিষ্টান্ন প্রস্তুতির জন্যে বড়লোকের বাড়িতে জন কয়েক হালুইকর আস্‌ত। তারা গ্রাম্য দ্রৌপদীদের রান্না দেখে অবাক হ'ত ও খেয়ে ধন্য হ'ত। কী কুক্ষণেই যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আমাদের দেশে হোটেল-মেসের পুরুষ পাচক ভদ্র-লোকের শুদ্ধান্তঃপুর ভেদ করে' রান্নাঘরে এসে ঢুক্‌ল! সেই থেকে তাদের চাহিদা যেমন বাড়ছে, মাহিনা তেমনি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের ভেতর দুর্নীতি ঢুক্‌ছে, অম্লাজীর্ণ ঢুক্‌ছে, দাদ-চুলকণা ঢুক্‌ছে; বউদের আলসেমি বাড়্‌ছে, বিবিয়ানা বাড়্‌ছে, মাথা ধরা বাড়্‌ছে, হিস্টিরিয়া বাড়্‌ছে। এর জন্যে বউরা দায়ী যতখানি, স্বামীরা

দায়ী তার চেয়েও বেশী।....আমি বলি, কোন বাড়িতে গিন্নি যদি পাচক পাচিকাকে নিজ পদাধিকার-বলে নিযুক্ত করেন, তাহলে বাড়ির কর্তা ও ছেলেমেয়েরা নিরুপদ্রবভাবে অনশন-ধর্মঘট করুক কিছুদিন। দেখি কারখানার মালিকদের মত গিন্নিদের চৈতন্য হয় কিনা!

আগে গৃহিনিপনার একটা বড় অঙ্গ ছিল রন্ধন। পৌরাণিক যুগের কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম; মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গলের সময় পর্যন্ত, রামপ্রসাদ থেকে বিহারীলালের আমল পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্য-পাঁচালি-কথকতা-ছড়া-গানে বুকভরা-মধু বঙ্গবধূদের রন্ধনবিদ্যার প্রশংসা শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। আগে যে বউ রাঁধতে জান্‌ত না এবং সন্তানপ্রসব কর্‌তে পার্‌ত না—তাদের নারীসমাজে কেউ পাত্তা দিতে চাইত না, তাদের নারীত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হয়ে উঠ্‌ত। তখন রান্নাঘরে কোন পুরুষমানুষ ঢুক্‌লে রান্নাঘরের জাত যেত আর মেয়েদের লজ্জায় মাথা কাটা পড়্‌ত। হাড়-কাঁপানো পালা জ্বর গায়ে নিয়েও বিশ বছর আগে মেয়েরা স্বামিপুত্রদের জন্যে ভালভাত রেঁধে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে লেপের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

এখনো পল্লীর লক্ষ লক্ষ ঘরে এ দৃশ্য দেখা যাবে। কিন্তু শহরে যে পরিবারে দু'শ টাকা মাসিক উপার্জন, সেখানে হয় গিন্নি কর্তার টুঁটি টিপে একটি পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত করিয়ে ছাড়ে, নইলে কর্তা গিন্নির দুঃখে গলে' তাঁর কাঁধে একটি পাচক বা পাচিকা চাপিয়ে দেয়। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা অশিক্ষিতা অর্ধশিক্ষিতা শহুরে নারীদের অনেকেই সম্বরার গন্ধে মূর্চ্ছিত হয়, পরিবেশন কর্তে গিয়ে গায়ে আঁচল জড়িয়ে ঝোলের কাঁসি শুদ্ধ আছাড় খেয়ে পড়ে। পল্লীগ্রামের সচ্ছল গৃহস্থ-বাড়িতেও এখনো পাচক প্রবেশ করেনি, সেইজন্যে তারা ভাতের সঙ্গে পাঁচন ভক্ষণ করার দুর্ভাগ্য থেকে দূরে আছে!

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের হাতে রান্না ধরেছ, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌বার নেই; কিন্তু যারা ধরনি—তাদের আমি রীতিমতো ধমকানি দিতে চাই। এজমালি সংসারের বউই হও বা একলা সংসারের বউই হও, রান্নার অভ্যাস ও অধিকারটা কিছুতেই ছেড়ো না। যে বউ রান্নাকে ভয় করে, সে স্বামীকে ভালবাসতে জানে না, পুত্রকন্যাকে স্নেহ কর্‌তে জানে না; শ্বশুরশাশুড়িকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শুদ্ধান্তঃপুরের সবচেয়ে শুদ্ধ জায়গাটি হ'ল রান্নাঘর; সেখানে একটা অজ্ঞাতকুলশীলকে ঢুকতে দিয়ো না। সে তার খুশিমতো তোমাদের কুরন্ধন খাওয়াবে, বেশী কিছু বল্‌লে চোখ রাঙাবে, বাইরের রোগ ভেতরে আন্‌বে, ভেতরের কথা বাইরে চালান্ করবে। তার কাছে privacy বলে' কিছু জিনিস থাকে না। তার মনে চুরি-ডাকাতি-খুন-ধর্ষণের কুমতলবও বাসা বাঁধতে পারে। আমি ভাবি কি করে' ওদের সামনে নিশ্চিন্ত থাক তোমরা!

রেঁধে খাওয়ানোর মধ্যে যেমন একটা আত্মপ্রসাদ আছে, রেঁধে খাওয়ার মধ্যেও তেমনি একটা আত্মতৃপ্তি আছে। নিজের স্বামিপুত্র পরের হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করবে, সেটাতে বউদের হিংসা ও লজ্জা দুই-ই হওয়া উচিত; আবার খেয়ে অপ্রশংসা করলে তাদের লজ্জা ও বেদনা দুই-ই পাওয়া উচিত। শিক্ষিতা নারীদের অনেকেই মনে করে—লজিক, ফিলজফি, সিভিক্স্, বায়রন্, শেলি, কীট্‌স্, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শেখানো বুলি কপ্‌চে, দুটো গান গেয়ে, একটু এস্রাজ বাজিয়ে, চা তৈরি করে' খাইয়ে, তারা স্বামীকে বশ করবে ও শ্বশুর-শাশুড়িকে তাক্ লাগাবে।

কিন্তু সে দিন চলে' যাচ্ছে; হাওয়া বদ্‌লাতে সুরু করেছে। গৃহস্থ-ঘরে একাধারে মোটামুটি রূপসী ও অতি-বড় ঘরনীর চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনি অতি-বড় বিদুষীদের চাহিদা কমে' এসেছে।

কলেজে-পড়া মেয়েদের সঙ্গে আজকালকার যুবকরা উচ্চাঙ্গের বা নিম্নস্তরের প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিবাহ-জীবনে প্রবেশ কর্তে চাচ্ছে না। অনেকেরই ধারণা হয়েছে—এরা রূপযৌবনের জৌলুস হারায়, সুমাতা ও সুগৃহিণী হওয়ার যোগ্যতা হারায়। কথাটা বেঠিক নয় এবং আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে এটা বেশী করে' সত্যি। তবে এর ব্যতিক্রম আছে ও ক্রমশ বাড়ছে। কোন কোন বাড়িতে ইংরিজিতে সংস্কৃতে ফিলজফিতে বা ইকনমিক্সে ফার্স্ট-ক্লাস্-পাওয়া এম-এ-পাশ বউ দিব্যি গাছকোমর বেঁধে রান্না করছে, সংসারের সবাইকে পরিবেষণ করে' খাওয়াচ্ছে দেখি। ঝি কামাই কর্লে বাসন মাজ্‌ছে—ছেলেমেয়েদের কাপড়জামা সাবানে কাচছে!···ভালো লক্ষণ!

নীলিমার স্বর্গ

আর একটি বউয়ের কথা বল্‌ছি তোমাদের। বউটির ছদ্মনাম নীলিমা। বি-এ পড়্‌তে পড়্‌তে তার বিয়ে হয় বছর ষোলো সতেরো আগে। স্বামীর তখন মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা। নিজের একখানা বাড়ি আছে কল্‌কাতা শহরে; ব্যবসা থেকে মাসে তিন-চার শো টাকা আয় হয়। বাড়িতে তখন বেশী লোকজন নেই। একটা পাচক আছে। সকালের দিকে নিরামিষ রান্না তাঁর বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ি অথবা এক প্রৌঢ়া বিধবা ননদ রাঁধেন। বউটি বিয়ের পর দু'এক মাস চূড়ান্ত আদরযত্ন পেল শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছ থেকে; তাঁকে কেউ কুটোটা ছিঁড়ে দু'খণ্ড কর্তে দিত না। তারপর সে ঝিয়ের হাত থেকে বঁটি কেড়ে নিয়ে কুট্‌নো কুট্‌তে বসে, চাকরের হাত থেকে কাপড় কোঁচাবার ভার নেয়, ঠাকুরকে মাংস রান্না দেখিয়ে দেয়। শাশুড়ি-ননদরা বকেন, স্বামী মনে মনে একটু খুশি হয়ে' একান্তে বলে—"ও সব করবার জন্যে তো লোক রয়েছে। তুমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও না।"

প্রাইভেটে বি-এ দিয়ে বউটি পাশ করল। দু'টি বিধবা ননদের একজন ছেলের কাছে চলে গেলেন। আর একজন বিধবা ননদ রুগ্ন হয়ে কাজকর্মের বাইরে চলে গেলেন; তিনি কথনো কল্‌কাতা কখনো মধুপুর কর্তে লাগ্‌লেন। শাশুড়ি ক্রমশ বুড়ো হচ্ছেন; বাত আর ব্লাড্ প্রেসারে তাঁকে এমন করে' ঠেসে ধর্‌ল যে, তিনি প্রায়ই আর রান্নাঘরে যেতে পারেন না।

বউটি স্বামীর মত্ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হ'ল। সে ভোর বেলা উঠে স্নান সেরে নেয়; তারপর খানিকক্ষণ কলেজের পড়া পড়ে। আটটা সাড়ে আটটা লাগাৎ সে শাশুড়িননদের জন্যে পৃথক রান্নাঘরে নিরামিষ রাঁধ্‌তে যায়। দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে তাঁদের রান্না রেঁধে শাশুড়ির ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে। তারপর সে নিজে খেয়েদেয়ে ট্রামে করে কলেজে যায়; সাড়ে-তিনটেয় ফেরে।···

এমনি করে' প্রায় দেড় বছর কাট্‌ল। এম-এ পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল। পরীক্ষার বোধহয় মাস দুই দেরি আছে, এমন সময় পাচক ব্রাহ্মণটি দেশে গেল, বলে' গেল সাত দিনের মধ্যেই ফিরবে। আর তার দেখা নেই। সে মরল কি সরল বোঝা গেল না। তিন-চার মাসের গর্ভ, অধ্যয়নব্যাপৃতি ও পরীক্ষার চিন্তা নিয়ে আমিষ রান্নার ভার নিতে হ'ল তখনকার মতো বউটিকে। শাশুড়ি কোনমতে নিরামিষ রান্নাটা চালিয়ে নিতে লাগ্‌লেন। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও এক মাসের মধ্যে একটা পাচক খুঁজে পাওয়া গেল না। একজন প্রাইভেট্ টিউটর মাস কয়েকের জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বউটি একদিন তাঁকে বল্‌ল যে, সে এবার এম-এ দেবে না, তাঁকে আর আপাতত পড়াতে আস্‌তে হবে না। তাঁর মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হ'ল। স্বামী ও শাশুড়িকেও বউ তার সঙ্কল্পের কথা জানাল।

এম-এ পরীক্ষা পরের বছরও দেওয়া হ'ল না, আর কখনো দেওয়াও হয়নি। পরীক্ষার মাস চার-পাঁচ আগে নীলিমার একটি ছেলে হ'ল। ইতোমধ্যে পাচক একটা জুটেছিল বটে, কিন্তু নিরামিষ রান্নাটা তাকে সাত মাস গর্ভকাল পর্যন্ত সমানে চালিয়ে যেতে হয়েছিল; তারপর সে মাস পাঁচেকের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যায়।....আজকে বউটির স্বামীর আয় বাড়্‌তে বাড়্‌তে হাজার পাঁচেকে দাঁড়িয়েছে, সংসারও আগেকার চেয়ে ঢের বড় হয়েছে। তাদের পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে। নিরামিষ রান্না আজো বউটিকে রাঁধ্‌তে হয়। বছরে ছ-সাত মাস পাচক থাকে না। তখন সে ভোরবেলা আমিষ হেঁসেলে এসে ঢোকে। দশটার মধ্যে বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের ও আপিসের বাবুদের খাইয়ে-দাইয়ে, তারপর স্নান করে' নিরামিষ হেঁসেলে এসে ঢোকে। বারোটার সময় রান্না সেরে, শ্বাশুড়িননদের ভাততরকারি গুছিয়ে রেখে সে আবার আমিষ হেঁসেলে আসে। বারোটা পর্য্যন্ত অতিথ-কুটুম্বরা, বেলার বাবুরা ও ঝিচাকররা একে একে এসে খেতে বসে। দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে স্বামীকে খাইয়ে বেলা তিনটে লাগাৎ নীলিমা শীতল অন্ন মুখে দেয়।

পাচক থাকুক্ আর নাই থাকুক্ বউটিকে দু'বেলার জলখাবার তৈরি করতেই হয়, প্রত্যেকের খাওয়ার সময় তত্ত্বাবধান করতে হয়, পাচককে প্রায়ই রান্না দেখিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া অতিথ-কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ হলে' স্টোভ্ জ্বালিয়ে তাকে পৃথক রান্না করতে হয়। এত খাটুনির মধ্যেও রোজ দু'তিনখানা খবরের কাগজ পড়ার, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো সম্বন্ধে একটু-আধটু তত্ত্বতল্লাস নেবার, কোলের সন্তানটিকে একটু আদর করবার ও গৃহের রোগীদের পাশে এসে খানিকক্ষণ বসার সে অবসর করে' নেয়। আশ্চর্য তার প্রাণশক্তি!

নীলিমাদের নিজেদের মোটর আছে। ইচ্ছে কর্লেই সে রোজ দু'বেলা হাওয়া খেতে, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি বেড়াতে, আজ থিএটার

কাল সিনেমা পরশু দক্ষিণেশ্বর যেতে পারে; কিন্তু যায় না। স্বামী যদি কোনদিন টেনেটুনে নিয়ে গেল তো ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে' যায়, নইলে কর্মকণ্টক-ঘেরা সংসারের গণ্ডী সে সহজে পেরুতে চায় না। নিজের ভাইপো ভাইঝির বিয়েতে দাদারা যদি দু'দিন গিয়ে থাক্‌তে বলে, নীলিমা মাথা নেড়ে বলে, "বাড়িতে একদিন না থাক্‌লে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যাবে। তা ছাড়া শাশুড়ির রান্না কে রাঁধ্‌বে? একে বুড়ো মানুষ, তায় অসুস্থ, একবেলা উনুনের ধারে এলে তাঁকে আর বাঁচ্‌তে হবে না।"

বউটির কলেজের দু'চারজন প্রাক্তন সহপাঠিনী কালেভদ্রে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসে ওর চালচলন দেখে অবাক্ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কেউ অধ্যাপকের কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কেউ ডাক্তারের স্ত্রী, কেউ বা কোন মেয়ে-স্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেস্ বা মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা। নীলিমার স্বামীর চেয়ে তাদের কারুরই সংসারে আয় বেশী নয়। অথচ তাদের কেউ কেউ সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সে সুর্মা-টানা চোখে শিশুসুলভ বিস্ময়ের জৌলুস জাগিয়ে, ভ্যানিটি-ব্যাগ নাড়াতে নাড়াতে বলে, "নীলু! বড়লোকের মেয়ে—বড় লোকের বউ, একি দশা ভাই তোমার? What a change! রান্নাঘরেই দেখ্‌ছি তোমার জীবনযৌবনমন সমস্ত সমর্পণ করেছ। একি বেশ? হাতে দু'গাছা কি জড়োয়ার চুড়িও পর্‌তে পার না! এত ঝি চাকর-দরোয়ান—তার মাঝখানেও তোমার হাতে তেল, কাপড়ে হলুদ, কপালে ঘাম! A sad sight, a sorry plight!" নীলিমা ঠোঁটের কোণে বিনীত গর্বের হাসি ফুটিয়ে বলে, "এই আমার স্বর্গ!"....

এমন মর্ত্যের স্বর্গ তোমরা কে কে সৃষ্টি করেছ—তা জান্‌তে আমার সাধ হয়। তোমাদের মধ্যে কে কে বিয়ের পর এক বছরের মধ্যেই স্বামিশ্বশুরের পাকশালা থেকে পাচক-বিতাড়ন নাট্যে প্রধান-নায়িকার

ভূমিকায় অভিনয় করেছ জানতে পারলে আমি প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন দিই। একটা পাচক তাড়ানো মানে সংসারের কোষাগারে সাক্ষাৎভাবে মাসে অন্ততপক্ষে ৫০৲ বাঁচানো। বছরে ৬০০৲। দশ বছরে সুদে-আসলে কমসে কম ৭০০০৲ ব্যাঙ্কে জমতে পারে।...একি কম কথা!

আগে আমাদের দেশে একটা প্রবচন প্রচলিত ছিল—"হাঁড়ি, হেন্‌সেল্, রান্না; তিন নিয়ে ঘরকন্না।" আমি এটিকে একটু অদলবদল করে' বলি—"স্বামী, শিশুসেবা, রান্না; তিন নিয়ে ঘরকন্না।" এই তিনটের কোনটাকেই বাদ দেওয়া বা খাটো করা চলে না। ভাগ্যদোষে যাদের গর্ভে শিশু এল না বা হয়ে বাঁচল না, তাদের শিশুর প্রতি প্রদেয় স্নেহ, সামর্থ্য ও সময়টাকে স্বামী আর রান্নাঘরের প্রতি বরং বেশী করে' সঞ্চালিত করে' দিতে হবে। নতুবা অতি নিকটাত্মীয়ের কোন শিশুকে আপন সন্তানবৎ পালন করতে হবে। বিয়ের পর অন্তত এক বছর কাল মেয়েরা সন্তানের মুখ দেখে না; কেউ কেউ তার আরো পরে দেখে, কেউ কেউ সারা জীবনকালের মধ্যে দেখে না। সুতরাং তাকে সর্বপ্রথমে তাদের স্বামী, তারপরে নিজেদের রন্ধনশালাকে চিন্‌তে হয়। স্বামীসেবা সম্বন্ধে তোমাদের অনেক কিছু উপদেশ আগে দিইছি, শিশুসেবা সম্বন্ধে পরে কিছু বলব। রন্ধনশালা সম্বন্ধে আর একদিন তোমাদের আরো কিছু শোনাতে চাই।

অষ্টম আলাপন

খাদ্যতত্ত্ব ও পাকশালা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পরিণয়মঙ্গল" নামক হাস্যরসাত্মক কবিতায় নববধূকে যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যমণি করে' রেখেছেন নিম্নলিখিত দু'টি অনুচ্ছেদকে,—

'পাক-প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন।
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন দেখায় না লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

যদি কোন শুভদিনে ভর্তা না ভৎর্সে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দু'জনে শুধু বসিবে কি দু'তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো বৎসে।"...

আবার বলি মেয়েদের,—রূপযৌবনের মোহ পুরুষের দু'দিনে কাটে, কিন্তু গুণের মোহ চিরদিনের মধ্যে কাটে না। একটা কালো কুৎসিত মেয়ে রান্না দিয়ে—সেবা দিয়ে এমন করে তার স্বামীর মনোহরণ করতে পারে যে, অতি সুরূপা প্রগাঢ়যৌবনা বামা লীলাবিভ্রমের বিচিত্রিত ডানা মেলে তার কোলে শুয়ে পড়লেও স্বামী অচঞ্চল থাকে। ছলা-

কলাবতী সুরসিকা আধুনিকা যখন রসকষহীন রুচিবিকারী রন্ধিত দ্রব্য স্বামীর পাতে অপটুহস্তে পরিবেশন করে, তখন স্বামী তার শহুরে সভ্যতার সংস্পর্শবর্জিতা মাতা, পিসিমা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী অথবা কোনো পল্লিবাসিনী শুচিস্মিতা বন্ধুপত্নীর সুস্বাদু রন্ধনের সঙ্গে তার তুলনা না করে' পারে না; সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন্দ ভাগ্যকে বার বার ধিক্কার দেয়।

কোন কোন স্বামীকে স্পষ্টই স্ত্রীর সামনে অনুযোগ করতে শুনি—"নাঃ মীরা, মা'র মতো শুক্ত আর কাঁচা ইলিশের ঝোল তুমি কিছুতেই রান্‌তে পারো না," "যাই বল লাবু, কুটু দি'র মতো মোচার ঘণ্ট রান্‌তে তোমার এখনো অনেক দেরি!" "পিসিমা ছেলেবেলায় কী চমৎকার গোকুল পিঠে করতেন্—তোমার পুডিং তার কাছে কোথায় লাগে!"....ইত্যাদি। যে সব স্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে' পাচকের পরিবর্তে নিজেরা রান্নাঘরের অধিনায়িকা হয় এবং রন্ধনে 'অনার্স' নেবার জন্যে প্রাণপণ প্রযত্ন করে, তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং বলা উচিত—"বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। তবে একটু নুন কম বা ঝাল বেশী দিলে হয়তো আরো ভালো হ'ত!"....কখনই তাদের মুখের ওপর মা-মাসি-দিদিমা-পিসির রান্নার সঙ্গে তুলনায় তাদের রান্না অতি হেয় বলে' প্রতিপন্ন করতে যাওয়া সঙ্গত নয়।....স্বামীরা, হুসিয়ার!

আজকাল মেয়ে-বউদের রান্না

তোমাদের সত্যি বলছি, রন্ধন ব্যাপারে আজকালকার শহরপল্লীর গৃহস্থ ঘরের মেয়ে-বউরা আগের তুলনায় অনেকখানি হীনপ্রভ হয়ে পড়েছে। উপরন্তু এ বিষয়ে তারা যেমন উদাসীন, তেমনি ফাঁকিবাজ। সুস্বাদু ও বিচিত্র পদের রান্না তাদের হাত থেকে আজকাল ক্বচিৎ

বেরায়। রন্ধনের পুষ্টিকারিতা-গুণ সম্বন্ধেও তাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। রান্না ব্যাপারটাকে তারা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত গৌণ বলে' বিশ্বাস করে নিয়েছে। তার ফল কি হয়েছে জান? বাড়িতে পুরুষরা পেট ভরে' খেতে পায় না বা চায় না; পেট ভরে' খেতে পেলেও আগেকার মতো পুষ্টি পায় না। বাড়িতে মনের মতো খাদ্য খেতে পায় না বলে' তারা বাজারের খাবার হোটেলে প্রস্তুত নানারূপ মুখরোচক আহার্য খেয়ে পয়সা নষ্ট করে, স্বাস্থ্য নষ্ট করে। অবিশ্যি মেয়েদের গাফিলতি ও অশিক্ষা ছাড়াও এর আরো কতকগুলো বাহ্য কারণ আছে; যেমন—আহার্যপরিচ্ছদাদির পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ মূল্যবৃদ্ধি, কন্ট্রোল, কালাবাজারের আধিপত্য, খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের আধিক্য, বাড়িভাড়া-বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ব্যাপক অব্যবস্থিতি ও উদ্বেগাশঙ্কা....ইত্যাদি।

যাক্, এইবার খাদ্যের পুষ্টিকারিতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তোমাদের গুটি কয়েক কথা বলব। এই সাধারণ দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে অল্প মূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে কি করে' বেশী মূল্যের পুষ্টি পাওয়া যায়, সেটা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারের গৃহিণীদের ভালো করে' জেনে রাখা উচিত। তোমাদের মধ্যে যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছ বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছ এবং যাদের গৃহস্থালি-বিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অধীতব্য বিষয় ছিল, তারা এ সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছিলে ও শিখেছিলে; কিন্তু অনেকেই বোধহয় সেগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখোনি। রাখ্‌লে আজ স্বামিশ্বশুরের সংসারে সেগুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারতে। আমি দু'চারটে খুব দরকারী কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিই। এ সম্বন্ধে ডাক্তার ও বাইও-কেমিস্ট্ স্বামীরা ছাড়া অন্য স্বামীরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী অজ্ঞ; বরং তোমরা একটু জ্ঞান দিয়ো তাদের।

খাদ্যের পাঁচ জাতীয় উপাদান

তোমাদের মনে আছে বোধ হয় যে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে জল ছাড়া আর পাঁচ জাতীয় উপাদান দেখ্‌তে পেয়েছেন; যেমন—আমিষ (protein), স্নেহ (fat), শ্বেতসার-শর্করা, লবণ ও খাদ্যপ্রাণ (vitamin)। প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই যে ঐ পাঁচ জাতীয় উপাদান থাকবে—এমন কোন কথা নেই। একটা খাদ্যের মধ্যে একটা বা দুটো উপাদান বেশী থাক্‌তে—অন্য একটা বা দুটো বা তিনটে উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় খুব কম পরিমাণে থাকতে পারে। ধর, মাছ অথবা মাংসের মধ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান খুব বেশী পরিমাণে থাকে আর স্নেহ (চর্বি বা তৈল) জাতীয় উপাদান ও লবণ জাতীয় উপাদান খুব কম পরিমাণে থাকে; আবার ওতে শ্বেতসার-শর্করা জাতীয় উপাদান মোটেই থাকে না। ইলিশ মাছের তেলে স্নেহজাতীয় উপাদান এবং খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে; লবণ উপাদান যৎসামান্য আছে, কিন্তু আমিষ উপাদান ও শ্বেতসার-শর্করা মোটে নেই। তাহলে মাছমাংসকে আমিষপ্রধান খাদ্য বল্‌তে হবে এবং ইলিস মাছের তেলকে স্নেহপ্রধান ও খাদ্যপ্রাণবহুল খাদ্য বলতে হবে।

শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্যে অল্পবিস্তর পাঁচ জাতীয় উপাদান শরীরের এক-এক রকমের উপকার সাধন করে। তবে প্রত্যেক রকমের উপাদানই শরীরের বিশেষ বিশেষ উপকার সাধন করার পর অতি মৃদু মন্দ গতিতে পুড়্‌তে থাকে। তার ফলে শরীরে তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই তাপের এক-পঞ্চমাংশ কর্মশক্তিতে (energy) রূপান্তরিত হয়। এক কথায়, সকল জাতীয় খাদ্য আমাদের পেশী-গুলিকে, ভিতরের যন্ত্রগুলিকে, নার্ভগুলিকে কিছু-না-কিছু পরিমাণে

পুষ্ট ও কর্মক্ষম রাখে, তাপ ও কর্মশক্তি যোগায়। এই কর্মশক্তিকে আমরা বিভিন্ন পেশায় ও সখে—পেশীর কাজে কিংবা মস্তিষ্কের কাজে লাগাই।

তাপাংক বা ক্যালরি

সব রকমের খাদ্যের তাপ-উৎপাদনের ক্ষমতা সমান নয়। সব চেয়ে বেশী তাপ-জনন করতে পারে স্নেহজাতীয় খাদ্যসমূহ। কোন খাদ্য শরীরের মধ্যে পরিপাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, তার নিম্নতম এক-এক অংশকে (unit) ইংরাজীতে calorie, বাংলায় তাপাংক বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ সবল ব্যক্তির প্রত্যহ ৩০০০ তাপাংক মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার বাঙালীর ভাগ্যে ২২০০ থেকে ২০০০ তাপাংক মূল্যের বেশী খাদ্য জোটে না। তার মানে, আজকাল আমরা অনেকেই যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছি না। আমাদের দেখ্‌তে হবে—সব রকমের উপাদান-মিশ্রিত খাদ্য যথোপযুক্ত পরিমাণে যাতে আমাদের পেটে যায়। গিন্নিকে অন্নপূর্ণার ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় কর্‌তে হলে—শুধু রন্ধনকলায় নয়, খাদ্যবিজ্ঞানেও তাঁকে পারদর্শী হতে হবে।

কোন্ খাদ্যে কি উপাদান বেশী আছে

খাদ্য-বিজ্ঞানের প্রথম কথা—আমাদের নিত্যব্যবহার্য প্রধান খাদ্যগুলিতে কি কি উপাদান বেশী-কম-মাঝারি পরিমাণে আছে—তা নিরূপণ করা ও বয়সের অনুপাতে—শরীরের ওজনের অনুপাতে—কর্মশক্তি-প্রয়োগের অনুপাতে কাকে কি ধরণের খাদ্য কতটা পরিমাণে দিতে হবে তা জেনে রাখা। পুনরনুশীলনের সুবিধার

জন্যে তোমাদের আবার এ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য শুনিয়ে দিচ্ছি নিজেরা মুখস্থ করে' রাখ, বাড়ির ছেলেমেয়েদের দিয়ে মুখস্থ করিয়ো।

সব রকমের মাছ মাংস ডিম্ব আর ছানা,—
আমিষপ্রধান খাদ্য এরা থাকে যেন জানা।
হরেক রকম দালের মাঝেও প্রচুর আমিষ আছে ;
এই জিনিসটি কিছু পাবে শুঁটি-শিমের কাছে।
প্রচুর স্নেহ পোরা ঘিয়ে, চর্বি, মাখন, তেলে ;
দুগ্ধে কিছু আর বাদামে, কলায়, নারিকেলে।
শ্বেতসারের মাত্রা বেশী যব গমে আর চালে,
আলু, কচু, ভুট্টা, কলায়, ইচড়, ডাঁটা, দালে।
মিছরি, চিনি, গুড়, মধু আর মিষ্টি যত ফলে,
শর্করারই পুরা প্রতাপ বিজ্ঞানীরা বলে।
হরেক রকম লবণ আছে রাঁধার লবণ ছাড়া ;
হজম চলে, রক্ত-অস্থি তৈরি এদের দ্বারা।
দালে চালে দুধে ডিমে তরকারি আর শাকে,
মাংসে মাছে নানাপ্রকার লবণ মিশাল্ থাকে।
পশু-যকৃৎ, ডিমের কুসুম কিংবা মাছের তেলে,
টাট্‌কা ফলে, শাক-সব্জিতে খাদ্যপ্রাণটা মেলে ;
অঙ্কুরিত মটর-ছোলায়, চালের পাৎলা ছালে,
মাখন দুধেও আছে ওটা ; নষ্ট বেশী জ্বালে।

আটা, ময়দা, চাল, ভুট্টা, বাজ্‌রা, জওয়ার প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য। এইগুলি হ'ল পৃথিবীর শতকরা ৯৯ ভাগ লোকের প্রধান

খাদ্য বা staple food।....সবচেয়ে বেশী চাই শ্বেতসার উপাদান ; তার চেয়ে কম চাই আমিষ, তার চেয়ে কম শর্করা, তার চেয়ে কম চাই স্নেহ।

বয়স হিসেবে খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য করা চাই। চার বছরের ছেলেকে যদি দু'খানা লুচি দাও, চোদ্দো বছরের ছেলেকে দেবে তিনখানা, কর্তাকে দেবে চারখানা।

বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাল। কিন্তু চালের চেয়েও আটার পুষ্টিকারিতা-গুণ কিছু বেশী। সেইজন্যে আমি গরম কাল ছাড়া অন্য ঋতুতে বাঙালী জাতটাকে একবেলা রুটি খাওয়াবার ঘোর পক্ষপাতী। আবার, লুচির চেয়ে পরোটার, পরোটার চেয়ে ঘি-মাখানো রুটির পুষ্টিকারিতা-গুণ বেশী।

খাদ্যপ্রাণের গুণ

ঢেঁকি-ছাঁটা আমাজা বা অল্প-মাজা চালে এবং জাঁতা-ভাঙা লাল আটায় কিছু খাদ্যপ্রাণ থাকে, মিলে-মাজা চালে ও সাদা ময়দায় খাদ্যপ্রাণ একেবারে থাকে না। বিস্কুট, চা, মুড়ি, চিনি, চকোলেট্, লজেঞ্জেস প্রভৃতির মধ্যে কোন খাদ্যপ্রাণ নেই। আগুনে বেশীক্ষণ জাল দিলে এক শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন খাদ্যপ্রাণ-যুক্ত খাদ্য জলের ভেতর বেশীক্ষণ নাড়া-চাড়া করলে কিংবা আগুনের তাপ পেলেই তাদের খাদ্যপ্রাণটুকুকে জলের ভেতর মিশিয়ে দেয়। চালে যেটুকু খাদ্যপ্রাণ থাকে, সেটুকু ফেনের সঙ্গে মিশে যায় ; ফেন গেলে ফেল্‌লে খাদ্যপ্রাণটুকু সব নষ্ট হয়ে যায়। নানা শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের নানারকমের গুণ। এক কথায়, এরা আমাদের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, অস্থিক্ষীণতা (rickets), বেরিবেরি, শোথ, শ্বাসকষ্ট, উৎসাহশূন্যতা, হৃদ্‌দৌর্বল্য প্রভৃতি নিবারণ করে।

ছেলে-বুড়ো সকলেরই প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ খাওয়া উচিত। কমলালেবু, বাঁধা কফি, পালম্ শাক আর বিলাতী বেগুন—এই চারটি জিনিস প্রধান কয়টি শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই কথাটি চিরকাল মনে রেখো। সদ্যরোগমুক্ত, রুগ্‌ণ বা দুর্বল-হৃদয় লোককে একটা মিষ্টি কমলালেবু ও দুটো বিলাতী বেগুনের রস কিছুদিন খাইয়ে দেখো—অদ্ভুত রকমের উন্নতি হবে। যদি সহ্য করতে পারে, তা'হলে আস্তে আস্তে এর পরিমাণ দ্বিগুণ করে' দিতে পারো। এক বছরের ও তার উর্ধ্ববয়স্ক কচি ছেলেদের দিনে দুই ছোট চা-চামচ ভর্তি করে' ২বার খাইয়ে দিয়ো।...আস্ত মুগ, ছোলা ও মটর অল্পজলে ভিজিয়ে রাখ্‌লে একদিন বা দেড়দিন বাদে তাদের মাথা থেকে সাদা অঙ্কুর (বা কল্) বেরোয়। এই সময় এরা খাদ্যপ্রাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়। বারো তেরো বছর বয়স থেকে বাড়ন্ত ছেলেরা রোজ সকালে অঙ্কুরিত ভিজে ছোলা এক-মুঠো করে', ঐ সঙ্গে একটু নুন, এক টুক্‌রো আদা ও যৎসামান্য গুড় খেলে, তাদের শরীরের অদ্ভুত উন্নতি হয়।

দুধ ও ডিম

আর একটা কথা মনে রেখো। পুষ্টিকারিতা-গুণে দুধ সকল রকম খাদ্যের রাজা। একে 'সম্পূর্ণ খাদ্য' বলা হয়, কারণ এর মধ্যে সব রকমের উপাদানই উপযুক্ত মাত্রায় আছে। তারপরই হ'ল ডিমের স্থান। হাঁস ও মুরগির ডিমে শুধু সারবস্তুর ওজনের তফাৎ, গুণের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। হাঁসের ডিম বেশী দিন ধ'রে খেলে বাত হয়—কর্তাদের এই ভুল ধারণাটা তোমরা তর্ক করে' ভেঙে দিয়ো। দুধ অন্তত পনেরো মিনিট ফুটিয়ে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করা অথবা ভাত বা রুটি দিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে

হিতকর। দুধের সর অনেকখানি পুষ্টিকর বটে; কিন্তু ক্ষীর, রাবড়ি, মালাই হজম করাও যেমন কষ্টসাধ্য, ওদের পুষ্টিকারিতা-গুণও তেমনি দুধের তুলনায় অনেক কম।

গ্রীষ্মকালে রোজ ডিমটা না খাওয়াই ভালো। শীতকালে ছোট ছেলেরা রোজ দু'বেলায় একটা ও বয়স্করা দুটো স্বচ্ছন্দে খেতে পারে। ডিম-ভাজা বা ডিমের তরকারির চেয়ে ডিম-সিদ্ধ বেশী উপকারী; আধ-সিদ্ধ ডিম বা ডিমের 'পোচ্' তার চেয়েও বেশী উপকারী। ডিমের পোচ্ কি করে' তৈরি করে জান তো? একটা ডিমের মাথার দিকটা ভেঙে তার ভেতরকার শাদা ও হল্‌দে অংশ জোরে-জোরে ঘুলিয়ে দিয়ে, খুব ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে সেটা ঢেলে দিতে হয়। মিনিট খানেকের মধ্যেই সেটা আধা-নরম আধা-শক্ত হয়ে জমে যায়। তখন সেটা জল থেকে সাবধানে তুলে ফেলে ডিশে রাখ্‌তে হয়। এরই নাম পোচ্। এতে একটু নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে শুধু খেতে পারা যায়, অথবা টোস্ট্-করা পাউরুটির ফালিতে মাখিয়ে খেতে পারা যায়। খুব পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য।

আহারে বৈচিত্র্য চাই

আর একটি ছোট সংসারের রান্নাখাওয়ার খবর শোনাই তোমাদের।...সুবিমলবাবুর বাড়ি। ভদ্রলোক মাসে বোধহয় শ' দুই টাকা রোজগার করেন। ছেলেমেয়ে বউ ভাই চাকর নিয়ে ওরা ছ'জন। সকালের জলখাবার হ'ল ছেলেমেয়েদের জন্যে দু'পয়সার সস্তার বিস্কুট আর এক কাপ চা। বড়দের জন্যে দু'পয়সার কচুরি, দু'পয়সার জিলিপি আর এক কাপ চা। গিন্নি একটু বেলায় ওঠেন। চাকর সকালে উঠে বাসনকোশন মেজে উনুনে আগুন দেয়। উনুন্ ধর্‌লে দাল চড়িয়ে দেয়। গিন্নি যখন স্নান সেরে রান্নাঘরে প্রবেশ

করেন, তখন কোনদিন ভৃত্যের হাতে দাল রান্না হয়ে গেছে—ভাত চড়েছে; নতুবা দাল সাঁতলাবার সময় হয়েছে।

এদের বাড়িতে বারোমাস তিরিশ দিনই মুসুর দাল রান্না হয়; মাছ আসে নিত্য ছোট রুইয়ের বাচ্ছা বা বাটা-পোনা। মাছ দিয়ে প্রত্যহ তৈরি হয় একটা ঝাল-চচ্চড়ি। যতদিন বাজারে বেগুন পাওয়া যায়, ততদিন প্রত্যহ বেগুন ভাজা, নতুবা আলু-ভাতে। কোনদিন তাও হয় না। আর একটা তরকারি হয়—সেটা হ'ল শাকপাতা ডাঁটা বেগুন কুমড়ো আলু প্রভৃতি দিয়ে একটা ঘ্যাঁট্। মাছ-দাল-তরকারি-ভাজার প্রকৃতি ও সংখ্যার পরিবর্তন হয় যদি কালে-ভদ্রে কোন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়।

বউটির হাবভাব দেখে মনে হয় যে, সে বাপের বাড়ি কখনো রান্না শেখেনি; যে ছ'বছর শ্বাশুড়ি-ননদ নিয়ে ঘর করেছে, সে কয় বছর মাঝে মাঝে হাতা-বেড়ি ধরলেও রন্ধন-কৌশলটা ধরতে পারেনি।....দালে নিত্য পেঁয়াজরসুনের ফোঁড়ন পড়ে; ঝোলে-ঝালে-চচ্চড়িতে সমপরিমাণে সরষে-বাটা, লঙ্কা-বাটা, হলুদ-বাটা ও পিঁয়াজ-রসুন-বাটা মিশ্রিত হয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম, ভাত ছাড়া অন্য সব তরকারিব্যঞ্জন সকাল বেলাই রান্না হয়। কর্তা আফিসে ও ছেলেটি স্কুলে বেরিয়ে গেলে, গিন্নি কণ্ট্রোলের আটা পেলে তাই দিয়ে বিকেলের জলখাবার হিসেবে রুটি তৈরি করে, নচেৎ ময়দা পেলে দালদা দিয়ে নিমকি ভাজে। কর্তা ও ছেলেমেয়েরা নির্বিবাদে নিশ্চিন্তে এই একঘেয়ে খোরাক্ খেয়ে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়ে মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে, আবার সেরে ওঠে; বয়সের অনুপাতে বাড়ে না, চোখ জ্যোতিহীন।...

এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে খোরাক্ রসনা সহ্য করে বলে' তোমরা মনে কোরো না শরীর তা থেকে যথোচিত পুষ্টি সংগ্রহ করে। পেটেরও

একটা রুচিবোধ আছে; সেও মাঝে মাঝে খাদ্যের রকমফের চায়। এমন কি খুব উচ্চাঙ্গের ও প্রভূত পুষ্টিমূল্যের একই রকমের খাদ্য কিছুদিন ধরে' খেতে খেতে শরীরতন্ত্র আর তা বরদাস্ত করতে চায় না—পারে না। মাঝে মাঝে শরীরে ছোটখাটো অসুখ দেখা দেয়, নইলে হঠাৎ একটা দীর্ঘস্থায়ী বা মারাত্মক রকমের শক্ত অসুখ উপস্থিত হতে পারে। তাই সমস্ত নতুন-পুরোনো গিন্নিদের বলি—খাদ্যদ্রব্যের রকমফের করতে।

কোন কোন বাড়িতে দেখি সকালে মাখন-মাখানো পাউরুটির ফালি ও বিকেলে রুটি বা লুচি আর আলু-চচ্চড়ি মাসের পর মাস চলেছে, তার আর অদলবদল নেই। পূর্ববঙ্গে মুসুর দালের ও পশ্চিমবঙ্গে বিউলি দালের ভীষণ প্রচলন ও লোকপ্রিয়তা। তাই বলে' কি রোজ খেতে হবে? এক-একদিন কাঁচা মুগ, ভাজা মুগ, ছোলা কিংবা মটর চল্‌তে পারে তো! কল্‌কাতার ভেতর ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রদের মধ্যে খ্যাসারি ও অড়হর দালের আদর বেশী, কারণ এগুলো সব দালের মধ্যে সস্তা। পুষ্টি-গুণে সমস্ত রকমের দালই উনিশ-বিশ, তবু মুখবদল চাই। মাছ-তরকারি, ভাজাভুজি ও জলখাবার সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

অনেক বাড়ির গিন্নিরা ভেবেই পায় না কি করে' তারা জলখাবারে ও অন্নব্যঞ্জনে ঘন ঘন বৈচিত্র্য-বিধান করতে পারে। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে যখন হাটবাটমাঠঘাট জলে ডুবে যায়, দিনের পর দিন ঘর থেকে বেরুনো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, তখন অবশ্য প্রায় বাড়িতে হয় খিচুড়ি নয় দাল-ভাত, শাকপাতার ঝোল বা কুমড়োর ঘ্যাঁট এক-নাগাড় খেয়ে যেতে হয়—উপায় নেই। প্রায় সব ঋতুতেই পল্লীর অনেক বাড়িতে সকালের জলখাবার হিসাবে সফেন্ ভাত ও আলু, কুমড়ো, বেগুন বা কাঁটালবিচি-ভাতে; অথবা বাসিভাত বা

পান্তাভাত—সঙ্গে কাশুন্দি, তেঁতুল বা লঙ্কার আচার বা লঙ্কা-পোড়া; নতুবা মুড়ি বা চিঁড়ে; অথবা সুলভ কোন ফলমূল।

বড় বড় শহরে বারোমাসই রকমারি তরি-তরকারি পাওয়া যায়, ঋতুহিসেবে দাম অবশ্য বাড়ে-কমে। শহরবাসী একটা মাঝা-মাঝি অবস্থার গৃহস্থ-সংসারে কিভাবে প্রতিনিয়ত জলযোগের ও প্রধানাহারের রকমফের করা যেতে পারে, তার একটা খুব সাধারণ ধরণের এক সপ্তাহের নমুনা আমি বলে' দিচ্ছি। সব বাড়িতে এটাকে যে যথাযথ অনুসরণ করে চলতে হবে—তা আমি বলি না; এর থেকে একটা ধারণা বা হদিশ নিতে বলি।

—জলখাবার—

সকালের	বিকেলের
সোম—মাখন-মাখানো পাউ-রুটির ফালি বা পোচ্।	এক বা একাধিক প্রকার ফল অথবা রুটি-তরকারি।
মঙ্গল—বিস্কুট বা চিঁড়ে-ভাজা বা পাঁপরভাজা বা ওম্‌লেট্।	এক বা একাধিক প্রকার ফল অথবা রুটি-তরকারি।
বুধ—মাখন-মাখানো পাউ-রুটির ফালি বা পোচ্।	রবিবার সকালের অনুরূপ।
বৃহস্পতি—মুড়ি ও নারিকেল-কোরা, মুড়ি ও কড়াইশুঁটি-সিদ্ধ বা ছোলাসিদ্ধ বা ছোলা ভাজা বা চীনাবাদাম ভাজা; অথবা লবণ ও গুঁড়া মশলা-মাখানো কড়াই-শুঁটি, আলু, ফুল কফি প্রঃ সিদ্ধ।	এক বা একাধিক প্রকার ফল অথবা রুটি-তরকারি।

সকালের	বিকালের
শুক্র—মাখন-মাখানো পাউ-রুটির ফালি বা পোচ্।	এক বা একাধিক প্রকার ফল অথবা রুটি-তরকারি।
শনি—বাড়ি-তৈরি কোন মিষ্টান্ন, বা রুটি ও চর্চড়ি।	চিড়া, দই, কলা বা আম, কাঁটাল; অথবা বৃহস্পতিবার সকালের অনুরূপ।
রবি—বাড়ি-তৈরি কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিম্‌কি, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, বেগুনি, দালের বড়া, পেঁয়াজ-বড়া, বা অন্যবিধ খাবার।	পায়েস, পিঠে বা গৃহপ্রস্তুত অন্য কোনরূপ মিষ্টান্ন।

—প্রধান আহার—

দুপুরের	রাত্রির
সোম—মুসুর দাল; বড়িভাজা বা কুমড়ো-ভাজা; ডাঁটা-চর্চড়ি; রুই বা চিতলমাছের ঝোল।	ভাজার বদলে ভাতেপোড়া, ঝোলের বদলে কালিয়া কিংবা ডাল্না।
মঙ্গল—উচ্ছে-ভাতে বা ভাজা বা চচ্চড়ি; কাঁচা বা ভাজা মুগের দাল; আলু ভাজা বা পটল-ভাজা বা বেগুন-ভাজা; শাকের ঝোল; ও মাছের ঝাল।	ভাজার বদলে আলু-পিঁয়াজ বা আলু-পটল বা ঢ্যাঁড়স-আলু বা আলু-কুমড়োর চর্চড়ি বা ছোকা। [এবেলা মাছের ঝোল করতে পার।]

দুপুরের	রাত্রির
বুধ—থোড়্, মোচা, ইচড়্, বা কফির তরকারি; মুসুর দাল; আলু-ভাতে বা কচি কুমড়ো ভাতে বা বেগুন-ভাজা; কই বা সিংহি বা মাগুর বা ভেটকি বা চিংড়ি মাছের ঝোল অথবা কই মাছের তেল-ঝাল।	ভাতেপোড়ার বদলে ভাজা অথবা ভাজার বদলে ভাতেপোড়া; ঝোলের বদলে ঝাল; ঝালের বদলে ঝোল।
বৃহস্পতি—শুক্তুনি অথবা তিতোর ঝোল অথবা বড়ি-বড়া-ডাঁটা-কচিকুমড়ো প্রভৃতি দিয়ে নিরামিষ ঝোল, নতুবা কচুমুখি-বেগুনের তরকারি; পাতে একটু ঘি; আলু-ভাতে বা কচু-ভাতে বা দাল ভাতে; ডিমের ডালনা বা কালিয়া। [দাল রাঁধা হবে না।]	[রাত্রিতে, তিতো-ঝোল বা শুক্তুনি অথবা ঘি খাওয়া উচিত নয়। নিরামিষ ঝোল খাওয়া চল্‌বে।] মঙ্গলবার রাত্রির মতো একটা চচ্চড়ি নতুন করে' রান্‌তে পারো।
শুক্র—মোচার ঘণ্ট বা কফির ডাল্‌না বা ডুমুরের ডালনা বা কফির চর্চড়ি বা পটল চচ্চড়ি বা কুমড়োর ডাল্‌না; মুগ বা মটর বা বিউলির দাল; কই, রুই, সিংহি-মাগুর ছাড়া যে-কোন মাছের ঝোল। [আজকে ভাজা বা ভাতে থাক্‌বে না।]	দুপুরের মতো। বেগুন-পোড়া অতিরিক্ত করা চলে। বিউলির দালের সঙ্গে পোস্ত-চচ্চড়িও লাগে ভালো,—বেগুন-পোড়ার বদলে মাঝে মাঝে রান্‌তে পার।

দুপুরের	রাত্রির
শনি—মুসুর বা অড়হর দাল বা কাঁচা মুগ বা ভাজা মুগের দাল; বড়ি-ভাজা, আলু-ভাজা, বেগুন-ভাজা, ঢ্যাঁড়স-ভাজা, পলতার বড়া-ভাজা, কুমড়োর ফুল-ভাজা, ফুলকপি ভাজা, নারকেলের বড়া-ভাজা, নারকেল-ভাজা, পটল-ভাজা বা কুমড়ো-ভাজা (যে-কোন একটা কিংবা দুটো); পার্শে, ছোট ট্যাংরা, মৌরলা, খল্‌সে, খয়রা, পাব্‌দা, চাঁদা, ভ্যাদা (রয়না), পুঁটি প্রভৃতি মাছের মরিচ-কাটা পাৎলা ঝোল অথবা ঝাল-চচ্চড়ি।	এবেলা ভাজা নয়, কোন ভাতে। নিরামিষ; একটা আলু-পটলের বা মিঠে-কুমড়োর ডাল্‌না রাঁধতে পার।
রবি—মটর বা ছোলার দাল (ওর মধ্যে আলু, নারকেল, বিলিতি বেগুন, কুমড়োর ডগা, ডাঁটা প্রভৃতি দিতে পারো); কুমড়ো-ভাতে, আলু-ভাতে, উচ্ছে ভাতে, ঢ্যাঁড়স-ভাতে বা পটল-ভাতে; অথবা শুক্তুনি, তিতোর ঝোল বা ঝালের ঝোল; মাংস। [যেখানে মাংস সুপ্রাপ্য বা সুলভ নয়, সেখানে ডিম অথবা একটু ভালো মাছ কিনে তার কালিয়া রেঁধে খাওয়ানো চলে। পার তো এই দিন একটু চাট্‌নি রেঁধো।]	[দু'বেলা যদি ভাত খাওয়া অভ্যাস থাকে, তাহলে সঙ্গতি অনুযায়ী এই দিন রাত্রিতে রুটি, লুচি বা পরোটা খাবে সবাই; নতুবা অন্যদিন যদি রুটিলুচি খাও তো ভাত খাবে। শীতকালে দু'-বেলাই মাংস খাওয়া যাবে। যাদের রবিবার নিরামিষ খাওয়া পারিবারিক প্রথা, তারা শনিবার রাত্রিতে মাংস রাঁধবে।]

খাদ্য সম্বন্ধে আরো বক্তব্য

ঋতু-হিসাবে ও স্থানীয় সুলভতা-হিসাবে উপরোক্ত তালিকার অদল-বদল করা স্বচ্ছন্দে চল্‌বে। মোটামুটি আমার বক্তব্য হ'ল এই যে, কোন অঞ্চলে ইলিশ মাছ সস্তা হ'ল বলে' রোজই ইলিশ কিনো না; সপ্তাহের মধ্যে একদিন মোটে মাছ কিনবে না, আর একদিন অন্য মাছ কিনবে। রোজই ইলিসের ঝোল কোরো না; একদিন রসা, একদিন পাতুড়ি, একদিন দই-ইলিস, একদিন ঝাল, একদিন কোর্মা রাঁধ্‌বে।

শীতকাল ছাড়া অন্যসময় একবেলা অম্বল, আর একবেলা পাতি বা কাগজি লেবু খাওয়ার অভ্যাস বাড়ির সকলের মধ্যে যেন বদ্ধমূল করে' দেওয়া হয়। কাঁচা তেঁতুল, পাকা তেঁতুল, কাঁচা আম, আমড়া, চাল্‌তা, জলপাই, আম্‌সি প্রভৃতি দিয়ে এক একরকমের অম্বল রাঁধা চলে। মাঝে মাঝে চাট্‌নি করা যায়। রৌদ্রপক্ক রকমারি আচার ও চাট্‌নি ও জেলি করতে শিখবে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সেগুলো বড় মুখরোচক।

যেদিন জলখাবার হিসাবে ওম্‌লেট্‌ বা পোচ্‌ তৈরি করবে, সেদিন জলখাবারের সঙ্গে কিছু 'স্যালাড্‌' দেবে। যেদিন মুসুর বা ছোলার দাল হবে, সেদিনও ভাতের পাতে কিছু স্যালাড্‌ পরিবেশন করবে। স্যালাডের প্রধান উপকরণ—লেটুস্‌, সেলারি, বিলিতি বেগুন, গাজর প্রভৃতি শীতকালেই জন্মায় এবং বড় বড় শহরের বাজারে খুঁজলে পাওয়া যায়। স্যালাডের আরো মাল-মশলা আছে এবং তৈরি করা এমন কিছু শক্ত নয়।

অবস্থাপন্ন ঘরে রোজই দুপুরে পাতে একটু খাঁটি ঘি খাবে। বসন্ত, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে একটু দই, নতুবা দুধ। ছেলেমেয়েদের শীতেবর্ষায় সর্দিকাশি হ'লে তবেই একটু চা দেবে, নইলে গরম দুধ। সকালে খেতে না চাইলে টিফিনের সময় পাঠিয়ে দিতে পার। বাচ্চা-

বেলা থেকে চায়ের নেশাটা ধরিয়ো না। দোহাই!....হেমন্তশীতে মঝে মাঝে চপ্‌, কাট্‌লেট্‌, মাছের ফ্রাই করতে পারো। বারোমাসই মাঝে মাঝে পুডিং, কেক্‌, ছানার পায়েস, ছানার ডাল্‌না প্রভৃতি বানাতে পারো।

খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

তোমাদের আর একটা ভুল ভেঙে দিতে চাই। অনেকের মতো তোমাদের সকলেরই বোধহয় ধারণা যে, দুধ-ঘি-মাখন-মাছ-মাংস-ডিম প্রচুর না খেলে অথবা অল্প পরিমাণে রোজ না খেলে বুঝি কারো স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না—কারো শরীর ভালো থাকে না। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। মাছ যদি রোজ না পাওয়া যায় অথবা কেনার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আপ্‌শোষের কোন কারণ নেই। ছানা, শিম, মটরশুঁটি, বর্বটি ও কড়াইশুঁটি, দালের মধ্যে যথেষ্ট আমিষ উপাদান থাকে। এইগুলি একটু বেশী পরিমাণে খেলে মাছ-মাংস-ডিমের অভাব অনেকখানি মিট্‌তে পারে। গোল আলু, মিঠে আলু ও কাঁটালবীজের মধ্যে সামান্য মাত্রায় আমিষ উপাদান থাকে।

ঘি-মাখন যারা রোজ ব্যবহার করতে পারে না, তারা খাঁটি সরষের বা নারকেল-তেল থেকে অনেকখানি স্নেহ উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। নারকেল, পাকা কলা, চীনাবাদাম, কাগজীবাদাম প্রভৃতির মধ্যে থেকে ঘি-মাখনের পুষ্টি সংগ্রহ করা যায়। গোল আলু, কাঁটালবীজ ও মিঠা আলু অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক। মাঝে মাঝে কাঠখোলায় চীনাবাদাম ভেজে খাওয়া যেমন মুখরোচক তেমনি বলপ্রদ। কাঁচা পেঁপে, ডুমুর, মোচা প্রভৃতি বড় উপকারী, মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে ভুলো না। ঝিঙে, পটোল, লাউ, কুমড়োর পুষ্টিগুণ খুব বেশী নেই জেনো।

মনে রেখো—ছ' ছটাক থেকে আধ সের পরিমাণ চাল বা আটা, যে-কোন একটা শাক, শুক্ত বা ভাতে-পোড়া, একটা নিরামিষ ঝোল বা দাল ও মাঝে মাঝে যে-কোন টাট্‌কা মাছের ঝোল খেয়ে একজন গরিব লোক হৃষ্টপুষ্ট থাক্‌তে পারে।....রোজ কিংবা প্রায়ই দুধ, ঘি বা মাখন ও কিছু টাট্‌কা ফলমূল খাওয়ার একটা বিশেষ সার্থকতা কি আছে জান? এরা মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা রাখে, ওর ক্ষমতা বাড়ায় এবং নানারকম কঠিন রোগের সংক্রামণ থেকে শরীরকে বাঁচায়।

রন্ধন সম্বন্ধে ও রন্ধনের বিভিন্ন পদ প্রস্তুতি সম্বন্ধে নতুন বউদের কাছে আমার অনেক কিছু বল্‌বার ছিল; কিন্তু এ যাত্রা আর বলা হবে না। বল্‌তে গেলে আমার আসল বক্তব্যগুলো অনেক পেছিয়ে পড়্‌বে, হয়তো অনেক কিছু তার বাদ দিতে হবে।....

আমি পুরুষ-মানুষ এবং লিখে খাই বলে' মনে কোরো না যে, এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিছক্ ভাবগত ও স্বল্প। আমি ইচ্ছে কর্লে তোমাদের এক-আধদিন পাঁচ তরকারি-ভাত রেঁধে খাওয়াতে পারি; আমার রান্না খেয়ে—তোমরা যে অঞ্চলেরই লোক ও যত খুঁৎখুতেই হও না কেন কেউ বিশেষ নিন্দে কর্‌তে পার্‌বে না। ভবিষ্যতে রকমারি রান্না সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল থাক্‌লে অনেক কিছু নতুন ও পুরোনো উপদেশ দিতে পার্‌ব। কারুর নতুন ধরণের কিছু রান্না জানা থাক্‌লে আমায় লিখে জানিয়ো, নতুবা নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ো। আমি পেটুক না হলেও 'খেটুক' বটে।

আয়ের অনুপাতে খাই-খরচ

তোমরা সংসারে এসে ভেবে দেখ্‌বে যে, স্বামী যা রোজগার করেন অথবা সংসার-খরচের জন্যে যা তোমার হাতে মাসে মাসে ফেলে

দেন, তার কতটা অংশ তোমরা নিছক্ খাই-খরচে লাগাতে পার। যারা বছরের ধান পায়, যাদের বাড়িতে একটি বা একাধিক গাভী আছে এবং যাদের ক্ষেতে রকমারি শাকসব্জি প্রচুর জন্মায়, তাদের কথা বল্‌ছি না। একটি শহরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবারে যদি সমস্ত খাদ্যসামগ্রী কিনে খেতে হয়, তাহ'লে পোষ্যের সংখ্যা বুঝে তাদের খোরাকের জন্যে আয়ের অর্ধেক থেকে তিন-চতুর্থাংশ খরচ কর্তে হয়। আজকালকার বাজারে প্রতি-পোষ্যের পিছনে খোরাকের জন্যে অন্ততপক্ষে পঁচিশ টাকা ব্যয় করার শক্তি যে পরিবারের আছে, তাকে আমি মধ্যবিত্ত বলি। যেখানে লোকে তার চেয়ে কম ব্যয় করতে পারে, সেখানে পরিবারটিকে দরিদ্র বলা ছাড়া আর উপায় নেই।

ধর, একটি ভদ্রলোক মাসে একশো টাকা রোজগার করে। তারা স্বামিস্ত্রী। তারা আহার্যের জন্যে প্রতিমাসে গড়ে ৫৫৲ টাকা ব্যয় করে। বারো টাকা ঘরভাড়ায় যায়; কাপড়-চোপড়-ধোপা-নাপিতে ১০৲ যায়; স্বামীর ট্রামভাড়া, টিফিন প্রভৃতিতে গোটা দশেক টাকা যায়। কষ্টে-সৃষ্টে দশ-এগার টাকা মাসে মাসে জমে। কিছুদিন বাদে তাদের একটি ছেলে হ'ল। ছেলেটির ছ'মাস বয়েস থেকে দুধের পেছনে দশ টাকা খরচ হ'তে লাগ্‌ল। দু'জনের খাওয়ার খরচ তারা ৫০৲য় নামাল। তবুও কোনমতে মাসে ৪৲।৫৲ জমে। এই অবস্থায়ও তারা মধ্যবিত্ত রইল। ছেলে যখন পাঁচ বছর হ'ল, তখন তার খোরাকের পেছনে ২০৲।২২৲ করে' খরচ হ'তে লাগ্‌ল। তখন ভদ্রলোক গরিবের পর্যায়ে নেমে গেলেন, কারণ তাঁরা প্রত্যেকে খোরাকের জন্যে ২০৲।২২৲ টাকার বেশী খরচ করতে পারে না। মাসের শেষে একটি পয়সাও জমে না।

সুগৃহিণীকে আয়ের অনুরোধে খাওয়ার খরচ কমাতে হয় খাদ্যের পুষ্টিকারিতা-গুণ অব্যাহত রাখার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে।—অবশ্য

খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমানো যায়, কিন্তু গুণ কিছুতেই কমানো চল্‌বে না। কর্তাগিন্নি দু'দলকেই বল্‌ছি—আয় কম্‌লে কিংবা পোষ্য বাড়্‌লে, বরং পোষাকআশাক ও বিলাস-ব্যসনের খরচ কম কোরো, খাই-খরচটা পারতপক্ষে কমিয়ো না। ঘোর দুর্দিনে হাওলাৎ করে' চালদাল কিনো, কিন্তু খবর্দার, জোড়া ইলিশ দই-মিষ্টি ন্যাংড়া আম কিনো না।

রান্নায় কতকগুলি বিধিনিষেধ

আসল রন্ধনক্রিয়া সম্বন্ধে মেয়েদের দু'চারটে উপদেশ দিয়ে আজকের বৈঠক শেষ করি। "জল, জ্বাল্, নুন, ঝাল—এক বেঠিকে রান্না ঘাল।"—এই সুবচনটা তোমাদের রান্না সুরু করার পর থেকে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত হৃদয়ে গেঁথে রাখ্‌তে বলি। জল, জ্বাল (অগ্নিতাপ), লবণ আর ঝাল—এই চারটি হ'ল রান্নার প্রধান অঙ্গ। এদের একটি অঙ্গ কমবেশী হয়ে গেলেই তরকারিব্যঞ্জন যায় নষ্ট হয়ে, একাধিক কমবেশী হয়ে গেলে তো কথা নেই। সুতরাং এই চার-অঙ্গের সামঞ্জস্য-বিধানই হ'ল ভালো রান্নার সাধনা।

ব্যক্তি-বিশেষে, পরিবার-বিশেষে, অঞ্চল-বিশেষে, দেশ-বিশেষে লোকে নুন-ঝাল কমবেশী খায়। একই পরিবারের একটি লোক নুন বেশী ঝাল কম অথবা নুন কম ঝাল বেশী খেতে অভ্যস্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাঁধুনিকে সমস্যায় পড়তে হয়। যে ঝাল বা নুন বেশী খায়, সে খেতে বসে' তরকারিব্যঞ্জনে একটু নুন মেখে এবং লঙ্কা ডলে' খেতে পারে। কিন্তু যে লোক নুন বা ঝাল কম খায়, তার পক্ষে আইন-মাফিক নুন-ঝাল-দেওয়া রান্না খাওয়া মুস্কিল। তিনি যদি বাড়ির কর্তা হ'ন, তাহলে গৃহিণীকে বাধ্য হয়ে নুনঝাল কম দিয়েই রান্না করতে হয়।

তোমাদের বারবার বলি, তরিতরকারিতে বেশী লঙ্কা দেওয়ার অভ্যাসটি আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়ো। পরিমিত মাত্রায় কাঁচা লঙ্কার ব্যবহার আমি অনুমোদন করি। শুক্‌নো লঙ্কা-বাটা যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে লঙ্কা বাট্‌বার আগে সেগুলোর ভেতর থেকে বিচিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ো। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে—বিশেষভাবে কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জনে লঙ্কাবাটা ও পিঁয়াজ-রসুন ব্যবহারের রীতি দেখ্‌তে পাই। হিন্দু মুসলমান সবাই দালে-ঝোলে-চর্চড়িতে আস্ত ও বাটা পিঁয়াজ-রসুন মেশায়। নিরামিষ তরকারিতে—একমাত্র আলু-চর্চড়িতে ছাড়া—পিঁয়াজ ব্যবহার করা অবিধেয়, রশুন তো নয়ই। মাংসে ও পাকা মাছের ডাল্‌না বা কালিয়ায়—মুসুর, ছোট মটর ও ছোলার দালে একটু-আধটু রসুন ফোড়ন্ চলতে পারে, কিন্তু ঝোলে-ঝালে নৈব নৈব চ। পিঁয়াজ-রসুন আমিষের অঙ্গ, নিরামিষের অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। তা-ও হেমন্ত ও শীতকালেই এদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

এ দুটি উপকরণ লঘুপাচ্য খাদ্যকেও গুরুপাক করে, যকৃৎকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করে, পাকাশয়ে দারুণ উত্তেজনা জন্মায়, পেটে বেদনাদায়ক বায়ুর সৃষ্টি করে ও প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা আনে। তাছাড়া নিঃশ্বাসে, ঘর্মে ও মুখে দারুণ দুর্গন্ধের সঞ্চার করে; নাসিকার সর্ববিধ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বহনের শক্তি কমে' যায়। লঙ্কা, পিঁয়াজ ও রসুনের অবিমৃষ্য ব্যবহার অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ পেটের পীড়া ছাড়াও হৃদ্‌দৌর্বল্য, মূত্ররোগ, অস্থিরচিত্ততা, রুক্ষ মেজাজ, কামোত্তেজনা, বিবিধ চর্মরোগ ডেকে আনে।....যে সব বউরা সমস্ত তরকারিতে পিঁয়াজরসুনের বেপরোয়া ব্যবহার করে, তারা নিজেদের রাঁধার গলদ ঢাকার চেষ্টা করে মাত্র।....ইউরো-আমেরিকার ভদ্র পরিবারে রসুন অচল জেনো। কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্র রসুনের ব্যবহার নেই বল্‌লেই

হয়। পিঁয়াজের ব্যবহার অত্যন্ত কম। কোন কোন পরিবারে দালে-ডালনায়-কালিয়ায় হিং ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে। যৎসামান্য মাত্রায় হিং শরীরের পক্ষে উপকারী। গরম মশলার ব্যবহারও যথাসাধ্য হ্রাস করা উচিত, গ্রীষ্মবর্ষা ঋতুতে একেবারে বন্ধ রাখলে ভালো হয়।

যে বাড়িতে অম্ল-অজীর্ণের রোগী আছে, সে বাড়িতে বউরা তরকারিতে লঙ্কার মাত্রা যেন যথাসাধ্য কমিয়ে দেয়; দু'চারটে বিচিশুদ্ধ কাঁচা লঙ্কা ও আদার রস দিতে হয়, শুক্‌নো লঙ্কার পাট একেবারে তুলে দিতে হয়।....প্রতিবারে রাঁধ্‌তে গিয়ে প্রথমে রাঁধ্‌বে অম্বল বা দাল, তারপরে ঝোল, তারপরে ভাত, তারপরে ভাজা। ভাত রাঁধ্‌তে এমনভাবে জল দেবে যে, ভাতের গায়ে ফ্যান মরে' যায়, গাল্‌তে না হয়, অথচ ভাত বেশ ঝরঝরে হয়। ঝোল, ডাল্‌না, কালিয়া প্রভৃতি রাঁধতে গিয়ে জল যখন টগ্‌বগ্‌ করে' ফুট্‌বে, তখন হলুদ দেবে; তারপরে দেবে অন্য বাট্‌না ও নুন।

আমিষ ঝোলে-ঝালে মিষ্টি দিয়ো না। নিরামিষ ঝোল-তরকারিতে নারকেল-দুধ ও নারকেল-বাটা কিংবা কাঁচা দুধ দিলে সুস্বাদ হয়। ভরা গ্রীষ্মে দু'বেলা আগাগোড়া সব রাঁধবে; অন্য সময় অন্ততপক্ষে ভাত।

বাসি জিনিস, পচা জিনিস খেয়ো না, খাইয়ো না। স্বামিপুত্রকে হোটেলের খাদ্য বাজারের খাবার খেতে প্রশ্রয় দিয়ো না। তাদের ফরমাস-মতো খাবার বাড়িতে তৈরি করে' দিয়ো। পাড়াপ্রতিবেশী-আত্মীয়কুটুম্বদের কাছ থেকে এবং নিমন্ত্রণ বাড়ির রসুইকার-হালুইকরদের রান্না লক্ষ্য করে' দুটো-একটা করে' নতুন পদ তৈরি করতে শিখে নিয়ো।

আশীর্বাদ করি, তোমাদের রন্ধনের রূপরসগন্ধ ভোক্তার সুখের স্মৃতিতে যেন অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকে।

নবম আলাপন

নবজীবনের সূচনা

ঘরকন্নার দুই প্রধান অঙ্গের কথা মোটামুটি বল্‌তে আমার আটদিনের আটটা বৈঠক চলে গেল। এইবার শিশুসেবার বিষয় কিছু বলবার জন্যে আমায় প্রস্তুত হতে হবে। আগে শিশু আসবে তবে তো তার সেবা কর্‌বে। শিশু কই?....শিশু চাই।

যে সব বউরা আজ আমার বৈঠকে হাজির হয়েছে, তাদের কারু কারু দেহে সম্ভবত নবজীবনের আবির্ভাবের চিহ্ন সবে ফুটে উঠেছে; কারু কারু হয়তো ফুটে উঠ্‌ব-উঠ্‌ব করছে। কেউ হয়তো আরো দু'এক বছর পরে সন্তান-মুখ দেখ্‌বে। এমন দুর্ভাগিণীও থাক্‌তে পারে যারা জীবনে কখনো আপন গর্ভে প্রাণের হৃৎস্পন্দন অনুভব করবে না। তারা কারা তা জানি না। আগে থেকে তা জান্‌বার উপায়ও নেই। তবু তাদের উদ্দেশ করে' আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে রাখ্‌ছি।

নারীজীবনের চরম সার্থকতা গর্ভধারণে ও সন্তানপালনে। আগেই বলেছি স্বামীর ভালবাসা প্রগাঢ়ভাবে পাওয়া সত্ত্বেও বিয়ের এক বছর বা দু'বছরের মধ্যে স্ত্রীর মনে কিছুকালের জন্যে যেন কেমন-একটা অতৃপ্তি, একটা বিতৃষ্ণা, সব-পাওয়ার মধ্যে তবু-কিছু-না-পাওয়ার বেদনা এসে বাসা বাঁধে। স্ত্রী যেন স্বামীর কাছ থেকে আরো কিছু চায়, স্বামী যেন স্ত্রীর কাছ থেকে নতুন কিছু প্রত্যাশা করে। সে জিনিসটা যে কি—তা কেউ কেউ বুঝতে পারে, কেউ কেউ পারে না। তারা যেন তাদের ভালবাসার একটা নতুন রূপ দিতে চায়, ভোগের ভেতর দিয়ে

সৃষ্টির আনন্দে মাততে চায়, দুই থেকে তারা তিন—তিন থেকে চার হ'তে চায়।

শিশুর মধ্য দিয়ে তাদের ভালবাসার নব জন্মলাভ হয়। শিশুর মাধ্যমে তারা যেন পরস্পরের কাছে আরো নিবিড়ভাবে এগিয়ে আসে, শিশুর জন্যে তারা বেশী করে' ত্যাগ করতে দুঃখ সইতে শেখে। অনেক নারী বিয়ের কিছুদিন পরে সুখের সংসারে একটি হাসি-মাখা শিশুর আবির্ভাব স্পষ্টই কামনা করে। বিয়ের দুই তিন চার পাঁচ বছর পরেও যারা একটি শিশুকে কোলে পায় না, তারা নিজের ওপর যতখানি ক্রুদ্ধ হয়, স্বামীর প্রতি ততখানি মনে মনে বীতশ্রদ্ধ হয়। মাতৃত্ব—নারী-প্রেমের একটা অপরিহার্য অঙ্গ, পিতৃত্ব—পুরুষ-প্রেমের একটা পরিহার্য প্রলোভন!

নতুন জীবনের সৃষ্টিকার্যে পুরুষের কার্যকারিতা ও সহায়তা যেমন আকস্মিক তেমনি যৎসামান্য। নারীকে গর্ভ-ধারণের প্রথম দিন থেকে প্রসবক্রিয়ার পরে কিছুদিন নানা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—যথেষ্ট দুঃখকষ্ট ও বিপদাশঙ্কা মাথায় করে' নিতে হয়। শিশু জন্মাবার পর ও অন্তত তার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মাতার দায়িত্ব ও স্বার্থত্যাগ পিতার চাইতে অনেক বেশী।···এখন গর্ভধারণ, গর্ভক্রম ও প্রসব সম্বন্ধে কিছু তথ্য শোনাতে চাই তোমাদের। এ সব তথ্য স্বামিস্ত্রী দু'দলকেই আমি মন দিয়ে শুনতে বলি, কারণ বাস্তব জীবনে এগুলো উভয়পক্ষেরই বিশেষভাবে কাজে আসবে।

গর্ভ কি করে' হয়

গর্ভ কি করে' উৎপন্ন হয়, সে প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব আমি আমার "বিয়ের আগে ও পরে" ও "জন্ম-শাসন" নামক পুস্তক দু'খানিতে দিয়েছি। প্রথমোক্ত বইখানা তোমরা সকলে পড়েছ বলে' আমি

বিশ্বাস করি, কারণ ঐ বই দিয়েই আমি আমার বক্তৃতার পালা সুরু করেছিলাম। আমি একাধিক পুস্তকে একই বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ বা পুনরালোচনা করি বলে' আমার কোন কোন পাঠক অনুযোগ করেন। আমি সে অনুযোগ আর শুনতে রাজি নই। তোমরা যদি ঐ বই না পড়ে' থাকো তো একখানা কিনে পড়ে' নাও। যদি পড়ে' টড়ে' বেশীর ভাগ তথ্য ভুলে গিয়ে থাকো তো আর একবার তাড়াতাড়ি পড়ে' নিয়ে স্মৃতিটাকে চান্‌কিয়ে নাও। একটু-আধটু পুনরুক্তি আমায় করতেই হবে, নইলে নতুন বিষয়গুলো তোমাদের কাছে সহজে বোধগম্য হবে না।

তোমাদের সকলেরই বোধহয় এইটুকু মনে আছে যে পুরুষের একটি মাত্র শুক্রকীটাণু বা শুক্রাণু (spermatozoon) ও স্ত্রীলোকের একটি মাত্র অণ্ডাণুর (ovum) সম্মিলনে ভ্রূণের সূচনা হয়। শুক্রাণু একেবারে চক্ষুর অগোচর; অণ্ডাণুকেও প্রায় চক্ষুর অগোচর বস্তু বলা যেতে পরে। বস্তু না বলে' এদের প্রাণী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকের কুক্ষিমধ্যস্থ কোন্ যন্ত্রটিতে শুক্রাণু ও অণ্ডাণুর মিলন হয়, তা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়? তারপর এই নিষিক্ত অণ্ডাণু নেমে আসে জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মধ্যে এবং সেখানে এসে ওর ভেতরকার নরম পর্দার একাংশে প্রোথিত হয়ে যায়। তারপর কি করে' এই নিষিক্ত অণ্ডাণু বৃদ্ধি পেতে পেতে ভ্রূণে পরিণত হয় এবং কি করে' ন'মাস পর্যন্ত গর্ভাশয়ের ভেতর নানাভাবে পরিবর্তিত হয়, তা তোমাদের "বিয়ের আগে ও পরে"র বৈঠকে বিশদভাবে বলেছি। আর আমাকে সেগুলো পুনরুল্লেখ করতে ব'লো না।···

গর্ভ হ'য়েছে কি না, তা জান্‌বার কতকগুলি সম্ভাব্য লক্ষণ (presumptive symptoms) ও কতকগুলি নিশ্চিত লক্ষণ (true symptoms) আছে। কতকগুলি লক্ষণ গর্ভিণী নিজেই বুঝ্‌তে

পারে; আবার কতকগুলি লক্ষণ বাড়ির অন্যান্য বর্ষীয়সীরা এবং বিশেষভাবে ধাত্রী বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন।

গর্ভিণী নিজে যে লক্ষণগুলি টের পায়, আগে সেইগুলি বলি।

গর্ভলক্ষণাবলী—যেগুলো পোয়াতি বোঝে

১। মাসিক ঋতুস্রাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে (শতকরা ৯৯ টি কেসে) একদম বন্ধ হয়ে যায়। প্রসবের পরও ঋতুধর্ম লোক-বিশেষে দু' মাস থেকে বারো মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে গর্ভের প্রথম দু'তিন মাস কাল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়। আবার কারো গর্ভ হয়নি,—ছেলে হবার দারুণ আশঙ্কা অথবা একটি সন্তান-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে পর পর কয়েক মাস ঋতু বন্ধ হয়ে থাকতে পারে।

যাদের সত্যি গর্ভ হয়ে যায়, তাদের শেষবারের ঋতুস্রাব সুরু হওয়ার তারিখ মনে থাকলে, কতদিন বাদে সন্তান প্রসূত হবে, তা মোটামুটি ঠিকভাবে বলে' দেওয়া যায়। সাধারণত ঐ তারিখের ২৮০ দিন (অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিন) পরেই কিংবা ওর কাছাকাছি একটা সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবেই। সাধারণত কোন সন্তানই ৩০০ দিনের বেশী পেটে থাকতে পারে না।

২। অনেকেরই এক মাসের গর্ভ হওয়ার পর থেকে চার মাস পর্যন্ত সকালের দিকে গা-বমি-বমি করে; প্রায় সকলেই এই সময় একবার দু'বার বমি করে' ফেলে। বহু প্রথম-গর্ভিণী দিনের মধ্যে ৫।৭ বার বমি করে এবং বমির সময় খুব কষ্ট পায়। ২।১ বার বমি করার পর বহু পোয়াতির বেশ ক্ষিদে পায় এবং খেয়ে-ঘুমিয়ে দুপুর বেলা থেকে তারা একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করে। গর্ভিণীর বমিতে প্রায়-খানিকটা থুতু বা পিত্ত থাকে। খাওয়ার পর বড়-একটা কারো ভাত-

তরকারি মেশানো বমি হ'তে দেখা যায় না। যাদের এ রকম হয়, যা খায় তাই উঠে যায়, তারা অল্পদিনের মধ্যে খুব দুর্বল হয়ে' পড়ে। ৪ মাস গর্ভকালের মধ্যে বমি না থামলে ডাক্তার দেখানো উচিত।

৩। অধিকাংশ গর্ভিণীরই সারা দিন ধরে' মুখে কেবল থুতু ওঠে; যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ তারা কেবল ২।৪ মিনিট অন্তর প্যাচ্-প্যাচ্ করে' থুতু ফেলে।

৪। প্রায় সকল গর্ভিণীরই স্বাভাবিক খাদ্যে অরুচি ও অস্বাভাবিক খাদ্যে (অখাদ্যে বা কুখাদ্যে) রুচি হয়। সাধারণত ২।৩ মাস গর্ভের পর থেকে পোয়াতিদের পোড়া মাটি, খোলাম-কুচি, ভাঁড়-ভাঙা, উনুনের ছাই, কাঠ কয়লা, চাল, খড়ি প্রভৃতি খাওয়ার দিকে অদ্ভুত রকমের লোভ হয়। কেউ কেউ খুব পান আর চুন খায়; কেউ কেউ আচার, কাশুন্দি, তেঁতুল, জলপাই, করমচা, কাঁচা আম, লঙ্কা খেতে ভালবাসে। যাদের অরুচি হয় না বা নামমাত্র হয়, তাদের ভীষণ ক্ষিদে বাড়ে এবং সব সময় খেতে ইচ্ছে করে। বহু পুত্রবতীরা পোয়াতি হলে' সাধারণত অরুচি ও বমিতে তেমন কষ্ট পায় না।

৫। গর্ভের প্রথম মাসের শেষ দিকে প্রায়ই স্তন ভারি-ভারি বোধ হয়, মাঝে মাঝে ভেতরে টন্ টন্ করে, টিপ্‌লে বেশ-একটু ব্যথা বোধ হয়। দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি থেকে স্তন একটু বড়, বোঁটা একটু মোটা হয় এবং যেন বাইরের দিকে সামান্য ঠেলে বেরোয়। তৃতীয় মাসে স্তনের উপরিতলস্থ শিরাগুলি স্পষ্ট হয়ে চামড়ার ওপর ভেসে ওঠে। বোঁটার চারিধারে চক্রাকার স্থানটী (areola) কাল্‌চে রঙের হ'তে থাকে এবং মখমলের মতো নরম বোধ হয়। এই অবস্থাকে পশ্চিম বাংলার মেয়েরা "ভ্যালা পড়া" বলে। চার মাস থেকে ভ্যালা বেশ গাঢ় হয়; ফর্সা মেয়েদের একটু বেগুনে রঙের হয়।

পাঁচ মাসের শেষভাগে ভ্যালার চারপাশ দিয়ে আর একটা

ঘোরানো কিঁতের মতো আকারে হাল্‌কা কিঁকে রঙের ভ্যালার দাগ ফুটে ওঠে। প্রত্যেক স্তনের ভ্যালার জায়গাটায় ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ির মত ১০।১৫ টি দানা (Montgomery's follicles) বেরোয়; এগুলোতে আঙুল দিলে ভিজে-ভিজে ঠেকে। তিন মাসের শেষাশেষি বোঁটা বেশ বড় হয় ও টিপ্‌লে এক আধ ফোঁটা আঠালো রস বেরোয়। এই রসই ক্রমশ দুধে পরিণত হয়। ৬।৭ মাস গর্ভকালে স্তন বেশ ভারি ও বড় হয়ে পড়ে। স্তনের ওপরকার চামড়া দ্রুত-বৃদ্ধির চাড়ে অল্প অল্প ফেটে যায়; ফাটার ঈষৎ সাদা-সাদা দাগগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

৬। গর্ভের প্রথম তিন মাস সাড়ে-তিন মাস কাল বার বার প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা হয়; তারপর মাস ৪।৫ সে ইচ্ছা থাকে না। আট মাসের পর থেকে পুনরায় এই লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে। প্রসবের আগের কয়দিন খুব ঘন ঘন প্রস্রাব-ত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়। কারো কারো ঘন ঘন পায়খানার বেগও উপস্থিত হতে পারে। [আট মাসের পর প্রস্রাব খুব কমে যাওয়া বা ওর রঙ গাঢ় হওয়া ভালো নয়।]

৭। সাধারণত গর্ভের ৪। মাস থেকে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়াচড়া করে; এর নাম "ভ্রূণসঞ্চরণ" (Quickening)। মনে হয় তলপেটের ভেতর এক-এক জায়গা কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে কেঁপে উঠ্‌ছে। তারপর মনে হয় ভ্রূণ যেন ভেতরে লাথি-কিল মাচ্ছে। তোমরা বুঝতে পাচ্ছ—সত্যি সত্যি ভ্রূণ লাথিকিল মারতে পারে না, তার হাতপা গুটোনো অবস্থায় থাকে। ভ্রূণচ্ছদার মধ্যে এই সময় বেশ জল জমে; তার মধ্যে ও আপনা-আপনি নড়াচড়া করতে থাকে এবং সেই সময় মাঝে মাঝে জরায়ুর ভেতরকার দেওয়ালে ধাক্কা দিতে থাকে। সাত মাসের পর থেকে ভ্রূণসঞ্চরণ বড়-বেশী টের পাওয়া যায় না।

৮। পাঁচ মাসের শেষের দিক থেকে তলপেটের চামড়ায় নীল-নীল বা কালো-কালো বা কটা কটা দাগ পড়ে। সাত মাস থেকে পেট দ্রুত বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কৃমির আকারে সাদা সাদা ফাটার দাগ সারা পেটে ছড়িয়ে পড়ে। কারো কারো মুখে ও গলায় ফোঁটা ফোঁটা ছুলি বা মেচেতার মতো দাগ ফুটে বেরুতে দেখা যায়।

৯। গর্ভের প্রথম থেকেই প্রত্যেক মেয়ের মানসিক পরিবর্তন হয়। অত্যন্ত শান্ত মেয়ে রুক্ষমেজাজী, অত্যন্ত বদ্‌রাগী মেয়ে অতি ধীরস্বভাবা হতে পারে। অনেকেই অত্যন্ত অভিমানী হয়ে ওঠে; কারু কারু সময়-অসময়ে কানতে ইচ্ছে করে; অনেকেই বাঁচবে না ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। কাজেকর্মে অনেকেরই মন বসে না; সর্বদা গা-ম্যাজ্‌ম্যাজ করে, নতুবা নির্জনে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় শুয়ে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। অনেক পোয়াতিরই স্বামীকে দরকারে-অদরকারে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে; প্রথম পাঁচমাস কামভাবও বাড়ের মুখে থাকে।....

গর্ভলক্ষণাবলী—যেগুলো অপরে বোঝে

১। গর্ভ দু'মাসের পুরোনো হয়ে তৃতীয় মাসে পড়্‌লে, স্তনের বোঁটা একটু জোরে টিপে দু' এক ফোঁটা পাত্‌লা আঠালো রস বের করা যায়। এটা গর্ভ হওয়ার একটা নিশ্চিত লক্ষণ।

২। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় প্রত্যেক মেয়েরই জরায়ুর মুখ (গর্ভমুখ, *os uteri*) মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে টের পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় মুখটা পুরু রবারের শক্ত সুচালো বেড়ের মত অনুভূত হয়। মুখের ওপরে পাখির গলার মতো জরায়ুর সরু গলা, তার ওপরে ওর আসল দেহ—মধ্যস্থল খানিকটা ফাঁপা। পোয়াতি হলে' জরায়ুর মুখটা রীতিমতো খ্যাবড়া নরম তল্‌তলে ঠেকে। প্রথমটা গলা আরো সরু ও লম্বা হয়ে যায় এবং গলার একদিকে আঙুলের চাপ দিলে ওটা তখনকার মতো দুমড়ে যায়।

৩। যোনিনালীর মধ্যে একটা কি দুটো আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিলে ওর দেওয়ালে ধমনীর মধ্য দিয়ে দ্রুত প্রচুর রক্ত-সঞ্চলনের দিপ্ দিপ্ শব্দ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

৪। যোনিনালীর রঙ্ লালচে থেকে ক্রমশ বেগুনি রঙের হতে থাকে (violet discoloration)।

৫। চার মাসে কিংবা তার কিছু পরে তলপেটে স্টেথস্কোপ্ বসালে কিংবা তলপেটের ওপর আল্তোভাবে কান পেতে থাক্লে এক রকম হুস্ হুস্ শব্দ শোনা যায়। সাধারণত এই শব্দটা হয় পোয়াতির শরীর থেকে জরায়ুর মধ্যে, ফুলের মধ্যে এবং ফুল থেকে ছেলের গর্ভনাড়ীর মধ্যে প্রবল ধারায় রক্ত-সঞ্চলনের জন্যে। একে ইংরাজীতে বলে *uterine souffle* (ইউটেরাইন্ সুফ্ল্); বাংলাতে বলা যেতে পারে "গর্ভমর্মর"।

৬। পাঁচ মাস গর্ভকালের মাঝামাঝি থেকে ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট শোনা যায়। শুন্তে গেলে ডাক্তারের স্টেথস্কোপ্ পেটের ওপর বসিয়ে শুনলে ভালো হয়। পেটের ওপর আল্তোভাবে কান রেখেও শোনা যায়। ভ্রূণ সাত-আট মাস পর্যন্ত অনবরত বাড়ে ও নড়াচড়া করে বলে,' সাধারণ লোকের পক্ষে পেটের ঠিক কোন জায়গাটা কান রাখ্লে হৃৎস্পন্দন টের পাওয়া যায় তা বুঝ্তে পারা শক্ত। সাধারণত সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ড (heat) স্পন্দিত হয় মিনিটে ৭৫ থেকে ৮০ বার। গর্ভিনীদের ৮৫ বারও হতে পারে। কিন্তু ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ১৩০ থেকে ১৫০ বার স্পন্দিত হতে শোনা যায়।

[তোমরা কেউ নাড়ী দেখ্তে শিখেছ কি? মোটামুটিভাবে নাড়ী দেখা এমন কিছু শক্ত নয়।....হাতের মণিবন্ধ কাকে বলে জান তো? চলিত কথায় ওকে বলে কব্জি। হস্ততালুর মূলদেশে বুড়ো আঙুলের দিকটায় মণিবন্ধের ওপর অল্প জোরে তিনটে আঙুল

রাখতে হয় প্রকোষ্ঠীয় ধমনীর (Radial artery) ওপর। হৃৎপিণ্ড বা heartএর প্রতি-স্পন্দনের ফলে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসে এই প্রকোষ্ঠীয় ধমনীর মধ্যে। কাজেই একটা হাতঘড়ি নিয়ে সেকেণ্ডের কাঁটার গতি লক্ষ্য করে' এই ধমনীর ওপর আঙুল রেখে গুন্তে পারো হৃৎপিণ্ড প্রতি-মিনিটে কতবার স্পন্দিত হচ্ছে। ভেতরে সর্দিকাশি হলে, বা অন্য কোন রকম বিশৃঙ্খলা হলে, রক্তের গতি পর পর একবার দ্রুত একবার ধীর হয়। জ্বরজ্বারিতে রক্তের গতি অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন মিনিটে একশো দশ, একশো কুড়ি, একশো তিরিশ হয়; ছোট ছেলেমেয়েদের আরো বেশী বার হয়।]

গর্ভ বলে' সন্দেহ হয় এমন রোগসমূহ

গর্ভিণী হওয়ার যে সব লক্ষণের কথা তোমাদের বল্লুম, তার এক বা একাধিক লক্ষণ মেয়েদের কোনো কোনো রোগে প্রকাশ পায় এবং সাধারণের কাছে সেগুলো গর্ভলক্ষণ বলে' মনে হয়। যে যে রোগে এরকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, তাদের কতকগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করে' যাচ্ছি। ওগুলো তোমরা জেনে রাখো, মনে রাখো।

১। উদরী রোগ হ'লে পেট বড় হয়। এতে ঋতু অনিয়মিত হ'তে পারে—কিন্তু একবারে বন্ধ হয় না; যোনিনালী, জরায়ু ও স্তনের কোন পরিবর্তনই হয় না।

২। গর্ভমুখ বুঁজে গিয়ে কখনো কখনো ঋতু দু'তিন মাস বন্ধ থাকে। এতে রক্ত জমে' জরায়ু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটও বড় হয়, কিন্তু অন্যান্য পরিবর্তন হয় না। অনেক সময় দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগার দরুণ মেয়েদের ঋতু ৩।৪ মাস কাল একাদিক্রমে বন্ধ থাক্তে পারে। তখন জরায়ু বড় হয় না, কিন্তু পিলে ও যকৃৎ রীতিমতো বড় ও বেদনাযুক্ত হয়। মনে রাখতে হবে—যকৃৎ থাকে নাইয়ের উপর-

অংশে, পেটের ডান দিকে পাঁজরার কাছে ; আর পিলে থাকে বাঁ দিকে। গর্ভ হলে আগে তলপেটটাই বড় ও ভারি হয়, তাতে ব্যথা হয় না।

৩। জরায়ুর মধ্যে 'টিউমার' বা আব্ হলে, পেট আস্তে আস্তে বড় হতে পারে। কিন্তু গর্ভের অন্য লক্ষণগুলি এতে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

৪। অণ্ডাশয়ের (ovary) মধ্যে টিউমার হলে বা বিষিত রস জমলে (cyst) ঋতুস্রাব বন্ধ হতে পারে। কিন্তু ওতে তলপেটের একদিকটা অল্পবিস্তর বড় হয়ে ওঠে এবং বেদনাগ্রস্ত হয় ; গর্ভের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

৫। মিথ্যাগর্ভ (pseudo-cyesis)। সত্যিকার গর্ভের অধিকাংশ লক্ষণ ওতে প্রকাশ পায়। যারা বিয়ের পর বহুদিন পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে সন্তান কামনা করে, তারা হঠাৎ একদিন অত্যন্ত সুখাবহ সহবাসের সময় মনে করে' বসে—তাদের গর্ভোৎপত্তি হ'ল। তারা গভীর কল্পনা-শক্তি-বলে যথার্থ গর্ভিণীর মতো প্রায় সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। এদের ঋতু বন্ধ হয়, চর্বি ও বায়ু জন্মিয়ে পেট রীতিমতো বড় দেখায়, অরুচি ও বমি হয় ; এমন কি গর্ভিণী চার মাস থেকে পেটের ভেতর ভ্রূণসঞ্চলন টের পায়। কিন্তু এদের যোনিনালী ও স্তনের পরিবর্তন বড় বেশী রকমের হয় না। তা ছাড়া পাঁচ মাসে পেটে স্টেথস্কোপ বসিয়ে ভ্রূণের হৃৎস্পন্দনও শোনা যায় না।...

ইংলণ্ডের রানি মেরি এইরকম মিথ্যাগর্ভের দ্বারা আগাগোড়া অভিভূত হয়ে' ছিলেন ; এমন কি তাঁর প্রসববেদনাও উপস্থিত হয়েছিল। শেষকালে অনেক টানা-হ্যাঁচড়া করে' তাঁর পেট থেকে একটা শক্ত রক্তের পিণ্ড বেরোয়!

দশম আলাপন

গর্ভকালীন কর্তব্য

গর্ভ হয়েছে সাব্যস্ত হলে স্ত্রীলোকদের আহার্য-পরিচ্ছদ-কার্য-বিশ্রাম সম্বন্ধে কিছু নতুন নিয়ম পালন করতে হয়। প্রথমে আহারের কথাই বলি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পোয়াতিকে আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সে সাধারণত যে পরিমাণ খাদ্য খায়, তাই খাবে ; তবে সমস্ত খাদ্যই টাট্‌কা হওয়া চাই। একবারে খুব ভরপেট আহার না করে' বারে বারে অল্প আহার করলে ভালো হয়। পুষ্টিকর জিনিসও বেশী খাওয়া ভালো নয় ; কুখাদ্যের প্রতি লোভ একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

গর্ভিণী যা যা খেতে পারে বা খেলে ভালো হয়

ঢেঁকি-ছাঁটা চালের গরম ভাত, গরম গরম আটার রুটি ; মাঝে-মাঝে দু' চারখানা ময়দার লুচি বা পরোটা। ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট, বার্লি বা এরোরুটের বিস্কুট ২।৪ খানা, মাখন-মাখানো সেঁকা পাউরুটির ২।১ ফালি খাওয়ায় আপত্তি নেই। মুড়ি, চিড়া, খই অল্প মাত্রায় মাঝে মাঝে খাওয়া চলে। প্রায় সব রকম শাকসব্জি ফলমূল খাওয়া চলে এবং খাওয়া দরকার। বেশী করে' খেতে পারা যায় বিলিতি বেগুন, ঢ্যাঁড়স, শিম, বর্বটি, আলু, নারকেল, মোচা, থোড়, ডুমুর, ডাঁটা প্রভৃতি। পেঁয়াজ-দেওয়া তরি-তরকারি মাঝে মাঝে অল্পমাত্রায় খাওয়া চলবে।

অর্ধসিদ্ধ ডিম, ডিমের পোচ্ খাওয়া চলে ; ভাজা, ডিম ও ডিমের তরকারি যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। সাত মাসের

পর মাংস-ডিম একেবারে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ—বিশেষভাবে হাত পা, চোখের কোল ফুল্‌তে ও প্রস্রাব কমতে থাকে যাদের। পরিমিত মাত্রায় মাখন খাওয়া ভালো ; কিন্তু তেল-ঘি-দেওয়া খাদ্য ও ভাজাভুজি খাওয়া একদম কমিয়ে দিতে হবে। কই, মাগুর, সিংহি প্রভৃতি জিয়ল মাছ ও টাট্‌কা খল্‌সে, খয়রা, পাব্‌দা, চাঁদা, বাচা, ফ্যাঁসা, মৌরলা, পুঁটি প্রভৃতি ছোট মাছের ঝোল খাওয়া উচিত। কুচো চিংড়ি, বড় চিংড়ি, ইলিশ, চিতল, আড়, বান, গজাল, শোল মাছ খুব কম খাবে ; শেষ দু'তিন মাস একেবারে বন্ধ করে' দেবে।

পাখীর মাংসের ঝোল বা সুরুয়া খুব কম মশলপাতি দিয়ে মাঝে মাঝে খেতে পার ; জীবজন্তুর মাংসের ঝোল মাসে একবারের বেশী নয়। শেষ দু'তিন মাস তা-ও বন্ধ রাখবে। টাট্‌কা ছাগলের দুধ বা গরুর দুধ এক পোয়া থেকে আধসের খাওয়া একান্ত কর্তব্য। তিন পোয়া খেয়ে হজম কর্তে পার তো খাবে। দুধ চুমুক দিয়ে খেতে না পার, কিছুটা ভাতে মেখে খাবে ; বাকিটা দই বা ঘোলের আকারে খাবে। মাঝে মাঝে ছানা খাওয়া বা সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়া চল্‌বে ; তাতে উপকার বই অপকার হবে না। চিনি খাওয়া কমিয়ে দেবে ; তার বদলে গুড়, মধু, তালমিছরি, 'গ্লুকোজ' খাবে। জ্যাম্, জেলি, আচার, চাট্‌নিও অল্পমাত্রায় খেতে পার। রোজ কিছু শাকচচ্চড়ি, মোচা, থোড় বা পেপের তরকারি খাবার চেষ্টা কোরো।

খাওয়ার সময় ঢোক্ ঢোক্ করে' বেশী জল পান করা বড় বদ্ অভ্যাস। খাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে যত খুশি জল, ডাবের জল, বোতলের সোডা, লেমনেড্, মিছরি বা গ্লুকোজ ও লেবুর রস দিয়ে তৈরী সরবৎ প্রভৃতি খাওয়া চল্‌বে। যাদের অভ্যাস আছে, তারা দুবেলা দু'কাপ হাল্কা চা বা কোকো খাবে—একটু বেশী

পরিমাণে দুধ মিশিয়ে ; দু' কাপের বেশী কখনই নয়। গ্রীষ্মকালে একেবারে বন্ধ রাখ্‌তে পারলে—অথবা একবেলা করে' বন্ধ করে' দিলে খুব ভাল হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা

গর্ভাবস্থায় অনেক পোয়াতিই কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পায়। প্রথম গর্ভিণীদের কেউ কেউ প্রথম দিকটায় মাসখানেক বা মাস দেড়েক আমাশার মতো পুনঃ পুন মলত্যাগ করে ; কেউ কেউ অর্শে কষ্ট পায়। কোষ্ঠ ভালো পরিষ্কার না হলে' এই সময় শরীরের রক্ত সহজেই বিষিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে একদিন পায়খানা বন্ধ থাক্‌লে অথবা পর পর ৫।৭ দিন কোষ্ঠ ভাল পরিষ্কার না হলে' জোলাপ নেওয়া দরকার। ডাক্তারখানা থেকে Glycerine Suppository নামক জোলাপ-বাতি কিনে এনে, মলদ্বারের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, তার শেষপ্রান্তটা অন্তত ৮।১০ মিনিট কাল আঙুল দিয়ে ঠেসে রাখ্‌তে হয়, তারপর বেগ এলে আঙুল সরিয়ে নিতে হয় ; তখনি-তখনি বেশ খানিকটা মল বেরিয়ে যায়। নইলে সাবান-গোলা অল্প-গরম জলের ডুশ নিতে পার।

ডুশ নেওয়ার সুবিধা না থাক্‌লে, ডাক্তারখানা থেকে Pulv Liquorice Compound (ওতে যষ্টিমধু হ'ল প্রধান উপাদান) এক আউন্স্ কিনিয়ে আনবে। চা-চামচের দু' চামচ ভর্তি এই ওষুধের গুঁড়ো এক কাপ গরম দুধে বা গরম জলে মিশিয়ে রাত্রিতে শোওয়ার সময় খেয়ে নেবে। খেতে খারাপ নয়। নইলে, গ্লীসেরিন ½ আউন্স ও জলপাই-তেল ½ আউন্স্ টাক্ এক সঙ্গে মিশিয়ে ভোর বেলার দিকে খেয়ে আর একটা ঘুম দিয়ো ; ঘণ্টা দুই তিনেকের মধ্যেই পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। নচেৎ, *Petrol-Agar*, *Agar-Agar* নামক

পেটেণ্ট্ ওষুধ খেতে পার। সবারই এক রকমের জোলাপে অথবা নির্দিষ্ট মাত্রার জোলাপে কাজ হয় না।

গর্ভের অবস্থায় Mag. Sulph, Sodi. Sulph, রেড়ির তেল, ক্রোটন তেল, ক্যালোমেল, Phenopthalein, কালাদানা, Colocynth প্রভৃতি কড়া জোলাপ না খাওয়ানোই উচিত। মৃদু জোলাপে পেট মনোমত পরিষ্কার না হ'লে বরং ডাক্তারের পরামর্শ দেবে। মৃদু জোলাপও মাসে ২।৩ দিনের বেশী কিছুতেই নেওয়া উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি নিয়মিতভাবে পাকা পেঁপে, কলা, কিস্‌মিস, খেজুর, মনক্কা প্রভৃতি খেলে আর রাত্রিকালে গরম দুধ খেয়ে শুলে সন্তোষজনকভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যায়।

স্নান ও গাত্রমার্জনা

বেশী রকম সর্দিকাশি, স্পষ্ট জ্বর বা অন্য কোন ব্যারাম না হলে কি শীত কি গ্রীষ্ম নিয়মিতভাবে প্রত্যহ স্নান করবে। চৈত্র থেকে ভাদ্রের মধ্যে বৃষ্টির দিন ছাড়া অন্যদিন বিকেলে গা ধুয়ে ফেল্‌বে। মাঝে মাঝে সাবান মাখ্‌বে ও গামছা দিয়ে ভালো করে' গা ডলবে। ঠাণ্ডার সময় তেল মাখ্‌তে যেন ভুল না হয়। তেল মাখায় অনেক মেয়েরই বেজায় আলস্য দেখ্‌তে পাই; কিন্তু দয়া করে' গর্ভকালে এ আল্‌সেমিটা কোরো না।

উরুর মাথায় কুঁচ্‌কির খাঁজ ও যোনি-প্রদেশ বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বে। Neo-Veat নামক লোমনাশক মলম দিয়ে অথবা সেফ্‌টি রেজর দিয়ে দু'মাস অন্তর যোনি প্রদেশ নির্লোম করবে। বিশেষভাবে প্রসবের ২।৩ দিন আগে যোনিপ্রদেশ লোমশূন্য করা আবশ্যক। সাবান মাখার দিন গরম জলে নেয়ো।

তিন মাসের মধ্যেও যদি স্তনের বোঁটা অন্তত ½ ইঞ্চি বাইরের

দিকে উদ্গত হয়ে না ওঠে, তাহলে রোজ দুই আঙুলে আস্তে আস্তে টেনে ধরে' বাইরে আনার চেষ্টা কোরো। স্তনের বোঁটা সাত-আট মাস থেকে রোজ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবে। স্তনদুটি যদি ভারি হয়ে ঝুলে পড়ছে দেখ, তাহলে কাঁচুলি বা কর্সেট্ এঁটো না, তলার দিক থেকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে উঁচু কোরে বুকের সঙ্গে বেঁধে দেবে।

দাঁত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করবে; জিব ছুলবে। দাঁত মাজার ও মুখ ধোওয়ার সময় চোখের মধ্যে জলের ঝাপ্‌টা দেবে; জল-মাখা হাত দিয়ে কপাল ও রগ্ বেশ জোরে জোরে বার কয়েক রগ্‌ড়ে ফেলবে। রাত্রিতে খাওয়ার পর পাতের নুন সামান্য মাত্রায় আঙুলে লাগিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে দাঁত মেজে, এক ঢোক্ জল মুখে নিয়ে, ঐ লবণাক্ত জল-দ্বারা মুখ উঁচু করে' ভালো করে' কুল্লি করবে। দাঁতের কোন শক্ত ব্যায়রাম থাক্‌লে, গর্ভের প্রথমাবস্থায়ই ডাক্তার দেখিয়ে তার প্রতিবিধান করবে। খাওয়ার পর দু'বেলা দুটো পান খেয়ো। গরম মশলা ও দোক্তা একেবারে বন্ধ রাখ্‌বে।

নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমণ, ব্যায়াম

ভোর বেলা ওঠার অভ্যাস থাকলেও উঠো না; আর এক ঘুম দেবার চেষ্টা ক'রো, নচেৎ খানিকক্ষণ জেগে থেকে একটু বেলায় উঠো। ভোরে মলমূত্রের বেগ-বর্জনের প্রয়োজন হলে', উঠে তা সেরে এসে আবার একটু শুয়ে থেকো। তারপর উঠে ছাতে, বারান্দায় বা বাড়ির সংলগ্ন বাগানে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ো এবং ১৫।২০ মিনিট গায়ে একটু রোদ্দুর লাগিয়ো। তারপর নেয়ে নিয়ে, নিজের সংসারের কাজে লেগে যাবে। গর্ভের আগাগোড়া কাল মোটামুটি-ভাবে পরিশ্রম করা চাই। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া করার ঘণ্টা

খানেক পরে বেশ খানিকক্ষণের জন্তে বিছানায় বা মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম নেবে; দেড় দু' ঘণ্টা যদি ঘুমোতে পার তাতেও ক্ষতি নেই।

সমতল ভূমিতে যতটা পার চলে' হেঁটে বেড়াবে। গর্ভের প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে বেড়িয়ে আসবে। রাত্রিকালে খাওয়ার অন্তত একঘণ্টা পরে শোবে। ঘরের জানালা খুলে রেখে সর্বদা বাতাস চলাচলের সুবিধা করে' দেবে; রাত্রিতেও এই ব্যবস্থা করবে। শোওয়ার সময় পুরো এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শোবে। যতক্ষণ জেগে থাকবে, ততক্ষণ কিছু-না-কিছু কাজ করবে। অবশ্য খুব পরিশ্রান্ত বোধ করলে অথবা বুকে-পিঠে খিল্ ধরলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে বিশ্রাম করবে। গর্ভের প্রথম অবস্থায় নদীতে বা পুকুরে খানিকক্ষণ সাঁতার কাটতে পার। খুব ফলপ্রদ ব্যায়াম। দিনরাত যারা শুয়ে-বসে থাকে, তারা প্রসবকালে কিন্তু ভয়ানক কষ্ট পায়; এ কথাটি মনে রেখো।

বিশেষভাবে নিষিদ্ধ

রসুন, গরম মশলা, বেশী শুক্ত লঙ্কার ঝাল, সরষে-বাটা, কাঁকড়া, শুঁটকি মাছ, লোনা ইলিস, কচ্ছপ বা কাছিমের মাংস, বাসি কড়্কড়ে ভাত বা রুটি, পান্তা ভাত, অতিরিক্ত তিতো ও টক্, পোলাও, ইলিস, চিতল, আড় প্রভৃতি তৈলাক্ত বড় মাছ একেবারে বাদ দেবে।

এই সময় সিঁড়ি দিয়ে অনবরত ওঠানামা করা, ভারি জিনিস তোলা ও বহা, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি বা বাসে চড়ে' দীর্ঘপথ ভ্রমণ করা, ব্যাড্মিণ্টন, টেনিস প্রভৃতি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বাটনা বাটা, ঢেঁকিতে পা দেওয়া, কুয়ো থেকে জল তোলা, কয়লার খনির মধ্যে নামা, থিএটার বায়োস্কোপ দেখা ও জনতাপূর্ণ কোন স্থানে ঘন-ঘন যাওয়া নিষিদ্ধ। খুব মন

খারাপ ঠেকলে বা দেখতে ইচ্ছে করলে এক-আধ দিন থিএটার, বায়োস্কোপ, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি দেখা বা শোনা চল্তে পারে; কিন্তু কখনই মাসে একবারের বেশী নয় এবং সাতমাসের পরে মোটেই নয়। রাত্রিজাগরণ গর্ভিণীদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রাত্রি ন'টার মধ্যে খেয়ে নিয়ে দশটা—কচিৎ এগারটার মধ্যে গর্ভিণী ঘুমিয়ে পড়্বে। ক্রমাগত অনিদ্রায় ভুগ্লে ডাক্তার দেখাতে হয়। অম্লরোগ যাদের এই সময় দেখা যায়, তাদের কোনরূপ কুপথ্য করা কোনমতে যুক্তিযুক্ত নয়। খুব বেশী অম্ল-অজীর্ণে কষ্ট পেলে অল্পমাত্রায় Milk of Magnesia (পাঁচ গ্রেনের চাক্তি) একটা অথবা অর্ধ চা-চামচ Sodi Bi-Carbonate (খাওয়ার সোডা) মুখে নিয়ে, দু ঢোক্ জল খেয়ে ফেল্লে উপকার হয়। রোজ ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। যেদিন খুব বেশী অম্ল বোধ হবে, সেদিন খাবে।

গর্ভপাত ও অকালপ্রসবের কারণাবলী

১। গর্ভপাত ও অকালপ্রসবের সব চেয়ে বড় কারণ হ'ল প্রসূতির রক্তে সিফিলিসের বীজাণু থাকা। সিফিলিসের বীজাণু কি করে' সুস্থ ব্যক্তির রক্তে সঞ্চারিত হয়, সে কথা "বিয়ের আগে ও পরে" গ্রন্থে আমি খুলে বলেছি। স্বামী যদি বিয়ের আগে বা পরে কোন দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে সহবাস করে' থাকে, তাহলে তার শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুক্তে পারে। সে যদি কোনরকম পেটেণ্ট্ ওষুধ খেয়ে, কোন হাতুড়ের অথবা ভাল ডাক্তারের কাছে অর্ধেক চিকিৎসা করিয়ে কোনমতে রোগ চাপা দিয়ে রেখে থাকে, তাহলে সহবাসের মাধ্যমে ঐ রোগের বিষ তার স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেবে।

স্ত্রী নিজেও বিয়ের আগে বা পরে কোন ব্যাধিগ্রস্ত লম্পটের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়ে এই ব্যাধি নিজের শরীরে টেনে আন্তে

পারে; তারপর ঐ বিষ স্বামীর শরীরে সংক্রামিত হয়—গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীরে সংক্রামিত হয়। ফলে, চার-পাঁচ মাসে গর্ভ নষ্ট হ'তে পারে, অথবা সাত-আট-ন' মাসে মৃতসন্তান প্রসূত হতে পারে; নতুবা ঠিক সময়ে জীবন্ত সন্তান প্রসূত হয়ে' বছর খানেকের মধ্যে নানা অসুখে ভুগে মারা যেতে পারে। ক্বচিৎ দুই-একটা শিশু নিজের দেহে সিফিলিসের বিষ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

সুতরাং তোমাদের ধারণা করে' নিতে বোধহয় দেরি হবে না যে, কোন কোন স্বামী বা স্ত্রীর শরীরে জন্মগতভাবে সিফিলিসের জীবাণু বর্তমান থাকতে পারে, অর্থাৎ তারা বাপমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে ঐ ব্যাধি পেতে পারে। স্বামীর দেহে ঐ ব্যাধি থাকলে স্ত্রীর শরীরে আসবে; আবার স্ত্রীর শরীরে ঐ ব্যাধি থাকলে স্বামীর শরীরে আসবে। বাপমার দোষেই হোক, অথবা নিজের দোষেই হোক, স্বামী বা স্ত্রী অথবা উভয়ের শরীরে সিফিলিসের বিষ আছে জানা গেলে গর্ভ হবার আগেই রোগের চিকিৎসা করানো দরকার; নইলে শতকরা ৯৫টি কেসে গর্ভপাত হবে, নতুবা মৃতপ্রসব হবে, নতুবা অকালপ্রসব হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সিফিলিস রোগগ্রস্ত মায়ের পেট থেকে অস্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, ভয়াবহ আকারবিশিষ্ট, কিম্ভূতকিমাকার জীবিত বা মৃত সন্তান প্রসূত হতে পারে।...এই ব্যাধির একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা—অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের ইঞ্জেকশন্। রক্তপরীক্ষা (W. R.) করিয়ে যতদিন না রক্ত জীবাণুশূন্য (negative) জানা যায়, ততদিন পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

২। কোন কোন স্ত্রীলোকের জরায়ু বা গর্ভাশয় শৈশবোচিতভাবে অপরিপুষ্ট। সুতরাং ভ্রূণ তাদের জরায়ুর মধ্যে ৩।৪ মাস পর্যন্ত অতি কষ্টে বৃদ্ধি পেয়ে তারপর আর বাড়তে না পেয়ে মারা পড়ে।

৩। স্ত্রীলোক শক্ত মাটি বা মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে গর্ভপাত বা অকালপ্রসব হতে পারে।

৪। স্বামী অথবা দম্পতি মদ্যপানাসক্ত হলে ও নেশার ঘোরে সহবাসের দ্বারা গর্ভসঞ্চার করলেও গর্ভ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পেটে সজোরে লাথি, কিল, ঘুষি খেলেও এই আশঙ্কা আছে।

৫। গর্ভাবস্থায় হঠাৎ কোনরকমে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হ'লে, প্রিয়-জনের মৃত্যু দেখলে বা মৃত্যু-সংবাদ পেলে, তৃতীয়-চতুর্থ মাস গর্ভকালে উপর্যুপরি কয়েকদিন বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাস-দ্বারা সহবাস করলে, বায়ু-চলাচলের সুবিধাহীন কোনস্থানে ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করলে, ঝড়ঝাপ্টার সময় সমুদ্রভ্রমণ করলে, ক্রমাগত কয়দিন ধরে' সাধ্যাতি-রিক্ত কায়িক পরিশ্রম করলে, ভারি জিনিস নিয়ে ওঠানামা করলে, ঘোড়ায় চড়লে, সাইকেল চড়লে, ঢেঁকি চালালে, গর্ভপাত বা অকাল-প্রসব হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

৬। দীর্ঘস্থায়ী ম্যালেরিয়া, টাইফএড্, কালাজ্বর, রক্ত আমাশা প্রভৃতি অসুখে ভুগলে এবং কোনক্রমে নাভীরজ্জু ভ্রূণের গলায় জড়িয়ে গেলে, পেটের মধ্যে সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটতে পারে।

গর্ভপাত হওয়ার প্রাক্কালে অত্যন্ত গা-ম্যাজম্যাজ করে, মাথা ধরে, অক্ষুধা ও অনিদ্রা দেখা দেয়, তলপেটে অল্পবিস্তর ব্যথা ও চাপ-বাঁধা বলে' বোধ হয়, পিঠের নীচের দিকটা যন্ত্রণায় যেন ফেটে যায়, যোনি-নালী দিয়ে মাঝে-মাঝে অল্প অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। তারপর হঠাৎ তলপেটের মধ্যে যন্ত্রণা বাড়ে, জরায়ুর দেওয়াল কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে মোচড় খেতে থাকে, বেশী মাত্রায় রক্ত পড়তে থাকে। শেষে মৃত অপুষ্ট ভ্রূণ বেরিয়ে আসে। যদি সঙ্গে সঙ্গে বা অল্পক্ষণ পরে ক্ষুদ্রাকার ফুলটি বহির্গত হয়, তাহলে রক্ত-পড়া খুব কমে আসে; ফোঁটা ফোঁটা করে' পড়ে' ঘণ্টা কয়েকের বা বড় জোর একদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে

যায়। কিন্তু ফুল পড়্‌তে দেরি হলে রক্তস্রোত বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিতা দাই বা ডাক্তার ডেকে এনে দেখানো উচিত।

কোন্ কোন্ অবস্থায় চিকিৎসক ডাকবে

১। গর্ভের অব্যবহিত পরে গর্ভিণীর শরীরের মধ্যে সিফিলিস-বীজাণুর বিদ্যমানতা জানা গেলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। সাধারণত চার মাসের আগে ভ্রূণের শরীর-মধ্যে মায়ের রক্ত থেকে সিফিলিসের বিষ ঢোকে না।

২। গর্ভিণীর শরীর যদি রক্তশূন্য হয়, চোখের কোল বসে' যায়, চোখ হল্‌দে বা দেহ ফ্যাকাসে হয়ে' যায়।

৩। সদাসর্বদা যদি মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, মাথা ঘুরে টলে' পড়ে—এবং চোখ বুজে অন্ধকারে পড়ে' থাক্‌তে চায়।

৪। চোখে যদি ঝাপসা দেখে, কম দেখে, সর্ষেফুল দেখে।

৫। হাত-পা-মুখ যদি ফুলে ওঠে। পা উঁচু করে' রাখলে ফোলাটা একটু কমে, কিন্তু একেবারে সেরে যায় না।

৬। চার মাসের পরও ক্রমাগত কোষ্ঠবদ্ধতায়, বমনে, অম্লে ও পেটব্যথায় কষ্ট পেতে থাক্‌লে।

৭। পরিমাণে ও বারে যদি প্রস্রাব ক'মে যায়, যদি প্রস্রাবের রঙ্ ধোঁয়াটে, গাঢ় হল্‌দে বা ফিঁকে খয়েরি হয়, প্রস্রাব পরীক্ষা ক'রে যদি তার মধ্যে চিনি, অ্যালবুমিন, অক্সেলেট, কাস্ট, পুয়াণু (pus-cells), বেশী ফস্ফেট, ইণ্ডিকান্ প্রভৃতি দেখা যায়।

৮। যখন যোনিনালী দিয়ে রক্ত পড়্‌তে থাকে; অথবা রক্তমিশ্রিত সাদা স্রাব নির্গত হতে থাকে।

৯। মাঝে মাঝে ঘুয্‌ঘুষে জ্বর, কাশি হতে থাক্‌লে।

১০। যখন হাতে-পায়ে অবিশ্রান্ত খিল ধরতে থাকে, গর্ভিণী

মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাবার মতো অবস্থায় আসে, অথবা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে।....

প্রসবের পাঁচ সাত দশ বারো দিন আগে থেকে সমস্ত প্রসূতিরই যোনিনালী থেকে একটু একটু করে' অত্যন্ত আঠালো লালা বেরোতে থাকে। এই লালা কতকটা ডিমের শ্বেতলালার মতো; কিন্তু শ্বেত-লালার চেয়ে বেশী আঠালো ও ঘোলা, প্রায়ই ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়। ক্বচিৎ কারো স্রাবে ঈষৎ রক্তের মিশ্রণ থাকায় গোলাপী রঙের দেখায়। এতে ক'রে প্রকৃতি যোনিনালীটিকে সন্তান-নির্গমণের জন্য যথোচিতভাবে প্রশস্ত ও প্রস্তুত করে' দেন। তখন শরীর অত্যন্ত অবসন্ন ও ভারি বোধ হয়; উঠ্‌তে-বস্‌তে-নাইতে-খেতে ইচ্ছে করে না। পেটের মধ্যে বেশ অসোয়াস্তি বোধ হয়। ভ্রূণটি পূর্ণাঙ্গ শিশুর আকার পেয়ে এক নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে অবস্থান করে বলে' পেটের মধ্যে আঁট্-আঁট্ বোধ হয়। মাঝে মাঝে পেটের মধ্যে কন্‌কন্ করে।.... এগুলো ব্যথার পূর্বলক্ষণ!....

গর্ভকালে সহবাস-বিধি

আজকের বৈঠক শেষ করব বলে মনে কচ্ছি, এমন সময় তোমাদের মধ্যে দু'তিন জন আমার কাছে এসে চুপিসাড়ে আমার একটা মস্ত ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ত্রুটি খুব প্রকাণ্ড রকমেরই বটে। আচ্ছা, তাহলে দু'তিন মিনিট বোসো তোমরা; ত্রুটিটা সেরে নিই আমি। তোমাদের কেউ কেউ আমার জিজ্ঞাসা করেছে—গর্ভকালে সহবাসের নিয়ম কি! দু'চার কথায় সেটা বলে দিচ্ছি তোমাদের। গর্ভের প্রথম মাসটা তো কেউ বুঝতেই পারে না যে, গর্ভ হ'ল। সে মাসটা যেমন সহবাস চলে, তেমনি চল্‌তে থাক্‌বে। দ্বিতীয় মাসেও তাই। তৃতীয়-চতুর্থ মাসে একটু কমিয়ে দেবে। তৃতীয়-চতুর্থ মাসে এর

আগে যাদের একটা কি দুটো গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা একেবারে বন্ধ না রাখতে পারলেও খুব কমিয়ে দেবে। সাত মাস গর্ভ পর্যন্ত অল্প অল্প চালিয়ে যেতে পার, তারপর একেবারে বন্ধ রাখবে—প্রসবের পর দু'মাস থেকে আড়াই মাস পর্যন্ত। বুঝলে?

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসে স্ত্রীলোক চিৎ অবস্থায় স্বামিসঙ্গম করবে না। দুজনে পাশ ফিরে মুখোমুখী হয়ে করবে। অথবা স্ত্রীলোক স্বামীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে উরু ও হাঁটু দ'য়ের আকারে একটু বাঁকিয়ে রাখবে—স্বামী পেছন দিক থেকে সন্তর্পণে উপসর্পণ করবে। এই সময় পেটের ওপর বেশী চাপ পড়া কোনক্রমেই উচিত নয়। অষ্টম, নবম ও দশমের প্রথমাংশে রমণ করলে অনেক সময় প্রসূতি-প্রসূত দুজনেরই নানারকম রোগ হবার ও প্রসবে বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে।

সমস্ত জন্তুরাই গর্ভের আগাগোড়া রমণবিতৃষ্ণ থাকে। দেখ, এ বিষয়ে মানুষ পশুর চেয়ে সভ্য নয়!

একাদশ আলাপন

প্রসবের জন্য প্রস্তুতি

সর্বদা স্মরণ রেখো, ন' মাস দশ-পনেরো দিনের বেশী কোন শিশুই বড়-একটা পেটে থাকে না। লাখে একটা থাকতে পারে। আবার সাত মাসে, আট মাসে, ন' মাসেও প্রসব হতে পারে। কিন্তু তার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম।

এক গর্ভে দুই বা ততোধিক সন্তান

কারো পেটে যমজ বা যমক সন্তান জন্মায়। কারো পেটে তিনটে চারটে পাঁচটা সন্তান একসঙ্গে জন্মাতে পারে। হিসেব করে' দেখা গিয়েছে, প্রতি নব্বইটি গর্ভিণীর মধ্যে একজন যমক সন্তান প্রসব করে। যে একবার যমক সন্তান প্রসব করে, তার পেটে আবার যমক হবার সম্ভাবনা থাকে। দশ হাজার গর্ভিণীর ভেতর একজনের পেটে একসঙ্গে তিনটি সন্তান জন্মাতে পারে। যমজের দুটি সন্তানই প্রসবের পর বেঁচে যেতে পারে, মারা যেতে পারে, অথবা একটি বাঁচতে পারে। একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসূত হলে' প্রায়ই বাঁচে না। চারটি, পাঁচটি সন্তান একত্র জন্মানোর সংবাদ হয়তো মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তোমরা পড়ে থাকো।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা কচ্ছ কি উপায়ে একই গর্ভে দুটো সন্তান জন্মাতে পারে। ওদের একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী হয় কিভাবে?

উত্তরটা খুব সোজা।....ঠিক যে মুহূর্তটিতে একটি স্ত্রী-অণ্ডাণুর বুকে একটি পুং-শুক্রাণু প্রোথিত হয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যদি আর

একটি শুক্রাণু সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকে পড়ে, তাহলে যমজের সূত্রপাত হয়। এইভাবে একসঙ্গে একই মুহূর্তে তিনটি, চারটি, পাঁচটি শুক্রাণুও স্ত্রী-অণ্ডাণুকে নিষিক্ত করতে পারে; তখন গর্ভে তিনটি, চারটি, পাঁচটি সন্তান একসঙ্গে তৈরি হয়। এক্ষেত্রে সন্তানদ্বয় বা সন্তানগুলি হয় সব পুরুষ নয় সব স্ত্রী হবে। তদুপরি দুটি বা ততোধিক ভ্রূণ একই ভ্রূণচ্ছদার মধ্যে বর্ধিত হতে থাকবে, প্রত্যেকের মাঝখানে কেবল একটি পাৎলা চাদরের মত প্রাচীর গড়ে' ওঠে। ওদের নাভীরজ্জু অবশ্য দুটো বা তার বেশী হবে, কিন্তু ফুল থাকবে একটা।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, প্রতি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ উনত্রিশ দিনের মাথায় একদিকের অণ্ডাশয় (ovary) ভেদ করে' একটি করে' অণ্ডাণু অণ্ডাণুপ্রবা নামক সরু নালীর মধ্যে উঠে আসে; তার মধ্যে এসে সে আরো খানিকটা রূপান্তরিত ও বর্ধিত হয়। এখন, ক্বচিৎ এমন ব্যাপারও ঘট্‌তে পারে যে, কোন চান্দ্রমাসের একই দিনে দু'দিকের অণ্ডাশয় থেকে দু'টি অণ্ডাণু বেরিয়ে পড়ে' দু'দিকের অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে এসে হাজির হ'ল। তারপর তারা প্রায় একই সময়ে বা কিছু আগে-পিছে দু'টি শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হ'ল এবং শেষে জরায়ুগাত্রের দু' জায়গায় উপ্ত হ'ল। এইভাবে দুটি নিষিক্ত অণ্ডাণু থেকে যে দু'টি ভ্রূণের উৎপত্তি হয়, তারা প্রায়ই একটি স্ত্রী একটি পুরুষ হয়; কদাচিৎ দু'টিই স্ত্রী অথবা পুরুষ হ'তে পারে। এদের দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ভ্রূণচ্ছদা (বা পানমুচি) হয়। দুটো আলাদা ফুল তো হবেই।

যমজ সন্তানদ্বয় একগর্ভে একটি সন্তানের চেয়ে আকারে ও ওজনে ছোট না হয়ে' পারে না, এটা সহজেই বুঝ্‌তে পারো। আবার, যমজের একটি আর একটির চেয়ে বড়-ছোট হতে পারে; জন্মকালে একটি অপরটির চেয়ে ওজনে আধ সের থেকে আড়াই পোয়া পর্যন্ত কম হতে

দেখা যায়। গর্ভে যমজের একটি দু'তিন মাসের মধ্যে বিকৃত, শুষ্ক ও নষ্ট হয়ে গিয়ে অপরটিকে পুরোপুরি বাড়ার সুযোগ করে' দিতে পারে। যমজ হয়েছে কিনা সাড়ে-চার মাস গর্ভের পর অতি সহজেই জানা যায়। তখন নাভীপ্রদেশ পর্যন্ত উত্থিত জরায়ুর দু' জায়গায় কান দিয়ে বা স্টেথস্কোপ বসিয়ে দুটি ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট শোনা যায়। তা'ছাড়া ছ' মাস থেকে ভ্রূণের দুটো মাথা পেটের ওপর হাত দিয়ে মোটামুটি বেশ টের পাওয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে কারো কারো হয়তো ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে—দুটো যমজ ছেলে বুঝি একই সময়ে একসঙ্গে জরায়ুমুখ থেকে ও যোনিনালীপথ দিয়ে বেরোয়। কিন্তু এ পর্যন্ত এরূপ দুর্ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো সংঘটিত হয় নি। যমজের একটি আর একটির আধ, এক, দুই, তিন ঘণ্টা আগে-পরে প্রসূত হয়; ক্বচিৎ কোনটা তার চেয়েও আগে-পাছে ভূমিষ্ঠ হ'তে পারে।

ছেলে না মেয়ে

তোমাদের মধ্যে একজন আমায় প্রশ্ন করেছে—কি করে' পুত্র অথবা কন্যা গর্ভে আসে।...

নিষিক্ত একটি অণ্ডাণু জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হয়ে কি করে' স্বচ্ছেদব্যাপনের দ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা একটু স্মরণে আনার চেষ্টা করো। অণ্ডাণু যে মুহূর্তে শুক্রাণু-দ্বারা নিষিক্ত ও পরিবিদ্ধ হয়, সেই মুহূর্তেই বিধাতার এক দুর্জ্ঞেয় নির্দেশে তার লৈঙ্গধর্ম্ম (sex) নিদিষ্ট হয়ে' যায়। কিন্তু গর্ভাধানের আদিম অবস্থায় ভ্রূণ থাকে অস্পষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য এক ক্ষুদ্রতম বিন্দুরূপে। তারপর সে প্রথম মাসের শেষে একটি পায়রার ডিমের মতো বড় হয়। তখন তাকে দেখায় একটি কাদার দলার মতো, তা থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পষ্ট আভাস পাওয়া

যায় না। তৃতীয় মাসের প্রথম থেকে তার প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দানা বাঁধ্‌তে থাকে এবং শেষাশেষি সেগুলো স্ফুটতর হয়। এই সময়ে তার লিঙ্গচিহ্নও প্রকাশ পায়।

কি উপায়ে স্ত্রী বা পুরুষ ভ্রূণ হয়, তা নির্ধারণ করার জন্যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান ও অনুমানের অন্ত নেই। কিন্তু নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। স্থিরসিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারেন নি। সে সব থিওরির বিবৃতি দিয়ে—ব্যাখ্যা করে' তোমাদের সময় নষ্ট করব না; কারণ সে জ্ঞান তোমাদের কোন কাজে আস্‌বে না।

কেবল আধুনিকতম দুটো থিওরির কথা একটু খুলে বলি তোমাদের। একটা থিওরি হ'ল এই যে, অণ্ডাণুরা স্রেফ্ লৈঙ্গধর্ম-শূন্য (sexless); শুক্রাণুদের একদল হয় পুংলিঙ্গধর্মী ও আর একদল হয় স্ত্রীলিঙ্গধর্মী। যখন যে ধর্মী শুক্রাণু অণ্ডাণুকে নিষেক করে, তখন ভ্রূণে সেই ধর্মই উপ্ত হয়ে' যায় এবং তৃতীয় মাসে তদনুযায়ী লিঙ্গচিহ্ন ফুটে ওঠে।....জার্মানির অধ্যাপক উনটের্বের্জের এই মতবাদকে আর একটু এগিয়ে দিয়ে নিখিল নরনারীর চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে অনেকখানি স্তব্ধ ও তুষ্ট করে' দিয়েছেন। তিনি বল্‌লেন, সব নারীর যোনিনালীর স্বভাবনিঃস্রাবী রস অল্পবিস্তর অম্লধর্মী, পুরুষের বীর্য অল্পবিস্তর ক্ষারধর্মী। একই স্ত্রীলোকের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন খাদ্য-গ্রহণের ফলে যোনিনিঃস্রাবের অম্লত্বের তারতম্য ঘটে; পুরুষের বীর্যেরও ক্ষারত্বের ঐ অবস্থা হয়। যে সব স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়, তাদের ভগনিঃস্রাব এতদূর অম্লধর্মী যে, বীর্য ক্ষরিত হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই তার ক্ষারত্ব প্রশমিত হয়ে যায়, নতুবা অম্লধর্ম প্রবল থেকে যায়।

শুক্রাণুগুলি একটু বেশী ক্ষারের মধ্যে যেমন তাজা তেমনি কর্মিষ্ঠ থাকে, অল্প ক্ষারে খানিকটা নির্জীব হয়; কিন্তু অল্পবিস্তর অম্লের সংস্পর্শে

এলে একেবারে নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। উনটের্বের্জের সাহেব নানা তথ্যনজির হাজির করে' বল্‌লেন যে, কোন স্ত্রীলোকের যোনিরস বীর্যনিক্ষেপের পর যদি ঈষৎ ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে, তাহলে শুক্রাণুগুলি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গধর্মী হয়; যদি তা' একটু বেশী ক্ষারধর্মী হয়ে পড়ে, তাহলে শুক্রাণুগুলি সমস্ত পুংলিঙ্গধর্মী হয়। যারা স্বভাবত বন্ধ্যা, পুরুষ সংযোগের পূর্বে তাদের যোনিনালির মধ্যে ক্ষারধর্মী ওষুধ বার কয়েক প্রয়োগ করে' দেখা গেছে অনেকেরই বন্ধ্যাত্বের দুর্নাম আর বহন করতে হয় না। এবং এদের বেশীর ভাগই পুত্র-সন্তান প্রসব করে।

গর্ভরোধ করা যায় কিসে

কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা এখানে না উল্লেখ করে' পাচ্ছি না। এই পর্যবেক্ষণ-ফল থেকে আমরা আর একটা সত্যকে টেনে বার করতে পারি অতি সহজেই। সেটা হ'ল এই। কৃত্রিম উপায়ে যদি বন্ধ্যাকে সন্তানবতী করা যায়, তাহলে সন্তানবতীকে বন্ধ্যা করাও কিছু দুঃসাধ্য নয়। জন্মশাসনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হ'ল—বীর্যমধ্যস্থ অসংখ্য শুক্রাণুগুলির একটিকেও জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং ক্ষরণের পর যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলিকে নিঃশেষে নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ করে' দেওয়া। সকল স্ত্রীলোকেরই যোনির স্বাভাবিক নিঃস্রাব ঈষৎ অম্লধর্মী। যাদের নিঃস্রাব অতি ক্ষীণভাবের অম্লধর্মী অথবা ঈষৎ ক্ষারধর্মী তাদের অনায়াসে গর্ভোৎপাদন হয়; শেষোক্তাদের বহু সন্তানের জননী হবার সম্ভাবনা থাকে। কৃত্রিমভাবে যোনিনালীর অম্লত্ব ভালোমত বাড়িয়ে দিলে, তার সংস্পর্শে শুক্রাণুগুলি আসামাত্র মারা পড়ে। তা'ছাড়া কুইনাইন্, চিনোসল, ফট্‌কিরি প্রভৃতি ওষুধের সংস্পর্শে এলেও ওরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এইজন্যে সঙ্গমের অব্যবহিত পূর্বে পরিধেয় নানা আকার ও শ্রেণীর রবারের খাপ ব্যতীত কয়েকপ্রকার দ্রবণীয় বটিকা, চাকৃতি, মলম, দ্রব প্রভৃতি বেরিয়েছে যার প্রধান উপকরণই হ'ল পূর্বোক্ত ওষুধগুলি অথবা কোনরূপ টক্ জিনিস। ন্যাকড়ায়, নরম স্পঞ্জে বা তুলোর থোপনা যে কোন রকমের ঈষৎ টক্ জিনিসে ভিজিয়ে সহবাসের পূর্বে যদি যোননালীর শেষপ্রান্তে গর্ভাশয়ের মুখের সামনে রাখা যায়, তাহলে গর্ভনিবারণ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়। বোরিক অ্যাসিড্ পাউডার, ফট্‌কিরির দ্রব, সামান্য অম্লাস্বাদ তেঁতুল-ভিজোনো জল, দইয়ের জল, লেবুর জল, ভিনেগার মিশ্রণ প্রভৃতির দ্বারা জন্ম-শাসনের উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে।....যাহোক্, এ বৈঠকে এ বিষয়ে বেশী কিছু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। আমার "জন্ম-শাসন" বইএ এ সম্বন্ধে সবিস্তার অনুশীলন করেছি। অন্তত একটি ছেলে হবার পর তোমরা পোড়ো বইখানা। এখন নয়।

প্রসবের জন্য প্রস্তুতি

সাত মাসের পর থেকে প্রসূতিকে প্রস্তুত হবে প্রসবের জন্যে। প্রস্তুত হতে হবে দেহে ও মনে। দেহে যাতে অন্য কোন রোগ দেখা না দেয়, দেহ যাতে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি কর্মঠ, সুস্থ ও সবল থাকে, তার জন্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অনেকেরই এই সময় শরীরের শক্তি অল্পবিস্তর হ্রাস পায়, অবসাদ ও আশঙ্কায় দেহমন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। শিশু-সমেত জরায়ু ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ভেতরের অন্য সমস্ত যন্ত্রকে (যথা, য়কৃৎ, প্লীহা, মূত্রস্থলী, অগ্ন্যাশয় বা pancreas, বৃক্কদ্বয় বা kidneys, পাকাশয় বা stomach, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতিকে) অল্পবিস্তর ঠেসে ধরে। আট মাসের গোড়ার দিকে জরায়ুর মাথার

দিক্‌টা বুকের কড়ায় (বুকের মাঝখানে হাড়ের ফলা বা *sternam*-এর নিম্নাংশে) এসে ঠেকে।

তখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ হয়, নিঃশ্বাস নিতে, চলতে-ফিরতে কষ্ট বোধ হয়, উরুদুটো ভার-ভার বোধ হয়, হাতে পায়ে মাঝে মাঝে খিল ধরে—ঝেঁজি ধরে; কারো কারো হাত-পা-মুখ অল্পবিস্তর ফোলে, মাথা ধরে, প্রস্রাব কমে, (কেউ কেউ বারে বারে অল্প অল্প প্রস্রাব করে,) রীতিমত কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় (কারো কারো বারে বারে বেগ আসে ও অল্প-অল্প মলত্যাগ হয়)। সেইজন্য আট মাসে পড়লেই গর্ভিণীর প্রস্রাব ১৫ দিন অন্তর কোন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করানো এবং পরীক্ষার রিপোর্ট পারিবারিক চিকিৎসককে দেখানো উচিত। বিশেষভাবে যে-সকল উপসর্গের আগে উল্লেখ করলুম, এগুলোর অধিকাংশ যখন বেশী মাত্রায় দেখা দেবে, তখন প্রস্রাব ১০।১২ দিন অন্তর পরীক্ষা করানো একান্ত আবশ্যক। এর যেন অন্যথা না হয়। অ্যালবুমিন্ বেশী মাত্রায় প্রস্রাবে ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ গর্ভিণীর চিকিৎসা করাতে হবে।

যাহোক্, গর্ভিণীকে অল্পসল্প অসাচ্ছন্দ্য ও অসুস্থতা নিয়েও শেষ পর্যন্ত কাজে লিপ্ত থাকতে হবে এবং একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে হবে। খানিকক্ষণ ধরে' বসা কাজ করবে, তারপর খানিকক্ষণ হেঁটে কোন কাজ করতে পারো তো ভালো, নইলে শুধু বেড়িয়ে বেড়াবে। সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ একনাগাড় অনেকক্ষণ না করাই ভালো। খবরের কাগজ পোড়ো; ধর্মগ্রন্থ-কাব্য-উপন্যাস, রসরচনা, গল্পের বই পোড়ো; কিন্তু ডিটেক্টিভ উপন্যাস বা ভূতের গল্প নয়। দরকার হলে ঘর ঝাঁট দেবে, ২।১ খানা থালাবাসন মাজবে, কাপড়জামা জল-কাচা করবে (কিন্তু সাবধান, ক্ষারে বা সাবানে আছড়ে কাচবে না); মাছ-তরকারি কুটবে (কিন্তু বাটনা বাটবে না), কাপড় কোঁচাবে, ঘর

গোছাবে, বইয়ের আলমারি ঝাড়বে, খাবার তৈরি করবে, ২।১টি পদ রাঁধবে, একটু আধটু পরিবেষণ করবে—ছোট খাটো ফাইফরমাস খাট্‌বে। এসব করবে ব্যথা ওঠার আগে পর্যন্ত।

হাসপাতালে না বাড়ীতে

আট মাস পড়তে না পড়তেই বাড়ির লোকে নিশ্চিতভাবে স্থির করে' ফেল্‌বে—বউ কোথায় প্রসব করবে, হাসপাতালে না বাড়িতে। প্রথম-পোয়াতিরা আগে শতকরা নিরনব্বই জনই পাঁচ মাস থেকে সাত মাসের মধ্যে বাপের বাড়ি চলে' যেত প্রসবের জন্যে। এখনো পল্লীগ্রামে সেই প্রথা প্রায় সমভাবে চল্‌ছে। কিন্তু যারা বড় বড় শহরে বাস করে, তাদের শ্বশুরবাড়ি অন্য কোন শহরে না হলে' সাধারণত বউদের প্রসব করার জন্যে সেখানে পাঠায় না। পাঠানো উচিতও নয়। যাদের একলার সংসার অথবা সংসারে একটি মাত্র বৃদ্ধা আত্মীয়া আছেন, তারা শহরবাসী হলে এবং সেই শহরে কোন হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা থাক্‌লে, তাদের বউদের হাসপাতালে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত।

আজকাল শহরবাসী ধনী পরিবারের মেয়ে-বউরাও দলে দলে হাসপাতালে গিয়ে খালাস হয়। অল্পশিক্ষিতা গৃহস্থ কুলবধূদের হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা আতঙ্কমিশ্রিত প্রতিকূল ধারণা আছে। সাধারণ রোগী সম্বন্ধে আজকাল হাসপাতালে শুশ্রূষা ও চিকিৎসার যতখানি ত্রুটিবিচ্যুতির অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, ততখানি প্রসূতি সম্বন্ধে শোনা যায় না। অবশ্য প্রসূতির ভিড় হলে এবং তদনুপাতে সেবিকা ও প্রসবকারকের সংখ্যা অল্প হলে কিছু অযত্ন ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি সেখানে প্রসবকার্য গড়পড়তা গৃহস্থবাড়ির চেয়ে ঢের বেশী উন্নততর পদ্ধতিতে, নির্ঝঞ্ঝাটে ও স্বল্পব্যয়ে সাধিত হয়।

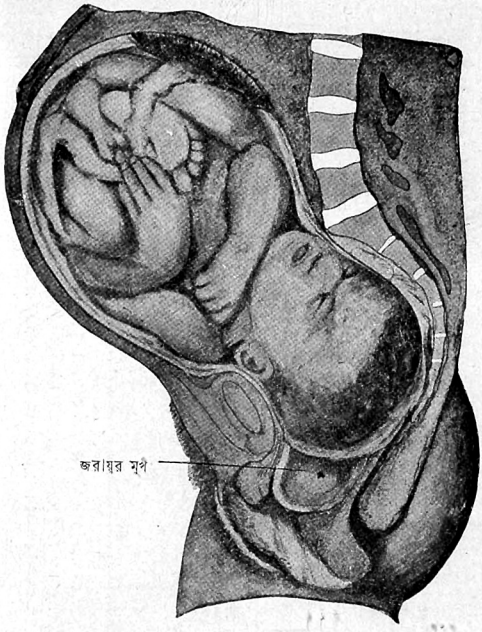

একটি প্রায় পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেটটির বেশী অর্দ্ধেক ও পেটের ছেলেটিকে পুরো বজায় রেখে ও কম অর্ধেকটা যদি লম্বালম্বি চেরা যায়, তাহলে এই রকম দেখায়। লক্ষ্য করে' দেখ—পানমুচির দুটো পর্দা, ফুলের একাংশ, যোনি নালী ও যোনি-বহির্ভাগের অধিকাংশ ; নালীর শেষপ্রান্তে দুটো হাড় ; প্রসবকালে ছেলের মাথা, কাঁধ, পাছা এইখানেই আট্‌কায়।

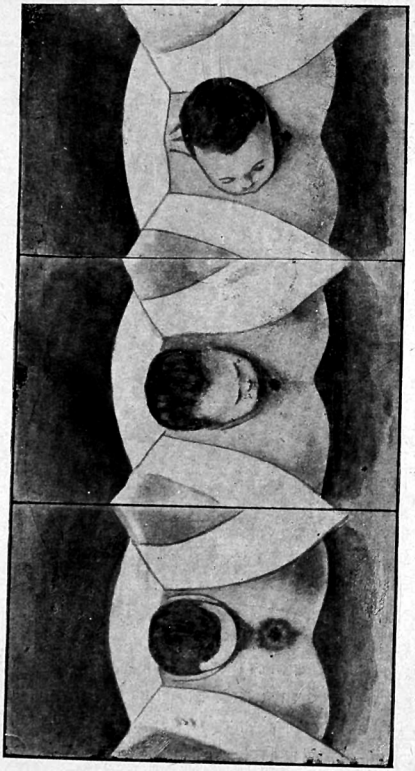

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছেলের কপাল মাথা ও আগে বেরোয়। জরায়ুর মধ্যে তার সমস্ত দেহটা থাকে এক কাতে, বেরোয়ও একপাশে হয়ে। কিন্তু যোনিদ্বার দিয়ে যখন মাথাটা বেরোয়, তখন ওটা গলা থেকে একটু মোচড় খেয়ে মাটির দিকে মুখ করে' বেরোয়। গলা বেকলে মাথাটা আবার বেঁকে ঠিক হয়ে যায়। ১১৪ পৃষ্ঠা।

প্রসবকার্যে কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভিণীর বিপদাপদ ঘটতে পারে, কাউকে কাউকে অজ্ঞান কোরে বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে প্রসব করানোর দরকার হতে পারে। এসব কাজ হাসপাতালে ছাড়া বাড়িতে হওয়া যেমন দুষ্কর তেমনি ব্যয়সাধ্য।

কল্‌কাতা, হাওড়া ও অন্যান্য জেলা-শহরে ভালো ভালো হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদনে সাধারণত বিনামূল্যে প্রসব করানো হয় এবং প্রসবের পর পোয়াতিকে তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত রাখা হয়। বেদনার সূত্রপাতে হাসপাতালে পাঠাবার নিয়ম। যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁরা হাসপাতালে বা প্রসূতি-সদনে পৃথক কামরা ভাড়া কোরে প্রসূতিকে রাখতে পারেন। কামরা-নিবাসিনী প্রসূতিদের প্রতি সেবিকা ও চিকিৎসকেরা একটু বেশী রকমের নজর দেন্। কামরা ভাড়া নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এক মাস পর্যন্ত প্রসূতিকে রাখা চলে। কল্‌কাতা ও হাওড়ার কোন্ কোন্ হাসপাতালে প্রসূতিদের বিনামূল্যে শয্যা দিয়ে প্রসব করানো হয়, তার নাম-ঠিকানা এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রাপ্তব্য যে সব শিক্ষিতা দাই মিউনিসিপ্যাল্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত আছে, তাদের ঠিকানা এই বইয়ের শেষের দিকে তালিকা কোরে দেওয়া হল।

যে সব পোয়াতি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজি নয়, যাদের স্বামীর অর্থসাচ্ছল্য আছে—সংসারে একাধিক তত্ত্বাবধায়িকা আছে, তাদের অগত্যা বাড়িতে প্রসব করানোর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যদি তোমাদের কেউ পল্লীর অধিবাসী হও এবং এক মাইলের মধ্যে যদি প্রসূতি-হাসপাতাল না থাকে, তাহলে তোমাদের প্রসবের ব্যবস্থা বাড়িতেই করতে হবে। ন' মাসের প্রথমেই গ্রামের বা গ্রামান্তরের একজন ভালো দাই আগে থেকে ঠিক কোরে রাখা চাই এবং প্রত্যাশিত প্রসব-সময়ের কয়েক দিন আগে তাকে এনে একবার প্রসূতিকে

দেখানো চাই। এমনো হ'তে পারে যে, যে সময় লাগাৎ প্রসব হবে বলে' গিন্নিরা আশা কচ্ছেন, প্রসববেদনা হয়তো তার আগেই এসে পড়্‌ল।

প্রসব করানোর সাজসরঞ্জাম

বাড়িতে প্রসব করাতে পেলে, আট মাসের মাঝামাঝি থেকেই নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ কোরে রাখা দরকার। প্রসবের সময় ও ঠিক পরেই এগুলো কাজে আসবে। অবশ্য শিক্ষিত দাই মাত্রেই এসব জিনিসের খবর জানে; এবং আগে থেকে তাদের কাউকে প্রসূতিকে দেখাবার জন্যে নিয়ে এলে, তারাই হয়তো এই ধরণের একটা ফর্দ দিয়ে যাবে। কতকগুলি জিনিস তারাও সঙ্গে কোরে আনে।

১। 'বোরিক গজ'—৪ গজ।

২। বোরিক কট্‌ন্—১পাউণ্ড।

৩। "লাইসল্" বা "ডেটল"—২ আউন্স।

৪। গায়ে মাখার ভাল সাবান ১ খানা।

৫। টিংচার আইওডিন—১ আউন্স।

৬। *Neo-Gynergen* tablets (২৫টা বা ৩২টা); তদভাবে "লাইকর আর্গট্"—১ আউন্স।

৭। সাইনল্ লিকুইড্ সোপ ১ শিশি; অথবা কার্বলিক সাবান ১খানা।

৮। বোরিক পাউডার ১আঃ।

৯। বেবি ট্যালকাম পাউডার (গায়ে মাখ্‌বার) ১ প্যাকেট্।

১০। পোয়াতির পরবার জন্যে ২খানা কাপড়, ২টা সেমিজ বা সায়া।

১১। একটা পাৎলা ছোট তোষক, ২খানা বিছানার চাদর, একটা বালিশ; মশা থাকলে একটা ছোট মশারি; শীতকাল হলে ওয়াড়-দেওয়া কম্বল একখানা কি দু'খানা।

১২। খালাস হবার সময় পোয়াতির ব্যবহার্য একখানা দেড় বা দু' গজ লম্বা পউনে এক গজ বা এক গজ আন্দাজ চওড়া অএল্ ক্লথ

(পুরোনো ও গরম সাবানজলে মোছা হলেও চল্‌বে।) তদভাবে দু'খানা বড় আস্ত প্যাকিং পেপার (প্রসূতির কোমরের নীচ থেকে পা পর্যন্ত পাতিয়ে দিতে হয়)।

১৩। শিশুর জন্যে এক হাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা একখানা অএল্ ক্লথ, ছোট ৪।৫ খানা ন্যাকড়ার তোষক, ৪।৫ খানা কাঁথা, একটা ছোট মাথার বালিশ, দুটো ছোট পাশ বালিশ; শীতকাল হলে ২খানা ছোট পুরু কাঁথা।

১৪। একটা ডুশ্ দেওয়ার সরঞ্জাম (২ রকমের নল্‌চে)।

১৫। একটা বেড্ প্যান বা তদভাবে বড় পুরু মাটির শরা।

১৬। দুটি অ্যালুমিনিয়ামের অথবা এনামেল্ড্ বড় গামলা—একটীতে ঠাণ্ডা ও অন্যটিকে গরম জল থাকবে। ডাক্তার বা ধাত্রীর হাত ধোওয়ার জন্যে একটি জল-পূর্ণ পাত্র (বাল্‌তি, জ্যগ প্রঃ)।

১৭। একটি জল গরম করার পাত্র (অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, মাজা কড়া বা বড় কেৎলি)।

১৮। আলুমিনিয়ামের কিংবা এনামেল্ড বাটি ২টা।

১৯। রক্ত মোছার জন্যে সাবানে কাচা পরিষ্কার ন্যাকড়া খানিকটা; কিংবা অ্যাব্‌জর্বেণ্ট্ কটন্ ১ পাউণ্ড।

২০। পোয়াতির পেট বাঁধবার (৩ হাত×১ হাত) কাপড় ২টা, ও ২টা কৌপিন্।

২১। ২খানা ছোট তোয়ালে।

২২। ছেলের নাড়ি কাট্‌বার একখানা আগা-মোটা ছোট কাঁচি।

২৩। সেফ্‌টি পিন ১ ডজন।

২৪। ছেলের নাড়ি বাঁধ্‌বার খুব শক্ত ১ গজ সরু ফিতে বা মোটা সিল্কের সুতো। [প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থায় ছোট কাঁচিখানা ও ফিঁতেটা গরম জলে মিনিট পনেরো ফুটিয়ে এক টুক্‌রো বোরিক গজ দিয়ে মুছে, বোরিক তুলোর ভাঁজে ঢেকে রাখ্‌তে হবে।]

২৫। পরিত্যাজ্য গর্ভকুসুম বা ফুল রাখার ও ঢাকার জন্যে এক জোড়া মাটির শরা।

প্রসব হওয়ার দশ-পনেরো দিন আগে, জরায়ু তলপেটের দিকে নেমে যায়; পেটটা তখন যেন নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। পোয়াতি সে সময় খানিকটা সোয়াস্তি পায় এবং কতকটা সহজে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। ঠিক এই সময় বৃহদন্ত্র, মলকোষ্ঠ (rectum) ও মূত্রস্থলীর ওপর জরায়ুর চাপ পড়ায় রীতিমত কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত এবং বারবার অল্প অল্প ক'রে মূত্রত্যাগ হয়। এই সময় বদহজম হওয়ার ফলে ওপর-পেটে ও অন্ত্রের স্থানে স্থানে বিষাক্ত গ্যাস ও মল জন্মিয়ে পেটে বেদনা উপস্থিত হতে পারে। এই বেদনা সত্যিকার প্রসববেদনা নয় (false pains)। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থঘরের অজ্ঞ গৃহিণীরা এইটেকে সত্যি প্রসবব্যথা বলে' মনে কোরে অনেক সময় হৈ চৈ লাগিয়ে দেন্; তাড়াতাড়ি দাই ডাক্‌তে পাঠান্; নইলে পোয়াতিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মিথ্যে প্রসববেদনার লক্ষণাবলী

১। মিথ্যে প্রসববেদনা তলপেট ও ওপর পেটের সমস্তটা অথবা খানিকটা জুড়ে হয় এবং পেটের সম্মুখের দিকেই সীমাবদ্ধ থাকে।

২। ব্যথা ওঠার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একবার জোরে জোরে আসে, একবার মৃদু আসে; কখনো পাঁচ মিনিট, কখনো দশ মিনিট অন্তর, কখনো পনেরো মিনিট অন্তর আসে। মিথ্যে ব্যথা সাধারণত ক্রমশ বৃদ্ধি পায় না।

৩। মিথ্যে ব্যথায় জরায়ুর মুখ সামান্য মাত্রায়ও খোলে না, জরায়ুর গলার দিক্‌টা গুটিয়ে আসে না।

৪। গ্লিসারিন্ সাপোজিটরি (জোলাপ-বাতি) অথবা ডুশ্ দিয়ে বাহ্যে করিয়ে দিলে, পোয়াতি আর ব্যথা বোধ করে না, বরং আরাম বোধ করে। অনেক সময় চুপচাপ্ শুয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে।

সত্যি প্রসববেদনার লক্ষণাবলী

১। সতিকারের প্রসববেদনা পাছার দিক থেকে উঠে পেটের সামনের দিকে আসে; এবং জরায়ুর ওপর দিক থেকে উঠে ঢেউয়ের মতো জরায়ুর নীচের দিকে নামে,—একেবারে যোনিনালীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এসে যেন উরুর দিকে চারিয়ে যায়। বেদনার সময় জরায়ু গুটিয়ে চোঙের মতন আকার ধারণ কোরে খুব শক্ত হয়ে ওঠে, পেটে হাত দিলেই বেশ বোঝা যায়।

২। বেদনা প্রথমে হয়তো আধ ঘণ্টা অন্তর, তারপর পনেরো মিনিট অন্তর, তারপর দশ মিনিট অন্তর, তারপর পাঁচ মিনিট অন্তর আসতে থাকে এবং একমিনিট, দেড় মিনিট কি দু' মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘড়ি ধ'রে দেখা যাবে—সত্যিকার প্রসববেদনা একটা নিয়ম-মাফিক্ আপনাআপনি আস্‌বে। ব্যথা প্রথমটা বেশী সময় ব্যবধানে আসে অল্প অল্প, থাকে অল্পক্ষণ; তারপর কম সময় ব্যবধানে বেশী পরিমাণে আসে, থাকেও বেশীক্ষণ। [সাধারণত প্রথম পোয়াতিদের ব্যথা ওঠে বড় জোর একদিন আগে, খুব কম ঘণ্টা ছয় আগে। যাদের একদিন বা তার বেশী আগে থেকে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প ব্যথা ওঠে, তাদের ব্যথাকে পশ্চিম বাংলায় 'ঘিন্‌ঘিনে ব্যথা' বলে।]

৩। প্রসূতিকে এক কাতে হাঁটু দুমড়ে শুইয়ে তার যোনিনালীর মধ্যে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দেখতে হয়—তার জরায়ুর মুখ খুলেছে কিনা। জরায়ুর মুখ খোলাকে "dilation of the os uteri" (বা সংক্ষেপে os dilate করা) বলে।

[স্বামী বা বাড়ির কোন গিন্নি অথবা ধাত্রী যদি পোয়াতির ভেতর পরীক্ষা করতে চান্, তাহলে তাঁকে নখগুলো বেশ পুঁচিয়ে কেটে নিতে হবে, নখের ডগাগুলোতে আলতা পরার মতো টিঙ্কার

আইওডিন্ মাখিয়ে নিতে হবে এবং হাতটা কার্বলিক সাবান্ বা 'সাইনল্' জাতীয় কোন তরল সাবান দিয়ে বেশ কোরে পরিষ্কার কোরে নিতে হবে।]

প্রথমে গর্ভমুখ ছোটছেলের নাকের ফুটের মতো একটুখানি খোলে, একটা আঙুল ঢোকানো কষ্টসাধ্য। তারপর একটা আংটির ফুটোর মতো হয়, কষ্টেস্থষ্টে আঙুলের ডগাটা ঢুকে যায়। গর্ভমুখের চারদিক দিয়ে যে পেশীর বেড় আছে, সেটা ব্যথা ওঠার সময় শক্ত হয়, আবার ব্যথা জুড়িয়ে গেলে একটু নরম হয়। এই সময় জরায়ুর সরু গলাটা গুটিয়ে জরায়ুদেহের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। মুখটা ক্রমশ এক আঙুল থেকে দু' আঙুল, দুই থেকে তিন আঙুল, এমনি করে' আস্তে আস্তে যখন ৪—৪½ আঙুল পর্যন্ত খুলে যায়, তখনি ওকে "পুরোপুরি খোলা" (full dilation) বলে। তখনি পানমুচি ভেঙে ছেলের মাথা দেখা দেয় জরায়ুর মুখে।....

আজ এই পর্যন্ত। কাল প্রসবের তিন অবস্থার কথা তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌ব।

দ্বাদশ আলাপন

প্রসবের তিনটি ক্রমিক অবস্থা

প্রসবের তিনটি ক্রমিক অবস্থা আছে জেনে রেখে দাও। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রসব-ব্যাপারটি সর্বাঙ্গসুন্দর কোরে বোঝাতে গেলে একখানি বড় বই লিখতে হয়। সে সাধ্য ও সময় নেই আমার, সে রকম বই পড়বারও ধৈর্য হয়তো থাকবে না তোমাদের অনেকেরই। এসম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দেবার মতো সংক্ষেপে স্থূল তথ্যগুলি গল্পচ্ছলে শুনিয়ে যাচ্ছি।

প্রসবের প্রথম ক্রমিক অবস্থা (First Stage)

প্রথম অবস্থাটা প্রসব-ব্যাপারে সব চেয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রথম-গর্ভিণীদের সাধারণত প্রায় ২৪ ঘণ্টা; খুব সুখপ্রসবা যারা তাদের লাগে অন্তত ঘণ্টা ছয়েক। আগেই বলেছি, প্রসববেদনার সূত্রপাত হয় খুব দেরিতে-দেরিতে-ওঠা ব্যথার দ্বারা। প্রথমটা মনে হয় পেটের ভেতরের এক-একজায়গা কুঁচকে বা কুঁকড়ে উঠ্‌ছে। তারপর মনে হয় কে যেন পেটের ভেতর খোঁচাচ্ছে; আবার কখনো কখনো বোধ হয় কে যেন ময়দা ঠাসার মতো ঘুসি দিয়ে ঠাস্‌ছে। শেষদিকটায় খুব ঘন-ঘন ব্যথা ওঠে।

এখন ব্যথাটা কেন হয় বল দেখি?....একজন উত্তর দিল—পেট থেকে ছেলে বের করবার জন্যে অন্তঃপ্রকৃতির প্রয়াস।...কথাটা সত্যি। কিন্তু শারীরতত্ত্বের দিক্ দিয়ে ওর আর একটু ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। ব্যথাটা হয় কিভাবে জানো? জরায়ুর আকারটা মনে আছে বোধ হয়? একটা চ্যাপ্টা কাশীর পেয়ারার মতন অথবা দু'দিক-চাপা খেলার

ঘটের মতন। তোমরা "বিয়ের আগে ও পরে" বইএ ওর ছবি দেখেছ, এ বইয়েও দেখতে পাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ুর যে আয়তন, তার চেয়ে ওর আয়তন বহুগুণ বড় হয়েছে। আকারও কতকটা বদলে গেছে। সরু গলাটা জরায়ুর সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। এক-একটা লোক বেজায় মোটা হয়ে ঘাড়ে-ধড়ে এক হয়ে যায় দেখেছ তো ?

অন্তঃপ্রকৃতি ভ্রূণশিশুর পূর্ণবিকাশকাল-অন্তে তাকে যখন জগতের আলোয় বের করতে চায়, তখন সে করে কি জানো ? জরায়ুর মাথার দিকটা একটু একটু কোরে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গুটোতে থাকে, আর তলার দিকটা অর্থাৎ গলা ও মুখের দিক্‌টা একটু একটু করে' আল্গা করতে থাকে। তাতেই পেটের ভেতর ব্যথা করে। একেই বলে প্রসববেদনা।

আগেই বলেছি, প্রসবের ২।৫ দিন আগে থেকে একরকম চট্‌চটে ঘোলাটে রঙের স্রাব মাঝে মাঝে ভাঙ্‌তে থাকে। বেদনার সূত্রপাতে এই স্রাব ফিঁকে গোলাপী রঙের হয় এবং শেষের দিকে বেশ লাল্‌চে হয়—পরিমাণেও বেশী হয়। বেদনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখ খুল্‌তে থাকে এবং মুখের কাছে শিশুর মাথাটা এগিয়ে আসে। তোমরা আগেই জান্‌তে পেরেছ যে, ভ্রূণদেহ মুখআঁটা থলির মতন আগাগোড়া দু'পর্দা অর্ধস্বচ্ছ চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে। তলাকার চাদরটার নাম "ভ্রূণচ্ছদা", ওপরকার চাদরটার নাম "ভ্রূণপ্রাবরণী।" পশ্চিম বাংলায় এই দু'ভাঁজ চাদরের থলিটিকে বলা হয় 'পানমুচি' ; কোথাও কোথাও বলে 'পোরো'। দুটো পর্দার মাঝখানে সামান্য জল তো জমেই, তাছাড়া থলের মধ্যেও বেশ খানিকটা জল জমে। প্রথম অবস্থার মধ্যেই ওপরকার চাদরের একদিকটা ছিঁড়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় পর্দার তলাটা মাথা-চ্যাপ্টা শক্ত রবারের ঢাকনির মতো হয়ে জরায়ুর মুখের কাছে এগিয়ে আসে। ভেতরের জলটা

বেশীর ভাগই তলার এই দিকটায় এসে জমা হয়। সাধারণত মাথাটা এই জলের পেছনেই আট্‌কে থাকে। আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলে পানমুচির শক্ত জলভরা মাথাটা বেশ টের পাওয়া যায়।

প্রথম অবস্থার শেষভাগে

প্রথম অবস্থার শেষদিকে ব্যথা যখন ঘন-ঘন আসে, তখন পোয়াতি বেশ অস্থির হয়ে পড়ে। অনেক পোয়াতিই দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মুখ বিকৃত করে ; অনেকের মুখ বেশ লাল্‌চে হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ওয়াক্ তোলে, কেউ কেউ বমি করে' ফেলে, কেউ কেউ থর্ থর্ করে' কাঁপতে থাকে ; অনেকেরই বেশ ঘাম হয়। প্রায় সকলেরই বারে বারে প্রস্রাব হয়, কেউ কেউ পায়খানায় যায়, কিন্তু প্রায়ই মল নিষ্কাশিত হয় না। এই সময় প্রসূতিকে ডুশ্ দিয়ে পেট পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

কোন কোন ভয়কাতুরে পোয়াতি খুব চেঁচামেচি করে, শুয়ে পড়ে' ছটফট্ করে, হাত কচ্‌লায়, সুমুখে যা দেখে তাই আঁক্‌ড়ে ধরে। কেউ কেঁদে বলে 'আমার পাছার দিকটা ঠেসে ধর—ফেটে গেল', কেউ বলে 'আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, ওগো দাই ডাক, ডাক্তার ডাক', 'ওগো কিছুতেই তো বেরুচ্ছে না, আর কখন বেরুবে ? আর যে পারি না।'....ইত্যাদি। কিন্তু বেশী চেঁচামেচি করলে যন্ত্রণাটা বাড়ে।

দাই বা ডাক্তার এসে পড়লে, তাঁরা এবং বাড়ির অন্যান্য বর্ষীয়সীরা নিশ্চয়ই তাকে সান্ত্বনা দেবেন। এ সময় ধমক দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। পোয়াতিকে এই সময় খানিকক্ষণ খোলা বাতাসে অল্প অল্প পায়চারি করতে বলা ভালো, তাতে উপকার হয়। এই সময় পোয়াতি ঠাণ্ডা দুধ, ডাবের জল বা গ্লুকোজমিশ্রিত

জল ইচ্ছামত খেতে পারে। যদি পাঁচ ছ' ঘণ্টা কিছু না খেয়ে থাকে, তাহলে তাকে হাল্কা কিছু খাদ্যও খাইয়ে দেবে।

ধাত্রী ও প্রসবঘর

জরায়ুর মুখ পুরোপুরি (অর্থাৎ ৪ থেকে ৪½ আঙুল) প্রসারিত হবার বরং কিছু আগেই, অথবা হঠাৎ অসময়ে পানমুচি ভেঙে জল বেরুলে, গর্ভিণী তার জন্যে নির্দিষ্ট প্রসব-ঘরে এসে বাঁ কাতে শুয়ে পড়বে। যদি বাড়িতে প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এর পূর্বেই ধাত্রী ডাকিয়ে আনা অবশ্যকর্তব্য। তা' ছাড়া যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে' রাখ্‌তে বলেছি, সেগুলো সমস্ত প্রসবঘরে সাজিয়ে রাখ্‌বে। দাই এসে আগে দেখ্‌বে—জরায়ুর মুখ কতটা খুলেছে, পেটের ওপরে হাত চেপে দেখ্‌বে জরায়ুর মধ্যে শিশুর অবস্থিতি সহজ-প্রসবের অনুকূল অবস্থায় আছে কিনা এবং ছেলের মাথা বেরুতে কত দেরি আছে। তাই বুঝে তাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে। প্রথমে সেফ্‌টি রেজর দিয়ে যোনিপ্রদেশের সমস্ত লোম কামিয়ে দিতে হবে; ডুশ দিয়ে বাহ্যে করিয়ে দেবে। কুঁচকি, যোনিদ্বার ধুইয়ে দেবে এবং পেটের ওপর একটা বড় ঝাড়ন বা পুরু কাপড় দু' পাট কোরে চাপা দিয়ে রাখবে।

এই সূত্রে বলে' রাখি, বাড়ির মধ্যে যে ঘরখানি সব চেয়ে ভালো —যাতে রৌদ্র ঢোকে ও বাতাস চলাচল করে, সেখানা যদি ছোটও হয়, তাতেই প্রসবের বন্দোবস্ত যেন করা হয়। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও পাড়াগাঁয়ে অনেক বাড়িতে একটা অন্ধকূপ সদৃশ ঘরে অথবা বারান্দার একপাশ দর্মা দিয়ে ঘিরে অথবা উঠোনের কোণে একটা পঙ্কা ধরণের চালাঘর তুলে, তার মধ্যে আসন্নপ্রসবার স্থান-নির্দেশ করা হয়। শুধু দরিদ্র, কুসংস্কারাপন্ন, মূর্খ লোকদের

কথা বল্‌চি না, শিক্ষিত সচ্ছল ভদ্রলোকদের কথাও বল্‌ছি। মধ্যযুগ-সুলভ নারী-নির্যাতনের মনোবৃত্তিকে তাঁরা আঁতুড়-ঘরের নির্লজ্জ দৈন্যের মধ্য দিয়ে আজো প্রকাশ করেন। এখনো তাঁরা আঁতুড়-ঘরকে ও ঘরের অধিবাসীদের অস্পৃশ্য বলে' বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের মা-পিসী-খুড়ি-দিদিরা সেই বিশ্বাসের নিবন্ত শিখায় ধুনোর ছিটে দেন্।....হায়, আজো আঁতুড়ে ঢুক্‌লে নাইতে হয়!

আমি ধারণা করি যে, আমার শ্রোতা ও পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই যে এই বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয়। আমাকে অবশ্যই বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না তোমাদের যে, আঁতুড়ঘর দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহের চেয়েও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। মানুষের ভালবাসার সমুদ্র-মন্থনের ফলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যেখানে মূর্তি ধরে' সজীব হয়ে নেমে আসে, সে জায়গাকে যারা অবজ্ঞা করার স্পর্ধা করেছে, তারা মনুষ্যত্বহীন শিশ্নোদরপরায়ণ পাষণ্ড ছিল; তারা ধর্ম, সমাজ ও জাতির কল্যাণকে টুঁটি টিপে মার্‌তে চেয়েছিল।.... আসলে প্রাচীনকালের একদল প্রজ্ঞাবান মনীষী চেয়েছিলেন আঁতুড়-ঘরটিকে শুদ্ধ, স্বতন্ত্র ও লোকসমাগমশূন্য করে' রাখ্‌তে কিছুদিনের জন্যে; কারণ প্রসবের পর শিশু ও মাতা অত্যন্ত দুর্বল, ঘাতকাতর ও রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতাশূন্য থাকে। মাতা তিন-চার সপ্তাহকাল বিশ্রাম পাবে, স্বচ্ছন্দ আরামে তার ক্ষয় ও ক্ষতিটুকুকে পূরণ কোরে নিতে পারবে। প্রসবঘর হবে মাতাপুত্রের মধুপুর-দেওঘর, ভূতলের অভিনব স্বর্গখণ্ড!...

জরায়ুর মুখ পুরো খুলে গেলে প্রায়ক্ষেত্রেই ওটা যোনিনালীর সঙ্গে একাকার হয়ে একটা চোঙের মত আকার ধারণ করে। পান-মুচির মাথার দিকের ফুলে-ওঠা জায়গাটা ফেটে গিয়ে জল বেরুতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মাথা জরায়ুদেহের মধ্য থেকে হড়াৎ

কোরে নেমে, হয় জরায়ুর খোলা মুখে এসে, নতুবা জরায়ুমুখের বাইরে যোনিনালীর শেষপ্রান্তে এসে আট্‌কে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে জরায়ুমুখ পুরোপুরি খোলার আগেই পানমুচি ভেঙে জল বেরিয়ে পড়ে। তাতে বেদনার বেগ জুড়িয়ে যায়, ছেলের মাথা বেরুতে বেশী কষ্ট হয় এবং প্রসব সমাধা হতে বিলম্ব ঘটে।

প্রথম অবস্থার এইখানেই ইতি।

দ্বিতীয় ক্রমিক অবস্থা (Second Stage)

দ্বিতীয় অবস্থার প্রারম্ভে পানমুচি ভাঙার ফলে গর্ভিণীর ব্যথা বেশ খানিকটা জুড়িয়ে যায়। সে তখন যেন একটু জিরেন্ নেয়। তার কিছুক্ষণ পরেই আবার একটা প্রকাণ্ড ব্যথার ঢেউ আসে। পোয়াতি কতকটা আপনা-আপনি পেট শক্ত করে', মুখ বুঁজে ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে' সশব্দে কোঁথ্ পাড়তে থাকে এবং এক-একবার লম্বা নিঃশ্বাস টানে আর চুপ কোরে পড়ে থাকে। এই সময় শিশুর মাথা কোঁথের সঙ্গে একটু একটু করে' ভগনালীর ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসে; আবার জিরেনের সময় একটু যেন পিছিয়ে যায়। এই সময় প্রসূতি সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা অনুভব করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এইভাবে ছেলের মাথা যোনিনালীর বাইরে আসে। মাথা বেরোবার সময় মলদ্বার আল্‌গা হয়ে যায় বলে' অনেক পোয়াতির একটুখানি মল বেরিয়ে পড়ে। এই সময় পোয়াতির কোঁথ না পেড়ে মুখ খুলে খুব জোরে চীৎকার করে' ওঠা উচিত।

পেরিনিয়াম্ ফাটার সম্ভাবনীয়তা

যোনিনালীর মাঝামাঝি পথে যখন শিশুর মাথা বাইরে থেকে দেখা যায়, তখন শিক্ষিতা ধাত্রীরা পোয়াতিকে কোঁথ দিতে নিষেধ করেন। অনেক সময় কোঁথ্ না দিলেও এক-একটা ব্যথার ঢেউ এসে আস্তেসুস্থে মাথাটাকে বার করে' দেয়। ঢেউয়ের মতো এক-

একটা ব্যথার দাপট যখন আসে, তখন কোঁথ্ পাড়্‌তে নেই; বরং জিরেনের সময় কোঁথ্ পাড়া ভালো। প্রত্যেক পোয়াতিকে এই কথাটা খুব ভালো করে' মনে রাখতে বলি।...যোনিনালীর সর্বনিম্নের কোণ থেকে মলদ্বারের ধার পর্যন্ত যে ফালি জায়গাটুকু (Perinium, মূলাধারপীঠিকা) আছে, মাথা বেরোবার সময় এই জায়গাটায় খুব চাড় পড়ে ও উপরাংশটা ফুলে চড়্‌চড়্ করে। তাড়াতাড়ি মাথা বের কোরে দেবার জন্যে প্রথম-পোয়াতি যদি জোরে জোরে কোঁথ্ পাড়ে, তাহলে এই জায়গাটা খুব ফুলে উঠে ছিঁড়ে যেতে পারে (Rupture of the Perineum বা Perinial tear)।

পেরিনিয়াম ছিঁড়ে গেলে মলদ্বারের ধার পর্যন্ত যোনিদ্বার প্রশস্ত হয়ে যায়। এমন দুর্ঘটনা হলে ডাক্তারকে দিয়ে পেরিনিয়াম্ সেলাই করিয়ে নিতে হয়। তখনি তখনি হ'লে সেলাই করা ব্যাপারটা ২।৩ মিনিটে ও অত্যন্ত সহজেই নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন মুখ দাই মাথা বেরোবার সময় পেরিনিয়াম বাঁচাতে গিয়ে ঐ জায়গাটা দু' আঙুল দিয়ে টিপে ধরে। তাতে হয় মাথাটা নালীর মধ্যে আটকে থাকে—বেরোয় না, নতুবা আঙুল দিয়ে চেপে ধরা সত্ত্বেও অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে পেরিনিয়াম্ ফেটে যায়। বেশী কোঁথ না দিলে এবং আপনা-আপনি ব্যথার সঙ্গে ধীরগতিতে মাথা বেরুতে দিলে সাধারণত পেরিনিয়াম্ ফাটে না—অল্পে অল্পে পাৎলা ও ঢিলে হয়ে যায়।

পেরিনিয়াম্ যাদের খুব শক্ত ও রবারের মতো ঈষৎ স্থিতিস্থাপক নয়, তাদের পেটের শিশু জরায়ুর ভেতর থেকে মাথা বের করলেই, 'ডেটল', 'লাইসল্' অথবা বোরিক পাউডার-মিশানো গরম জলে তুলো ভিজিয়ে ও নিংড়ে ১০।১৫ মিনিট ধরে' ঐ জায়গাটায় সেঁক্ দিতে হয়। তা' ছাড়া শিশুর মাথা যদি অপেক্ষাকৃত বড় হয় ও বেরোতে খুব দেরি করে, তাহলে কি কৌশলে পেরিনিয়াম্ বাঁচিয়ে মাথাটাকে বের করা

যায়, তা শিক্ষিতা ধাত্রী মাত্রেই জানেন। মাথা বেরোবার পর প্রসবের আদ্ধেক কাজ সমাধা হ'ল মনে করা যায়। এই সময় প্রসূতি খানিকক্ষণ চুপ করে' পড়ে' থাকবে।

শিশু সাধারণত জরায়ুর মধ্যে বাঁ দিকের অথবা ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁসে একদিকে কাৎ হয়ে, মাথা নীচু কোরে অবস্থান করে। সেইজন্যে শিশুর মুখ-সমেত মাথাটা একদিকে ঘোরানো অবস্থায় যোনিনালীর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু যোনিদ্বার দিয়ে বেরোবার কিছু পূর্বে ওর ঘাড়টা সাময়িকভাবে মুচ্‌ড়ে গিয়ে কপাল-চিবুক-নাক-মুখ প্রসূতির মলদ্বার-অভিমুখী হয়ে বেরোয়। তারপর গলা পর্যন্ত মাথা বেরুলে পর মাথাটা আবার পাক খেয়ে পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ এক কা'তে) ফিরে আসে। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বেশ ভালো কোরে বুঝ্‌তে পারবে তোমরা।

এই সময় পর্যন্ত দাইয়ের শিশু-সম্পর্কে তেমন কিছু কর্তব্য থাকে না। কাঁধ বের করার সময় ও পাছা বের করার সময় তাকে শিশুর মাথা, ঘাড় ও ধড় দু'হাত দিয়ে সুকৌশলে ধর্‌তে হয়। জোরে টান্‌বার দরকার হয় না, একটা বিশেষ বিন্যাস-ভঙ্গীতে পেটের দিকে একটু তুলে ধর্‌লেই অল্পায়াসে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে পানমুচির মধ্যকার অবশিষ্ট কিছু জল ও খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।

শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লেই প্রসবের দ্বিতীয় ক্রম শেষ হয়। এই ক্রম ১ ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ৪।৫ ঘণ্টা পর্যন্তও লাগে।

প্রসবে কয়প্রকার বিপত্তি

তোমরা মনে কোরো না যে, সকল মেয়েদের প্রসবের সময় শিশুর মাথা আগে বেরোয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই বটে। ভ্রূণ নানাভঙ্গীতে

জরায়ুর দক্ষিণ বা বাঁ দিকে অবস্থান করে বলে' মাথাও নানা ভঙ্গীতে বেরোয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চিবুক থেকে নাক পর্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে নাক থেকে কপাল পর্যন্ত, আবার কখনো ব্রহ্মতালু থেকে মাথার সর্বোচ্চ প্রান্তভাগ পর্যন্ত অংশটুকু আগে জরায়ু থেকে বেরোয়। সব চেয়ে নির্বিঘ্নে ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রসবকার্য সম্পন্ন হয় যদি আসল মাথার দিকটা আগে বেরোয়। গুটি কয়েক ক্ষেত্রে শিশুর পাছা বা পায়ের দিকটা (Breech বা leg presentation), ক্বচিৎ একদিকের কাঁধ, কখনো বা একদিকের হাত, কখনো বা নাভীরজ্জুর কতকাংশ কিংবা ফুল জরায়ু থেকে আগে বেরিয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে প্রসব করানো রীতিমতো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং খুব অভিজ্ঞা ধাত্রী বা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়।

কোনো কোনো মেয়ের ব্যথা মাঝপথে একেবারে জুড়িয়ে যেতে দেখা যায়। কারো কারো জরায়ুর মুখ এক আঙুল দু' আঙুল খুলে আর খুল্‌তে চায় না। কারো কারো কুক্ষিদেশ (অর্থাৎ তলপেটের প্রায় চতুর্দিকে ছোট-বড় হাড়ের ফলক-ঘেরা জরায়ুর নিম্নাংশ ও যোনিনালীর ঊর্ধ্বপ্রান্তের মধ্যবর্তী pelvic cavity বা বস্তিগুহা) এত ছোট যে, সেখানে ছেলের মাথা, কাঁধ ও ঘাড় রাখার জায়গা থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথে প্রসব করানো এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। *Pituitarin* প্রভৃতি ওষুধের ইঞ্জেক্‌শন্ দিয়ে ব্যথা গাঢ় করা ও জরায়ুর খোলা মুখ দিয়ে ছেলেকে দ্রুত বের কোরে দেওয়া যায়। স্থল-বিশেষে পোয়াতিকে অজ্ঞান করে সাঁড়াশির মতো যন্ত্র(Forceps) দিয়ে ছেলেকে টেনে বার করতে হয়; নতুবা পেট ও জরায়ু কেটে ছেলেকে খালাস কোরে আন্‌তে হয়।

এইভাবে খালাস করায় আজকাল ক্বচিৎ ছেলে বা পোয়াতি মারা যায়; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দু'জনেই বাঁচে। দু' হাজার বছর আগে

ইতিহাসবিশ্রুত রোমীয় দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস্ সিজারকে প্রসব করানো হয় প্রসূতির পেট চিরে। সেক্ষেত্রে প্রসূতি বাঁচেনি, ছেলে বেঁচেছিল। সেই থেকে পেট কেটে ছেলে প্রসব করানোর ইংরাজী নাম Cœsarian section (সিজারিয়ান্ সেক্সন্)।....আমার জানাশোনা তিনটি বউয়ের 'সিজারিয়ান্' হয়েছিল। তারা তিন জনেই জীবিত আছে, পেটের ছেলেমেয়েরাও সুস্থ শরীরে বাহাল্‌তবিয়তে বেঁচে আছে। সিজারিয়ান্ যাদের করা হয়, তাদের ভবিষ্যতে আর গর্ভধারণের ক্ষমতা থাকে না; থাকলেও তা নষ্ট করে দেওয়ার নিয়ম।

কিন্তু এসব দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। তোমাদের কারোর এমন কিছু ব্যাপার ঘট্‌বে বলে' আমি মনে করি না। যদি ঘটেই, তবেই বা ভয় খাবার কি আছে? ভাল হাসপাতালে ভাল ডাক্তারদের কাছে এইসব অপারেশন হয়; প্রসূতিকে আগে থেকে অজ্ঞান কোরে নেওয়া হয়। সুতরাং সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার প্রসবে যে কষ্ট, তার চেয়ে এতে কষ্ট অনেক কম। সভ্যদেশের বড় বড় হাসপাতালে আজকাল এক রকম নিদ্রাকারক ওষুধের ইঞ্জেকশন্ দিয়ে প্রসূতিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে প্রসব করানো হয়, তাতে প্রসববেদনার দরুণ জরায়ু ও যোনিনালীর যে সব সঙ্কোচন-প্রসারণ-ক্রিয়া হওয়া উচিত তা হয়, কিন্তু প্রসূতি কোন বেদনাই টের পায় না।

যাদের কুক্ষির পরিসর স্বভাবত অল্প, যারা চিররুগ্ন ও নার্ভাস্ টেম্পারামেণ্টের মেয়ে, তাদের গর্ভনিবারণ করাই উচিত।

তৃতীয় ক্রমিক অবস্থা (Third Stage)

শিশু সম্পূর্ণ ভূমিষ্ঠ হবার পর পোয়াতি অনেকখানি স্বচ্ছন্দ বোধ করে; কারু কারু কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমের ঘোর আসে। কিন্তু প্রসবের এইখানেই শেষ নয়। তখনো ফুল (গর্ভকুসুম) পড়্‌তে

বাকি। সাধারণত ১৫।২০ মিনিট পরে আর-একটা ছোটখাটো রকমের বেদনা ওঠে। তার পরই ফুল বেরোয়। কোনো কোনো পোয়াতির ফুল পড়্‌তে এক ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হয়। ফুল পড়্‌তে আধ ঘণ্টার বেশী দেরি হলে, নাইয়ের কাছ বরাবর দাই বা সাহায্যকারিণীর যে হাতটা আগে থেকেই রাখা আছে, সেই হাত দিয়ে পেটের ওপর থেকে নীচের দিকে করতালু দিয়ে অল্প অল্প ডল্‌তে হয়; কিন্তু খুব চেপে ধরে' এবং জোরে জোরে নয়। নাভীরজ্জু ধরে' টানা-টানি করাও উচিত নয়। তার ফলে জরায়ুর ভেতরদিকটা উল্টিয়ে যোনিমুখে বেরিয়ে পড়তে ও প্রচুর রক্তস্রাব হ'তে পারে। মৃদুভাবে তলপেট ডলাই-মলাই কর্লে খানিক পরে বোঝা যায় জরায়ুটা গুটিয়ে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। তখন সেটাকে হাতের তালু দিয়ে ধরে' নীচের দিকে অল্প জোরে টিপে দিতে হয়। তার পরই জরায়ুর মুখ দিয়ে ফুল বেরিয়ে আসে। ফুল বেরোবার পরই কিছুক্ষণ ধরে' যোনিপথ দিয়ে এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

ফুলের আকার একখানা ছোট চ্যাপ্টা শরার মত; এক দিকটা এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো, থাঁজ-কাটা ও দলা-পাকানো, অন্যদিকটা প্রায় সমতল। সমতল দিকটার মাঝামাঝি জায়গায় নাভীরজ্জু সংলগ্ন থাকে, আর অসমতল দিকটা জরায়ুর দেওয়ালে আট্‌কানো থাকে। ফুলের সঙ্গে পানমুচির প্রায় সমস্তটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। ফুল বেরোবার সময় ডান হাতে সেটাকে ধরতে হয় এবং একটা শরায় রেখে দিয়ে তার ওপর আর একখানা শরা চাপা দিতে হয়।

ফুল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসবের তৃতীয় ক্রম শেষ হয়ে যায়। ফুল পড়ার আগেই ও শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অল্পক্ষণ পরেই নাড়ি কাটার ব্যাপার আছে; তাছাড়া শিশু ও প্রসূতি সম্পর্কে অনেক কিছু কর্তব্য আছে। সে সব কথা পরের বৈঠকে বল্‌ব।

ত্রয়োদশ আলাপন

প্রসবের পর—শিশু ও প্রসূতি-পরিচর্যা

শিশুর মাথা জরায়ুর মুখ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ধাত্রী বা চিকিৎসক বাঁ হাত পোয়াতির পেটের ওপর রেখে জরায়ুর ঊর্ধ্বাংশকে নিয়ন্ত্রিত করবেন; জরায়ুর ভেতরটা খালি হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ও নীচে নামতে থাক্‌বে, বাঁ হাতটাও সেই সঙ্গে পেটের নীচের দিকে নামতে থাক্‌বে—কোনমতে জরায়ুটা যেন পেটের উপরাংশে উঠে না যায়। কাঁধ বা পাছা খালাস করার সময় ধাত্রীর যখন দু'হাত নিয়োগের প্রয়োজন হয়, তখন আর একজন লোক পেটের ওপর হাত দিয়ে থাক্‌বে। ফুল বেরোনার পরেও ১০।১৫ মিনিট পর্যন্ত হাত সরানো উচিত নয়। ফুল পড়ার পর একখানা চওড়া ন্যাকড়ায় পেট বেঁধে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে হবে।....

গলায় নাভীরজ্জু

শিশুর মাথা ও গলার খানিকটা যখন যোনিদ্বারের বাইরে আসে, তখনই দেখতে হবে নাভীরজ্জু তার গলার চারদিকে জড়িয়ে আছে কিনা। যদি নাভীরজ্জু ঢিলেভাবে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে মাথার ওপর দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হয়। যদি টান্‌টান্ হয়ে থাকে, তাহলে ছাড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে দু'তিন ইঞ্চি ব্যবধানে দু'জায়গায় বেঁধে মাঝখান থেকে কেটে দিতে হয়। নাভীরজ্জু গলায় জড়ানো অবস্থায় থাক্‌তে দিলে, ধড় বেরোবার সময় টান্ লেগে শিশু দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। অবশ্য বেশীর ভাগ শিশুরই নাভীরজ্জু গলায় জড়ানো থাকে না।

ঘড়্‌ঘড়ি ভাঙা ও মুখ পরিষ্কার করা

মাথা ও গলার প্রায় সমস্তটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিশুই কেঁদে ওঠে। যারা কাঁদে না, তাদের তখনি ঘড়্‌ঘড়ি ভেঙে দিতে হয়। 'ঘড়্‌ঘড়ি ভাঙা' কাকে বলে এখুনি জানতে পারবে। আগেই বলেছি, মাথা বেরুবার পর পোয়াতি খানিকক্ষণ জিরেন খায়। ছেলের মাথা ও গলা যথাযথ ভঙ্গীতে আছে কিনা দেখবার আগেই তার মাথার তলায় বাঁ হাতের তালু রেখে দিতে হয়। ডান হাতের তর্জনীর প্রায় আগাগোড়াটায় সমানভাবে পাৎলা কোরে বোরিক তুলো জড়িয়ে নিয়ে, বোরিক লোশনে ভিজিয়ে ও নিংড়িয়ে তাই দিয়ে ওর মুখ ও আল্‌টাক্‌রা পর্যন্ত গলার ভেতরটা মুছিয়ে দিতে হয়। প্রায় শিশু তখনি কেঁদে ওঠে। এরই নাম ঘড়্‌ঘড়ি-ভাঙা।

তারপর আর একটা পৃথক তুলোর স্নুট বোরিক লোশনে ভিজিয়ে তাই দিয়ে কানের পাতা, কপাল, নাকের গোড়া, চোখের কোল, পাতা ইত্যাদি—সমস্ত মুখমণ্ডল পরিষ্কার কোরে ফেলতে হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতো সরু ইঞ্চি তিনেক লম্বা দুটো নতুন কাঠি বেশ কোরে লাইসলে বা ডেটলে ধুয়ে নিয়ে তাতে সামান্য তুলো জড়িয়ে তুলি বানিয়ে নেবে—যেমন টিঞ্চার আইওডিনের তুলি করা হয়। একটা তুলি বোরিক লোশনে ভিজিয়ে ও দু' আঙুলে টিপে নিংড়িয়ে নিয়ে, তাই দিয়ে নাকের ফুটোর আধ ইঞ্চি ভেতর পর্যন্ত মুছে নিয়ে আস্‌তে হবে। ঠিক ঐভাবে আর একটা তুলি ভিজিয়ে ও নিংড়ে নিয়ে কানের ফুটোদুটো মুছে নিতে হয়।

যদি ছেলের চোখের পাতা বোঁজা থাকে, তাহলে তার প্রতি চোখের পাতা একটু উল্‌টে দিয়ে, এক-একটি স্বতন্ত্র তুলোর স্নুট বোরিক লোশনে ভিজিয়ে নিয়ে, তার থেকে এক ফোঁটা বা দু' ফোঁটা

জল চোখের ওপর ফেলে দিয়ে পাতা বুঁজিয়ে দিতে হয়। তারপর ঐ তুলোর নুটি নিংড়িয়ে তাই দিয়ে চোখের পাশ ও কোল্‌টা মুছে নিতে হয়। ছেলে যদি তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হয় অথবা মাথা বের কোরেই কেঁদে ওঠে, তাহলে তার সমস্ত শরীরটা বেরোনো পর্যন্ত এই কাজগুলো স্থগিত রাখা চলে।

যে সকল পোয়াতির গনোরিয়া বা ধাতের ব্যায়রাম আছে, তাদের শিশুর মাথা বেরুবামাত্র চোখের পাতা, কোল প্রভৃতি বোরিক লোশনে পরিষ্কার কোরে, তারপর আগে-থেকে-আনিয়ে-রাখা 1% Silver Nitrate Solution (অর্থাৎ একশো ফোঁটা ডিস্টিল্‌ড্‌ ওয়াটারে এক ফোঁটা অথবা বড় জোর ছোট দু' ফোঁটা সিল্‌ভার নাইট্রেট্‌ নামক উগ্র বিষাক্ত ওষুধের সংমিশ্রণ) প্রতি চোখে এক ফোঁটা কোরে ফেলে দিতে হয়। পরে ভিজে তুলো দিয়ে চোখের পাতা ও কোল মুছে নিতে হয়। যাদের এ ব্যায়রাম থাকে, তাদের যোনিনালীর গায়ে আগাগোড়া এই রোগের বীজাণুপূর্ণ বিষাক্তরস লেগে থাকে। শিশু বেরোবার সময় তার চোখের পাতায় ঐ রস লেগে যায়; সেই রস থেকে দশ-বিশটা গনোরিয়ার বীজাণু চোখের মধ্যে চলে' যায়। তার ফল অতি ভয়ানক হয়। শিশু শৈশব থেকে অন্ধ হয়ে' যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ শিশু এইভাবে জন্মান্ধ হয়ে' গেছে, আজো হাজার হাজার যায়। সেইজন্যে জন্মের অব্যবহিত পরেই উপরোক্ত প্রতি-বিধান নেওয়া উচিত। নইলে এর পরে হাজার চেষ্টা করলেও শিশুর দৃষ্টিশক্তি ফেরানো যায় না।

ছেলে-হাঁপানো

অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেশ জোরে জোরে কেঁদে ওঠে এবং পা ছুড়তে থাকে। সেটা সুলক্ষণ। নাভীরজ্জুতে টান না লাগে এমনভাবে শিশুকে পোয়াতির কাছ থেকে একটু সরিয়ে তার গায়ে

একটা পাতলা কাপড়ের টুকরো বা একখানি ছোট কাঁথা চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। কোন কোন ছেলে জন্মিয়ে কাঁদে না, তারা অজ্ঞানের মতো হয়ে চুপচাপ্‌ পড়ে থাকে। প্রসূতের এই নিঝুম অবস্থাকে এদেশের দাইরা বলে "ছেলে-হাঁপানো।" ছেলে দু'রকমে হাঁপাতে পারে। এক রকম শিশুর মুখ নীল্‌চে রঙের হয়ে যায়, ছেলে মুখ খুলে ও ঠোঁট নাড়িয়ে একটু একটু শ্বাস নেবার চেষ্টা করে; হাতের কব্জি আঙুল দিয়ে টিপে রক্ত-চলাচলের গতি স্পষ্ট টের পাওয়া যায়; হাতপায়ের মাংস মাঝামাঝি রকমের শক্ত ঠেকে। আর এক রকমের ছেলে হাঁপানো আছে। তাতে শিশুর দেহটা সাদা বা ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়, নিশ্বাস পড়ে না—ফেল্‌বার কোন চেষ্টা থাকে না, ঠোঁট নড়ে না। হাতপা নরম তল্‌তলে—ময়দার লেচির মতো মনে হয়। এদের নাড়ী দেখ্‌লে মনে হয় অত্যন্ত ক্ষীণ, একবার হাতঘড়ির মতো টিক্‌টিক্‌ করে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরকম হলে শিশুকে বাঁচানো মুস্কিল। তবু হাল ছাড়্‌তে নেই।

যে সব ছেলে নীলমূর্তি হয়ে যায়, তাদের যদি নাকের ফুটো, মুখবিবর ও গলার অভ্যন্তর থেকে সর্দিবিশ্রিত ময়লা সাফ্‌ করা না হয়ে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি তাই করতে হবে। তারপর নাভী-রজ্জু কেটে নিয়ে তাকে পা দুটো ধ'রে মাথা নীচু ক'রে ঝুলিয়ে পিঠে ও পাছায় মাঝামাঝি রকম জোরে বার কয়েক চাপড় মারতে হবে; পরে তাকে শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে অল্প অল্প জলের ঝাপ্‌টা দেবে। তাহলেই শতকরা নব্বইটি শিশু স্বাভাবিকভাবে শ্বাস ফেলে ও কেঁদে ওঠে। যদি দেখ নাভীরজ্জুর অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে, ছেলেকে পা ধ'রে ঝুলিয়ে দিলে নাভীরজ্জুতে টান্‌ পড়বে না, তখন আগে নাভীরজ্জু কাট্‌বার চেষ্টা না কোরে আগে তার শ্বাসক্রিয়া আন্‌বার চেষ্টা করবে।

এসব কোরেও যদি শিশু না কাঁদে, তাহলে তাড়াতাড়ি একটা গামলায় গরম জল আর একটা গামলায় ঠাণ্ডা জল ভর্তি কর্‌তে হবে। [গরম জল যেন আগে থেকে উনুনে চড়ানো থাকে।] তারপর শিশুর গলায় একটা হাত এবং পা দুটোর গোড়ায় আর একটা হাত দিয়ে ধ'রে ধনুকের মতো আকারে তাকে ঝুলিয়ে, দু'তিন সেকেণ্ডের জন্যে একবার গরম জলে আর একবার ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত চুবোতে থাক্‌বে। [হাতে সহ্য হয় এমন গরম জল যেন হয়; ঠাণ্ডা জল কলসির, কুঁজোর বা টিউবওএলের হলে খুব ভাল হয়।] এই রকম ৫।৭ বার করলেই অনেক ছেলে ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

কৃত্রিম শ্বাস-আনয়ন পদ্ধতি

এতেও যদি নিশ্বাস না পড়ে, তাহলে ছেলেকে একখানা ছোট কাঁধার ওপর শুইয়ে তার হাত দু'খানা মাথার দু'দিকে সোজাসুজি একবার তুলে ধর্‌তে হবে; দুই-তিন সেকেণ্ড এইভাবে রেখে আবার একবার হাত দু'খানা ধড়ের দু'পাশে এনে পাতিয়ে রাখতে হবে। এই সময় তার দুই কনুইয়ের কাছটা পাঁজরের গায়ে একটু জোরে চেপে ধরতে হবে। দু'তিন সেকেণ্ড এই অবস্থায় হাত দুটো রেখে আবার হাত দুটোকে মাথার দু'পাশে তুলে ধর্‌তে হবে। ছেলের হাত দুটো যখন উঁচু করবে তখন তার মুখে ফুঁ দেবে। এই রকম ৫।৭।১০ মিনিট কর্লেই সুফল ফল্‌বে।

বয়স্ক লোকও জলে ডোবার ফলে বা অন্য কোনও কারণে দম আট্‌কে মারা যাওয়ার উপক্রম কর্লে বা মৃতবৎ হলে, এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর্‌তে হয়। সে ক্ষেত্রে ১৫।২০ মিনিট এই রকম কর্তে হবে।....পদ্ধতিটি শিখে রেখে দাও, জীবনে কোন-না-কোনদিন কাজে আসতে পারে।

নাভীরজ্জু-কর্তন

ছেলে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক ক্রন্দনশীল অবস্থায় প্রসূত হলেও, ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৫।৭।১০ মিনিট পরে তার নাভীরজ্জু (নাড়ী) কাটা উচিত। যখন নাভীরজ্জুতে আঙুল টিপে দেখবে যে, তার মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ কোরে রক্তসঞ্চলন টের পাওয়া যাচ্ছে না অথবা একেবারে খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছে আর নাড়ীটা নেতিয়ে এসেছে, তখন নাড়ী কাটার উদ্যোগ করবে। মায়ের শরীর থেকে যতখানি সম্ভব রক্ত সন্তানের ভেতর আসার সুযোগ দিতে হয়, কারণ ছেলে ২।৩ দিন বিশেষ কিছুই খায় না। দাই হাত দুটো কার্বলিক সাবান বা সাইনল্‌ সোপ অথবা ডেটল্‌ মেখে নির্বীজিত (disinfected) কোরে নেবে।

কাঁচি ও নাই বাঁধবার ফিঁতে বা সুতো আগে থেকে গরম জলে ফুটিয়ে বোরিক গজ বা তুলো দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েচে। কাঁচির মাথা দুটো যেন খুব ছুঁচোল না হয় এবং ফলা দুটো যেন খুব ধারাল না হয়। ছেলের নাই থেকে নাড়ীর আঙুল তিন-চারেক পর্যন্ত জায়গা ধাত্রী দুই আঙুল দিয়ে বেশ আস্তে আস্তে টিপে চুঁচে নিয়ে, ঐ জায়গার পরে নাড়ীর চারিধার ঘুরিয়ে আংটির আকারে দু'পোঁচ টিঞ্চার আইওডিন্‌ মাখিয়ে দেবে; তারপর টিঞ্চার আইওডিন-মাখানো জায়গাটা তিন-চার পাক ফিঁতে বা সুতো দিয়ে বেশ শক্ত কোরে বাঁধবে। এর পর যোনি-দ্বারের দিকে আরো তিন-চার আঙুল পর্যন্ত নাড়ীর অংশটুকু দুই আঙুল দিয়ে টিপে চুঁচে নিয়ে, ঐ জায়গায়ও নাড়ীর গায়ে আর একবার টিঞ্চার আইওডিনের পোঁচ লাগিয়ে দিতে হবে। ঐ জায়গাটাও ঠিক আগের মতো শক্ত ক'রে বাঁধতে হবে। এবার কাঁচির ফলাটায় বেশ ক'রে টিঞ্চার আইওডিন্‌ মাখিয়ে নিয়ে, ছেলের নাইয়ের দিককার বাঁধনের এক আঙুল ওপরে কাঁচি দিয়ে নাড়ী কাট্‌তে হবে। তারপর

কাটা জায়গাটার ওপরে ও ভেতরে টিঞ্চার আইওডিনের পোঁচ্ দিয়ে দিতে হয়।

আগেকার কালে পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ দাইরা ভাঙা কাচের টুকরো, বাঁশের চাঁচাড়ি অথবা মর্চে-পড়া নির্বীজিত-না-করা অতিশয় ভোঁতা কাঁচি দিয়ে নাড়ী কাটত আর ময়লা সুতো বাঁধ্‌ত। তার ফলে বহু ক্ষেত্রে নাড়ীর মধ্য দিয়ে শিশুর শরীরে ধনুষ্টঙ্কারের বীজাণু সংক্রামিত হত। বহু আঁতুড়ে-শিশু ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা পড়্‌ত। মূর্খ দাই ও পল্লী-গৃহিণীরা এই রোগকে পেঁচোয় পাওয়া বা মামদোয় পাওয়া বলে' প্রসূতিদের প্রবোধ দিত—আত্মপ্রবঞ্চনা করত। এখনো দূরপল্লীর অনেক বাড়িতে পেঁচো নিয়মিতভাবে হানা দেয়, কিন্তু শহর থেকে তারা চোঁচা দৌড় মেরেছে!

নাড়ীকাটার পর প্রসূতের প্রতি কর্তব্য

নাড়ী কাটা হলে, এইবার নাওয়াবার পর্ব সুরু কর্তে হবে। আগেই জলপাইয়ের তেল (olive oil) কিনে এনে রাখ্‌তে বলেছি। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারখানায় যদি জলপাইয়ের তেল না পাওয়া যায়, তাহলে অগত্যাপক্ষে নারকেল তেল। একটি ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কাঁচা খানেক তেল নিয়ে মিনিট ছয়েক ফুটিয়ে নিয়ে সামান্য গরম থাকতে তাইতে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে শিশুর সারা গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে। তারপর শুক্‌নো তুলো বা পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া দিয়ে সামান্য জোরে জোরে সেই তেল ডলে ডলে উঠিয়ে ফেল্‌তে হবে। তেলের সঙ্গে ছেলের গায়ের সমস্ত ময়লা উঠে আসবে। এর পর ছেলের সারাগায়ে ও মাথায় সাবান মাখিয়ে ভিজে তুলো বা ন্যাকড়া দিয়ে ঘষতে হয়; গামলার মধ্যে ঈষদুষ্ণ জল রেখে, তাইতে ছেলের গলার তলায় এক হাত দিয়ে ও পাদুটো অন্য হাতে ধরে' বার কয়েক জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করিয়ে দিতে হয়। মাথায় সামান্য

জল থাব্‌ড়ে মুছিয়ে দেবে। তেল মাখাবার ও নাওয়ার সময় দরজা-জানালা বন্ধ কোরে দেওয়া চাই।

স্নান করিয়েই তাড়াতাড়ি শুক্‌নো তোয়ালে বা একটুক্‌রো ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে, সারা গায়ে ট্যালকম্ পাউডার মাখিয়ে দিয়ে একটা ঢিলে জামা পরিয়ে দিতে হবে। এইবার নাইয়ের সঙ্গে সংলগ্ন নাড়ীর কর্তিত অংশটুকুর মুখ চুঁইয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। যদি বেরোয়, তাহলে যে জায়গায় বাঁধন দেওয়া হয়েছে, তার নীচে আর একটা ৩।৪ পাকের বাঁধন দিতে হবে। তার পর আর একবার কাটা মুখের ফাঁকে টিঞ্চার আইওডিনের একটা পোঁচ লাগিয়ে দিয়ে ওখানটায় এবং নাই পর্যন্ত সমস্ত অংশে বোরিক পাউডার ছড়িয়ে ও লাগিয়ে দিতে হবে। একটা চার আঙুল চওড়া ও আট আঙুল লম্বা বোরিক গজ দু'ভাঁজ করে নিয়ে তার ঠিক কেন্দ্রস্থলে নাড়ীর মধ্য দিয়ে গলে এমন একটা ফুটো কোরে নেবে কাঁচি দিয়ে। ঐ দু'ভাঁজ-করা সচ্ছিদ্র চৌকো গজ নাড়ীর মধ্য দিয়ে গলিয়ে নাইয়ের ওপর বসিয়ে দেবে। তারপর ওকে চারদিক থেকে পাট কোরে নাইটাকে বেশ পুরু কোরে ঢেকে দেবে। তারপর খণ্ডিত নাড়ীটা এক আঙুল পুরু তুলো দিয়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে তাকে একপাশে কাৎ করে' পেটের ওপর শুইয়ে, তার ওপর পেটি বেঁধে দিতে হয়। পেটি বেশী জোরে বাঁধা নিয়ম নয়। ছয় সাত আট দিনের মধ্যেই নাড়ীর টুক্‌রোটা শুকিয়ে আপনি খসে যায়।

ছেলের পেটি কি কোরে বাঁধতে হয়, তা তোমরা হাসপাতালে বা বাড়িতে অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রসবের পর ধাত্রী বা সেবিকাদের বাঁধা দেখে শিখে নিও। নিজেদের প্রসবের সময় নিজেদের তো আর ছেলের পেটি বাঁধতে যাবে না; তবে এসব শিখে রাখ্‌লে অন্য বউদের আঁতুড়ে গিয়ে সাহায্য করতে পার্‌বে।

এইবার শিশুর জিহ্বায় ২।৩ ফোঁটা মধু লাগিয়ে দিয়ে বিছানা কোরে পোয়াতির পাশে শুইয়ে দাও। গ্রীষ্মকালে একখানা পাতলা কাঁথা চাপা দিলেই যথেষ্ট হবে। শীতকালে ২ খানা পুরু কাঁথা নতুবা একটা ওয়াড়-দেওয়া কম্বলের টুকরো চাপা দেওয়া উচিত। এইবার জানলা খুলে দাও। [প্রসব-ঘরের অন্তত দুটো জানলা দিনরাত খুলে রেখো। প্রত্যহ সকালে মেঝে ফিনাইলের জল ও ন্যাতা দিয়ে মুছে ফেলো; দু'বেলা ধুনো দিয়ো। ঘরে রক্তের ন্যাকড়া বা কোনো ময়লা জমতে দেবে না।] স্নান করাবার পর একটু গরম পেলেই শিশু ঘুমিয়ে পড়বে এবং একাদিক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা কি তার চেয়ে বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে।

প্রসূতির প্রতি কর্তব্য

এইবার পোয়াতির দিকে একটু নজর দিতে হবে। ফুল বেরোবার পরও দশ মিনিট কি পনের মিনিট পেটের ওপর হাত দিয়ে জরায়ুর মাথার দিকটা আল্‌গা মুটোয় ধরে নীচের ঠেলে দিকে রাখতে হয়; তারপর পেট জড়িয়ে সেফ্‌টি পিন্ দিয়ে এঁটে দিতে হয়। পেটি খুব আঁটো হবে না, বরং নাইয়ের উপরের দিকটা একটু ঢিলে রাখতে হবে। যদি রক্ত বেশী পড়তে থাকে অথবা রক্তের সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো চামড়া কি মাংসের কুঁচি বেরোতে থাকে, তাহলে পেটি খুলে দিয়ে জরায়ুর মাথার দিকটা হাতের মুটোয় ধরে' রবারের পাউচের মত ১০।১২ বার টিপে দিতে হয়, তাহলে তার ভেতরে ফুল, পানমুচির টুক্‌রো-টাক্‌রা ও অন্যবিধ জঞ্জাল কিছু আটকে থাকবে না এবং ২।৪ দিন পরে পচে গিয়ে পোয়াতির সমস্ত রক্তস্রোতকে বিষিয়ে দেবে না। রক্ত বেশী পড়তে থাকলে, তলপেটে খানিকক্ষণ বরফ ঘষাও চলে। পোয়াতি বেশী দুর্বল হয়ে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম করলে বা মূর্চ্ছা গেলে, তার মাথার বালিশটা সরিয়ে নিয়ে মাথা নীচু কোরে

চিৎ অবস্থায় পা টান্ টান্ করে শুইয়ে রাখতে হবে, কপাল ও চোখ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিতে হবে। রক্ত কমে এলে বা এক-আধ ফোঁটা কোরে পড়তে থাকলে আবার পেটি বেঁধে দিতে হয়।

এইবার পোয়াটাক আন্দাজ সামান্য গরম জল ও তাতে অন্তত দু' চা-চামচপূর্ণ লাইসল্ বা ডেটল্ মিশিয়ে, ডুশ্ দিয়ে যোনিনালীর অভ্যন্তর-ভাগ ধুইয়ে দিতে হবে। যোনির অভ্যন্তর পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে রবারের নলের মুখের ফুটোয় বসাবার পৃথক নল্‌চে থাকে। তার মাথাটা একটু মোটা এবং তাতে ৪।৫টা ফুটো আছে—যাতে কোরে তার মধ্য থেকে ফোয়ারার মত জল বেরোতে পারে; ওকে বলে vaginal nozzle (মলদ্বারে দেবার নল্‌টাকে বলে rectal nozzle)। সব বাড়িতে দু'রকমের নল্‌চেই কিনে রেখে দেওয়া উচিত। ডুশ্ দেওয়ার আগে বা পরে পোয়াতি যদি প্রস্রাব করতে চায়, তাহলে করিয়ে দেবে। প্রতিবার প্রস্রাব-বাহ্যের পর সাবানজল-ভিজোনো তুলো দিয়ে দ্বার মুছিয়ে দেবে।

তারপর প্যাড দিয়ে কপনি পরাতে হয়। তিন-চার ইঞ্চি চওড়া, নয় ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা ও ১-১। ইঞ্চি পুরু বোরিক তুলোর দু'দিকে বোরিক গজ দিয়ে মুড়ে এক-একখানা প্যাড্ তৈরি কোরে রাখতে হয় আগে থেকে। এই রকম প্যাড্ অন্তত ১৫।১৬ টা তৈরি কোরে রাখলে ভালো হয়। ঐ প্যাড্ একখানা যোনিপ্রদেশের ওপর থেকে মলদ্বারের ধার পর্যন্ত পাতিয়ে দিয়ে, কপ্‌নি এঁটে দিতে হয়—যেমন মেয়েরা মাসিক ঋতুর সময় পরে। প্যাডের বদলে কোন কোন ডাক্তার 'স্যানিটারী টাওয়েল্' দিয়ে রাখতে বলেন। স্যানিটারী টাওয়েল কিন্‌তে একটু খরচ বেশী পড়ে এবং বড় বড় শহরে ছাড়া কিন্‌তে পাওয়া যায় না। তাছাড়া খুব বেশী রক্ত পড়লে আধঘণ্টার মধ্যেই স্যানিটারী টাওয়েল ভিজে জব্‌জবে হয়ে যায়। প্যাড প্রথম দিন

বার তিন-চার, তারপর দিন দু'বার, তারপর থেকে প্রত্যহ একবার কোরে বদ্‌লালেই যথেষ্ট।

এইবার পোয়াতির মলদ্বার, পিঠের তলার দিক, উরুর খাঁজ-টাঁজ বেশ কোরে বোরিক লোশন-ভেজানো তুলো দিয়ে মুছিয়ে, অএলরুথ সরিয়ে নিয়ে তাকে বিছানায় পা ছড়িয়ে শোয়াবে। যদি কিছু খেতে চায়, তাহলে তাকে অল্প-গরম পাৎলা এক কাপ 'হর্লিক্স্' বা 'ওভাল্‌টিন্' অথবা গ্লুকোজের জল (আধ কাপে ৪ চা-চামচ গ্লুকোজের গুঁড়ো মিশিয়ে) খেতে দেবে। ব্যস্, আর কিছু নয় অন্তত ঘণ্টা ১০।১২। এই সময় খাওয়ার চেয়ে পোয়াতির ঘুমেরই বেশী দরকার। অনেক পোয়াতিই সমস্ত পেট্‌টায় ব্যথা নিয়েও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।

পোয়াতি ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে *Neo-Gynergen* নামক ওষুধের একটা চাকৃতি এক ঢোক্ জলের সঙ্গে খাইয়ে দেবে। যদি এই ওষুধ না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে ৬০ ফোঁটা *Liquor Ergot* সিকি কাপ ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দেবে। এই সব ওষুধ খেলে, জরায়ুর ভেতরকার সমস্ত ঝড়্‌তি-পড়্‌তি ময়লা বেরিয়ে গিয়ে জরায়ু শুকিয়ে ছোট হয়ে যাবে এবং পেটের ব্যথা মরবে। যতদিন স্পষ্ট রক্তস্রাব থাকে, ততদিন রোজ তিনবার Neo-Gynergenএর চাকৃতি একটা কোরে পোয়াতি যেন খেয়ে যায়। কথাটা যেন মনে থাকে।

প্রসবান্তিক স্রাব (Lochia)

প্রসবের পর ৩।৪ দিন পর্যন্ত যোনিনালী দিয়ে শুধু কাল্‌চে কাল্‌চে একটু আঠালো ভাবের রক্ত বেরুতে থাকে। তারপর দিন তিনেক ঘোর লাল, সাত-আট দিন পর থেকে স্রাব ফিঁকে গোলাপী বা সবুজে-সাদায় মেশানো পাৎলা রকমের হ'তে থাকে এবং পরিমাণে কম্‌তে থাকে। কারো পনেরো দিন, কারো কুড়ি, কারো পঁচিশ-ত্রিশ দিন পর্যন্ত একটু একটু সাদাটে পাৎলা স্রাব ঝর্‌তে থাকে।

সাত-আট দিন পর্যন্ত মোটা ও বড় প্যাড্ ব্যবহার করতে হয়, তারপর মাসিক স্রাবের সময় যেমন অল্প তুলো অথবা সাবানে-কাচা পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া নাও, তেমনি নিলেই চল্‌বে।....তোমাদের আগেই বলেছি ২।৩ মাস থেকে ক্ষেত্রবিশেষে এক বছর পর্যন্ত মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। প্রসবের সময় যাদের খুব বেশী রক্ত বেরিয়ে যায় এবং যারা ছেলেদের প্রচুর স্তন্যপান করায়, তাদের সাধারণত একটু দেরিতে ঋতুধর্ম ফিরে আসে।

ভেদাল বা হেঁদাল ব্যথা (After-pains)

প্রসবের পর তিন-চার দিন পর্যন্ত স্থায়ী একটা কষ্টকর বেদনা সমস্ত পেটে ও কোমরে উপস্থিত হয়। একে "ভেদাল ব্যথা" বা "হেঁদাল ব্যথা" বলে। সাধারণত প্রথম পোয়াতিদের এ রকম ব্যথা হতে দেখা যায় না। দুটি-তিনটি সন্তানের জননীদেরই এই রকম হয়। অনেক ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞের মত এই যে, জরায়ুর ভেতরকার ময়লা ভালো কোরে পরিষ্কার না হলে ওর সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে হেদাল ব্যথার উৎপত্তি হয়। দিন তিনেকের মধ্যেই এই ব্যথা সেরে যায়। যারা *Neo-Gynergen* বা *Ergot* খায়, তাদের হেঁদাল ব্যথা বড়-একটা হতে দেখা যায় না।

প্রসূতির নিদ্রা, বিশ্রাম, স্নানাহার, অবস্থিতি ইত্যাদি

ঘুম। প্রসূতি প্রসবের পর অন্তত ১২ ঘণ্টা কাল একভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে থাক্‌বে এবং যত বেশীক্ষণ পারে নিদ্রা দেবে। অন্তত তিন দিন কারুর সঙ্গে বেশী কথা বলবে না, পাশ ফির্‌বে না, উঠে বসবে না, প্রস্রাব-বাহ্যে করতে উঠবে না, কোন কঠিন জিনিস খাবে না। ক্রমাগত দু'দিন ধরে' যদি ভালো ঘুম না আসে, প্রসবের ৮।৯ ঘণ্টা পরও যদি প্রস্রাব না হয়, স্রাবের বেগ বেড়ে যায় এবং ১০০র বেশী জ্বর হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

খাদ্য। প্রসবের আট-দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে প্রসূতি যদি খেতে চায়, তাহলে একবার কি দু'বার তাকে ঈষদুষ্ণ হলিক্স, ওভাল্‌টিন্ বা গ্লুকোজের জল দেওয়া যায়, তা আগেই বলেছি। এই সময়ের পরে তাকে দু'বেলা দু'কাপ চা আর দু'খানা করে' ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট খেতে দিতে পার। দুপুরে আর রাত্রিতে প্রতিবারে একপোয়া বা দেড়পোয়া দুধ নতুবা দুধসাবু খেতে দেবে; বড় জোর শাক-তরকারির শুধু ঝোল পোয়াটাক্ দেওয়া যায়। আর কিছু নয়। পোয়াতি কাঁদলে-ককালেও নয়। প্রসবের পর ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা।

তৃতীয় দিন থেকে যদি ১০০°র বেশী জ্বর বা অন্য কোন অসুখ না থাকে, তাহলে দেবে সকালে ক্রীম ক্র্যাকার ও চা। যারা চা-বিস্কুট খায় না, তারা অল্প কালোজিরে দিয়ে ভাজা চিঁড়ে (১½ থেকে ২ ছটাক) অথবা অল্প-সেঁকা মাখন-গোলমরিচ দেওয়া শক্ত ছিল্‌কে-ছাড়ানো পাউরুটির ২ খানা ফালি খেতে পারে। তৃতীয় দিন থেকে দুপুরে ভাত-দাল-তরকারি-মাছের ঝোল। ভাতের পাতে খানিকটা মাখন বা ঘি গরম কোরে যৎসামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে খাওয়া বড় ভালো প্রথা। ভাজাভুজি না দেওয়াই মঙ্গল, একটা কিছু ভাতে-পোড়া দেবে; দাল পাৎলা করে' রাঁধবে; জিয়ল বা ছোট টাট্‌কা মাছের ঝোল রাঁধ্‌বে। ঝোলে কাঁচকলা, পটল, লাউ থাকে যেন। তরকারিটা যেন মোচা, থোড়, ছাঁচি কুমড়ো, ডুমুর, চ্যাঁড়শ প্রভৃতি দিয়ে হয়। তৃতীয় দিনে রাত্রিতে শুধু দুধ বা দুধসাবু বা দুধ-বার্লি দেবে। চতুর্থ দিন থেকে রাত্রিতে আটটার মধ্যে রুটি, লুচি বা পরোটা খেতে দেওয়া যায়—কিন্তু পেট ভরে' নয়।

কোন পাকা মাছ, মাংস গরম মসলা, লঙ্কা-পিঁয়াজ-রশুন দেওয়া ডালনা, কালিয়া, টক্, মিষ্টি প্রভৃতি পোয়াতির কিছুই খাওয়া চল্‌বে না। পেট খারাপ হ'তে পারে, পেটে বায়ু জন্মাতে পারে, পেট ব্যথা

কর্‌তে পারে অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে—এমন কোন খাদ্যই খাওয়া চলবে না। সাত-আট দিন পর থেকে ডিমের পোচ্ বা অর্ধসিদ্ধ ডিম মাঝে-মাঝে খাওয়া চল্‌বে, কিন্তু ডিমের ডালনা বা কালিয়া মোটেই নয়। দু'সপ্তাহ পর থেকে মিষ্টি ফল-ফুলারি সব খেতে পারে। অনেক পোয়াতিরই দুধে অরুচি থাকে, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে রোজ অন্ততপক্ষে দেড় পোয়া থেকে আধ সের দুধ পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। একমাস আগে যেন কোন পোয়াতিই মাংস, দই, ক্ষীর, টক্, চাট্‌নি, আচার প্রভৃতি না খায়। বারবার বারণ কোরে দিচ্ছি। তবে দু'সপ্তাহ পর থেকেএক কাপ কোরে মাংসের যূষ খাওয়ানো চলে।

স্নান। প্রথম ২৪ ঘণ্টা কি ৩০ ঘণ্টাকাল প্রসূতির গায়ে একেবারে জল দিতে নেই। তারপর যদি দেখা যায় যে, তার শরীরে জ্বর ও সর্দিভাব নেই, তাহলে দরজা-জানালা বন্ধ কোরে দিয়ে গরম জলে তোয়ালে কিংবা গামছা নিংড়িয়ে তাই দিয়ে গা মুছিয়ে দেবে। এইভাবে একদিন অন্তর বেলা দশটা লাগাৎ গরম জলে গা মোছা ছাড়া আর কিছু করবে না। শরীরগতিক বুঝে, ও ঋতু বুঝে, সপ্তম, অষ্টম বা নবম দিনে গায়ে অল্প গরম ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে আতুড়-ঘরের মধ্যে নেয়ে ফেল্‌বে। ঐ দিন গায়ে বেশ কোরে সাবান মাখ্‌বে। হপ্তাখানেক পর্যন্ত একদিন অন্তর এইভাবে তেল মেখে অল্প গরম জলে স্নান করতে হবে। তারপর থেকে খোলা হাওয়ায় রোজ স্নান করলে কোন ক্ষতি নেই। তবে দারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রথম নাওয়ার দিনটি ছাড়া অন্যদিন ঠাণ্ডা জলে নাওয়া চলতে পারে।

প্রসবের পর ১৪, ১৫, ১৬ দিন অবধি—যেদিন গা-মোছানো বা স্নান করানো হবে, সেদিন আগে যোনির অভ্যন্তরভাগ লাইসল্ বা ডেটল বা বোরিক-মিশ্রিত ঈষৎ গরম জলের লোশন দিয়ে ডুশ্ দিতে হয়। তারপর দু' তিন দিন অন্তর ডুশ্ দিতে দিতে এক

মাসের মধ্যে একেবারে বন্ধ কোরে দিতে হবে।....ডুশ দেওয়ার পর নাইয়ে, নতুন প্যাড বসিয়ে কপনি এঁটে দিতে হয়।

মলমূত্রত্যাগ, নড়াচড়া, শোওয়া।—আগেই বলেছি পোয়াতি প্রসবের পর প্রথম ১২ ঘণ্টা মোটেই নড়াচড়া করবে না, একেবারে চিৎ হয়ে চুপ্‌চাপ পড়ে' থাকবে। যদি এর মধ্যে মলমূত্রের বেগ আসে, তাহলে বিছানায় শুয়েই করবে। সাধারণত প্রায় ৪৮ ঘণ্টা কাল কারো বড় বাহ্যে হয় না। ৩ দিন যদি পায়খানা না হয়, তাহলে ডুশ দিয়ে অথবা গ্লীসারিন-সাপোজিটরি দিয়ে কোষ্ঠ সাফ করাতে হবে। পোয়াতিদের বারবার নিষেধ করে' দিচ্ছি—বেশ কিছু দিন কোঁথ্ পেড়ে বাহ্যে করতে যেয়ো না। আপনা-আপনি বেগ এসে যতটুকু মলত্যাগ হয় তাই ভালো। যদি একেবারেই বাহ্যে না হয়, ২।৩ দিন অন্তর ডুশ দেওয়া চল্‌বে। ডুশের পাত্র, নল, নল্‌চে প্রভৃতি প্রতিবার ব্যবহারের আগে ও পরে যেন গরম জল আর কার্বলিক সাবান দিয়ে পরিষ্কার কোরে নেওয়া হয়। পরে মলদ্বারও যেন এক টুকরো তুলো বা নেকড়ায় কার্বলিক সাবানের ফেনা মাখিয়ে বেশ কোরে মুছে নেওয়া হয়।

৮।৯ ঘণ্টা পর্যন্ত যদি কারো প্রস্রাব না হয়, তাহলে পোয়াতিকে ক্যাথিটার (সরু রবারের নল) দিয়ে ধাত্রী প্রস্রাব করিয়ে দেবে। ৮নং ক্যাথিটার মূত্রপথে প্রবেশ করিয়ে প্রস্রাব করানো হয়। যে কোন মেয়ে বা পুরুষ ক্যাথিটার দেওয়া অতি সহজে শিখে নিতে পারে। এর পর যদি আর কোনদিন ওর একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পোয়াতিকে উপুড় হয়ে কিছুক্ষণ শুতে বল্‌বে। তাতেও যদি প্রস্রাব না হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ভেঙে, বিছানার ওপর পাশাপাশি রেখে ও উরু দুটো হাঁটুর ওপর খাড়া রেখে, সমস্ত ধড়টাকে প্রায় খিলানের মতো উঁচু

কোরে, মাথাসমেত মুখমণ্ডলটাকে দুই হাতের ওপর কিংবা বালিশের ওপর উপুড় কোরে রাখবে। বুঝ্‌তে পেরেছ কি রকম ভঙ্গীর কথা আমি বলছি?...এ রকম পাঁচ মিনিট কাল থাকলেই প্রস্রাবের বেগ আসতে বাধ্য।

পোয়াতিদের বারবার বারণ কোরে দিচ্ছি, প্রসবের পর ১২।১৪ দিন পাশ ফিরে কাৎ হয়ে পারতপক্ষে শোবে না। বেশীর ভাগ সময় চিৎ হয়ে শোবে, ২।৩ দিন পর থেকে রোজ ২।৩ ঘণ্টা করে' উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে। উপুড় হয়ে শোওয়ার সময় মাথায় একটা উঁচু আর বুকের তলায় একটু নীচু বালিশ দেবে। যদি খাটের ওপর শোও, তাহলে মাথার দিকের পায়া দু'টোর নীচে একখানা কোরে ইট রেখে দিও; তাহলে পায়ের দিকে ক্রমঢালু হবে। এ রকম ঢালু বিছানায় উপুড় হয়ে' শোওয়ার উদ্দেশ্য কি বুঝেছ তো? জরায়ুর অবশিষ্ট মরা চামড়ার টুকরো, জমাট রক্ত ও বদ্ রসটস সমস্ত নিংড়ে বার কোরে দেওয়া, আর জরায়ুটাকে স্বাভাবিক আকার দান কোরে তাকে যথাস্থানে নিবদ্ধ হতে দেওয়া। এপাশ ওপাশ কল্লে জরায়ু এধার ওধার নড়াচড়া করে, বিশ্রাম পায় না।

তৃতীয় দিনে শুধু জলখাবার বা ভাত খাওয়ার জন্যে পোয়াতি দুই পা মেলে একটু পেছন দিকে হেলে বস্‌বে; দরকার হলে পিঠের দিকে ২টো বালিশ রেখে ঠেস্ দিতে পারে। খাওয়ার সময়ে ডান পাশটায় যেন থালাবাটী রাখা হয় এবং পোয়াতি যেন বাঁ হাত মেঝেয় রেখে তার ওপর ভর্ দিয়ে খাদ্যগ্রাস মুখে তোলে। পোয়াতিদের সকলকে বিশেষ কোরে বারণ কচ্ছি—তারা যেন কুড়ি-একুশ দিন পর্যন্ত হাঁটু মুড়ে 'বাবু' (আসনপিঁড়ি) হয়ে অথবা 'উবু' হয়ে যেন পারতপক্ষে না বসে।

তিন দিন পর্যন্ত তো প্রস্রাব-বাহ্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চলবে।

চতুর্থ দিন থেকে বিছানার বাইরে ঘরের ভেতর কোন পাত্রে এই কাজ দুটো সম্পন্ন করবে হামা দেওয়ার মতো উপুড় অবস্থায়। সপ্তম, অষ্টম বা নবম দিন থেকে বিছানা ছেড়ে অল্পক্ষণের জন্যে সাবধানে উবু হয়ে বসে' এই কাজ দুটো সমাধা করতে পার। এর পর অন্য সময়ও দু'পা সাম্‌নে মেলে একটু একটু কোরে বস্‌বে, ছেলে কোলে কোরে মাই দেবে, পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইবে, নাইবে খাবে। কিন্তু বসতে কষ্ট হলে কি পেটে চাড়্ লাগলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়বে। দশ দিনের পর থেকে প্রসূতি একটু আধ্‌টু উঠে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে। বেশী ওঠা-বসা-চলা-ফেরা করলে তাড়াতাড়ি জরায়ু শুকোয় না এবং প্রসবান্তিক স্রাবও বন্ধ হতে চায় না।

নালীর প্রশস্ততা দূরীকরণ

যাদের পেরিনিয়াম অংশত বা পুরোপুরি ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাদের ঐ জায়গাটা প্রসবের ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই সেলাই কোরে নেওয়া উচিত, কারণ ঐ জায়গাটায় বিশেষ কোন সাড়্ থাকে না তখন। এর পরে সেলাই করতে গেলে খুব লাগে; কাজেই স্থানিক সংবেদনহারী ওষুধের (Local anaesthetic) প্রয়োগ কোরে সেলাই করতে হয়। পেরিনিয়াম আংশিক সেলাই করা হলে ৮।৯ দিনের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ সেলাই হলে ১২।১৩ দিনের মধ্যে ডাক্তার বা ধাত্রী সেলাই কেটে দেন। সেলাই কাটার দু'দিন পরে তবে পোয়াতি একটু উঠ্‌তে বস্‌তে পারে।

প্রথম-পোয়াতিদের যোনির তলার দিকে ফুর্শেট্ নামক জোড়ের মুখ (পেরিনিয়ামের মাথার দিকটা) অল্পবিস্তর ফেটে যায়ই। যে ক'টা দিন রক্তস্রাব বেশী হয়, সে ক'টা দিন রোজ একবার কোরে ওই জায়গাটা নির্বীজক ওষুধের ধারানি ও ভিজোনো তুলো দিয়ে মুছিয়ে নেবে। ২০।২১ দিন পর থেকে ১ ভাগ ট্যানিক অ্যাসিড্, ২ ভাগ বোরিক,

১ ভাগ বার্লির গুঁড়ো এবং ১ ভাগ মিহি-কোরে-ছাঁকা ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশিয়ে, যোনিদ্বারের তলার দিকে ওই জোড়ের জায়গাটায় এবং নালীর মুখে আঙুল দিয়ে যৎসামান্য রোজ রাতে লাগিয়ে রেখো। কিছুদিন ব্যবহারের পর দেখ্‌বে, প্রসবজাত নালীর প্রশস্ততা সেরে গেছে এবং ওটা পূর্বের মতো সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে।...

তিন-চার দিন পরে যদি দেখ স্রাবের রং খুব কাল্‌চে অথবা সাদাটে পুঁজ মেশানো এবং তাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হচ্ছে, তাহলে আগে যেমন ঈষদুষ্ণ জলে ডেটল্ বা লাইসল মিশিয়ে ডুশ্ দিতে বলেছি, সেই রকম দেবে। এই রকম প্রত্যহ একবার কোরে সাত-আট দিন দিলে উপকার হবে। সপ্তম, অষ্টম বা নবম দিনে—যেদিন, পোয়াতিকে প্রথম পুরোপুরি বসিয়ে স্নান করানো হবে, সেইদিন তার পেটের ওপর বাঁধা চওড়া পেটি খুলে দেবে। স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে দিয়ে ইঞ্চি তিনেক চওড়া কাপড়ের পেটি বা কোমরবন্ধ মাঝামাঝি রকমের আঁটো কোরে পরিয়ে দিতে হয়। কোমরের দু'পাশে যে দু'খানা চওড়া হাড়ের ফলক আছে, তার মাথার ওপর ও নাইয়ের ওপর দিয়ে কোমরবন্ধটা বিস্তৃত থাক্‌বে। এই কোমরবন্ধটা অন্ততপক্ষে একুশ দিন, না হলে একমাস বাঁধা থাক্‌বে।...মাড়োয়ারিদের বউরা পেট বাঁধে না এবং জরায়ু শুকাবার জন্যে কোন ওষুধপথ্যি ব্যবহার করে না বলে' দুটো-একটা ছেলে হবার পর তাদের পেট বড় হয়ে ঝুলে যায়। লক্ষ্য কোরে দেখেছ তো?

সেঁকতাপের ক্ষেত্র ও মাত্রা

প্রসবান্তে অন্তত ঘণ্টা বারো প্রসূতিকে চিৎ হয়ে শুয়ে পাদুটো পাশাপাশি টান্‌টান্ কোরে রেখে ঘুমুতে ও চুপচাপ বিশ্রাম করতে দিতে হবে। যদি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে ২৪ ঘণ্টাই সে চুপচাপ শুয়ে

থাক্—ক্ষতি নেই। বারো ঘণ্টা কি চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলে অথবা তার আগে পোয়াতি পা-পেট-বুক কোমরের ব্যথায় ছট্‌ফট্ কত্তে থাক্‌লে এক টুক্‌রো ন্যাকড়া চারপাট কিংবা আটপাট্ কোরে সেটা আগুনের ওপর ধরে' তাই দিয়ে ব্যথার জায়গাগুলোয় সেঁক দিতে হবে। পেট বাঁধা থাকবে, তার ওপর সেঁক দিতে পারো; বেশী দেবার কোন দরকার নেই।

তলপেট খুব ব্যথা কর্‌লে ২।৩ দিন সেঁক্ দেওয়া চল্‌বে। ব্যথা না থাক্‌লে পেটে-পিঠে সেঁক্ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হওয়াটা কিছু নয়। পিঠে-কোমরে অসহ্য ব্যথা (হেঁদাল ব্যথা) হলে একটু সরষের তেল গরম করে' তাতে ১০।১২ ফোঁটা Spirit Turpertine অথবা Oil Turpentine মিশিয়ে মালিশ কোরে তারপর সেঁক দেবে। একটা ছোট মাল্‌সাতে কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালিয়ে তাই দিয়ে সেঁকের কাজ চালাবে। সেঁকার কাজ শেষ হয়ে গেলে আগুনের মালসাটা ঘরের বাইরে রাখ্‌তে হবে।

কোন ঋতুতেই কি দিনে কি রাত্রিতে আগুনের পাত্র কখনো আঁতুড়ঘরের মধ্যে যেন রাখা না হয়। বিজলী বাতি, লণ্ঠন বা মাটির প্রদীপ সন্ধ্যা থেকে খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে তারপর নিবিয়ে দেওয়াই উচিত। পাড়াগাঁয়ে একটা লণ্ঠন একটু পল্‌তে নামিয়ে জ্বালিয়ে ঘরের বাইরে রাখ্‌তে পারা যায়। শীতকালে রাত্রিতে খুব কাঁপুনি ধর্‌লে কিছুক্ষণ সেঁক্ দিতে হবে। তাতেও যদি শীতবোধ না কমে, তাহলে দুটো কি চারটে গরমজলের বোতল শক্তভাবে ছিপি এঁটে বিছানায় (গায়ে না লাগে এমনভাবে) রাখ্‌তে হবে।

পোয়াতির গায়ে জ্বর থাকলে তেল মালিশ করা চল্‌বে না। শীতকালে বা দারুণ বর্ষায় সন্ধ্যার পর হাতে পায়ে একটু তেল মালিশ কোরে সেঁক্ দিয়ে দিলে সমস্ত গা'টা বেশ গরম হয় এবং সুনিদ্রা

হয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়ে সকাল-সন্ধ্যায় জব্‌জবে কোরে সরষের তেল মালিশ করে' এক ঘণ্টা ধরে' সেঁক্ দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। এ প্রথাটা উঠে গেলে পোয়াতির কোন ক্ষতি হবে না। এত সেঁকতাপে বহু পোয়াতির শরীর কড়ে' যায়, রাত্রিতে ঘুম হয় না, স্রাবও তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে চায় না।

নাভীর যত্ন ও শিশুর পেটি

শিশু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আগে যে পেটি বেঁধে দিতে বলেছি, সেই পেটি তিন দিন বাদে খুলে দেখ্‌বে নাইয়ের গোড়া পেকেছে কিনা এবং সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস বেরুচ্ছে কিনা। প্রায় সব ছেলেরই ৩।৪ দিন পরে নাই পাকে। তখন নাইয়ের গোড়ায় বেশ পুরু কোরে বোরিক অ্যাসিড্ পাউডার টিপে টিপে লাগিয়ে দেবে। বোরিক গজ যেমন চাপা ছিল তেমনি রেখে, আবার পেটি বেঁধে দেবে। আবার তিন দিন বাদে পেটি খুলে দেখ্‌বে নাইয়ের অবস্থা কি এবং নাড়ীর টুকরাটা আপনি খসে এসেছে কিনা। আগেই বলেছি যে, ৬ দিন থেকে ৮ দিনের মধ্যেই নাড়ীর টুকরোটা শুকিয়ে আপনি খসে' যায়। ৬ দিনের দিন যদি না পড়ে, তাহালে রসে-ভেজা পুরোনো বোরিকের গুঁড়ো নাইয়ের গোড়া থেকে গরম জলে ভেজানো বোরিক তুলো দিয়ে মুছে তুলে দেবে এবং আবার নতুন করে বোরিক পাউডার টিপে টিপে দিয়ে গজ চাপা দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বে।

এখন থেকে রোজই একবার পেটি খুলে দেখবে নাড়ীটা পড়েছে কি না। খসাবার জন্যে নাড়ীর টুক্‌রোটা ধরে' টানাটানি কোরো না, আপনিই খসবে। কারুর হয়তো দু'এক দিন বাদে খসে। খসে' যাবার পর পুরোনো গজের টুক্‌রোটা ফেলে দেবে, নাইয়ের ওপরকার আধ-কাঁচা আধ-শুকনো জায়গাটায় বোরিক মাখিয়ে, তার ওপর

পাতলা বোরিক-তুলো পাতিয়ে দিয়ে, আবার পেটি বেঁধে রাখ্‌তে হবে। দিন দুই-তিনেক পরে যখন নাই একেবারে শুকিয়ে যাবে, তখন আর পেটি বাঁধ্‌বার এবং বোরিক পাউডার ও তুলো দেবার কোন দরকার নেই।

শিশুর স্নান ও সেঁকতাপ

স্নান ও সেঁকতাপ দেওয়া সম্বন্ধে পোয়াতিকে যে নিয়ম পালন কত্তে বলেছি, শিশু সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম খাট্‌বে। প্রবল বর্ষা ও শীতকাল ছাড়া শিশুকে জব্‌জবে কোরে তেল মাখিয়ে দু'বেলা সেঁকতাপ দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আজকালকার সরষের তেলে নানারকম ভেজাল মেশানো থাকে, ঝাঁঝ্‌ করার জন্যে নানা-রকম উগ্র আরক্‌, সজ্‌নে গাছের ছাল, লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেকে বা পোয়াতিকে সরষের তেল না মাখালেই ভালো হয়; শিশুকে তো একেবারেই মাখাবে না। তার চেয়ে বরং নারকেল তেল অথবা জলপাইয়ের তেল মাখানো উচিত। যারা সাত-আট মাসে প্রসূত হয় অথবা অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল অবস্থায় জন্মায়, তাদের মাথার তেলে ১০।১৫ ফোঁটা কোরে Codliver কিংবা Halibut oil মিশিয়ে দেওয়া উচিত। দরকার হলে ৬ মাস পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যহ ২ বেলা তেল মাখাতে হবে।

প্রসবের বারো ঘণ্টা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পরে শিশুর সারা গায়ে তেল না মাখিয়ে, শুকনো তাপ দেবে দু'তিন দিন পর্যন্ত। তারপর সকালের দিকে একটু তেল মাখিয়ে ও ধীরে ধীরে ডলে' বসিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর রোদ্দুর আস্‌লে, তার মাথাটা বাদ দিয়ে তেল-মাখানো সমস্ত দেহটা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রোদ্দুরে রেখে দেবে—অন্ততপক্ষে আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। যদি রোদ্দুর না আসে, যদি

বর্ষার ভিজে হাওয়া বা শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে, তাহলে তেল মাখিয়ে একটু সেঁকতাপ দেবে। আট-ন' দিন পর্যন্ত একদিন অন্তর গরম জলে নিংড়ানো গামছায় গা মুছিয়ে, মাথায় ঠাণ্ডা জল মাখিয়ে দেবে। শীতে-বর্ষায় রাত্রিকালে ছেলেকে ৫।১০ মিনিট কাল শুক্‌নো তাপ দিতে হয়—তেল মাখাতে নেই।

ন'-দশ দিন পর থেকে নাইটাতেও তেল দিয়ে একটু সেঁক দিতে পারো। শিশুকে যখন স্নান করবে, তার ঘণ্টাখানেক আগে থেকে একটা মাঝারি আকারের কলাই-করা অথবা এলুমিনিয়ামের বাটিতে জল ভরে' সেটা রোদ্দুরে রেখে দেবে। রোদ্দুরে থেকে জলটা যখন অল্পোষ্ণ হবে, তখন তাই দিয়ে শিশুকে স্নান করাবে। রোদ্দুরে গরম করার সুবিধা না হলে, তখন ঠাণ্ডা জলে সামান্য গরম জল মিশিয়ে নেবে। স্নান করিয়েই ওকে পাউডার মাখিয়ে একটা জামা পরিয়ে দিতে হবে।

শিশুর প্রথম আহার

প্রথম বারো ঘণ্টা কিংবা (শিশু খুব দুর্বল হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকলে) চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেকে চার-পাঁচ ঘণ্টা অন্তর ৪।৫ ফোঁটা কোরে মধু ছাড়া আর কিছুই দেবে না। রাত্রি দশটা থেকে সকাল ৫টা কি ৬টা পর্যন্ত কিছু খাওয়াবে না। সাবান দিয়ে পরিষ্কার-করা আঙুলে ২।১ ফোঁটা কোরে মধু ছেলের জিবে লাগিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে জিবের নীচেও এক আধ ফোঁটা মধু লাগিয়ে দিয়ে পারো।

মধু দেওয়ার উদ্দেশ্য যে তার ক্ষিদে দূর করা তা নয়; ওতে তার জিব ও গলার ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে যায়, জিব নাড়িয়ে চোষ্‌বার ক্ষমতা জন্মায়, পেটের মল পরিষ্কার হয়ে যায়। জন্মের পর ছেলে যে ক্ষিদের জন্যেই কাঁদে তা মনে কোরো না। অনেক সময় তার শীত করে, নইলে পেট বা গা-হাত-পা ব্যথা করে। তা'ছাড়া শ্বাসযন্ত্রের

ক্রিয়াটাকে দোরস্ত কোরে নেবার জন্যেও শুধু শুধু সে কাঁদ্‌তে পারে। অন্তত তিন দিনের খোরাক শিশুর দেহে মজুত রেখে প্রকৃতি-দেবী তাকে পৃথিবীর মাটিতে পাঠিয়ে দেন, সুতরাং এ ক'দিন উপোস করলেও তার কোন ক্ষতি হয় না।

দ্বিতীয় দিনেও এই রকম চালাবে। খাঁটি মধু যদি না পাও তা'হলে ডাক্তারখানা থেকে আধ বা এক আউন্স Sugar of Milk বা Lactose (দুগ্ধশর্করা) কিনিয়ে আনাবে। আধ চা-চামচ পরিমাণ দুগ্ধশর্করা প্রায় ৩½ চা-চামচ ভর্তি ফুটন্ত ঈষদোষ্ণ গরম জলে বেশ নির্ভাজ কোরে মিশিয়ে নেবে। একটা সাবানে-কাচা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় একটু পুরু কোরে গোটা কয়েক সল্‌তে পাকিয়ে এক টুক্‌রো বোরিক গজের দুই ভাঁজের মাঝখানে রেখে দেবে। ঐ রকম একটা সলতেয় ঐ দুগ্ধশর্করার দ্রব জব্‌জবে কোরে শুষিয়ে নিয়ে, সলতের প্রান্তটা ছেলের মুখের মধ্যে দিয়ে দেবে। অনেক ছেলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চুক্ চুক্ কোরে পলতেটা চুষ্‌তে থাকে। যারা টান্‌বে না, তাদের পল্‌তে নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা কোরে ঠোঁটের ফাঁকে ঐ তরল খাদ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে খাওয়াবে—৪ ঘণ্টা অন্তর মোট পাঁচবার কি ছ'বার। রাত্রি দশটা থেকে সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্ষিদেয় কাঁদলে তবে একবার মাত্র খেতে দেবে। ব্যস্।

এই সূত্রে একটা কথা বলে যাই তোমাদের; বিশেষভাবে মনে রেখে দাও। যদি দেখ যে, কোন ছেলে জন্মাবার ৩।৪ দিন পরেও পল্‌তে চুষ্‌ছে না বা মাই টান্‌ছে না, তাহলে ডাক্তারখানা থেকে এক ড্রাম Borax (সোহাগা) কিনিয়ে আনাবে। অর্ধেক ছোলার পরিমাণ কি তার চেয়েও কম মাত্রায় বোরাক্স ফোঁটা দুই-তিন মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে, তাই দিয়ে দিনে দুবার জিবের তলা ও ওপর দু'এক মিনিট ধরে' ঘষে দেবে। তারপর একটুক্‌রো ভিজে পরিষ্কার ন্যাকড়া

দিয়ে জিব্‌টা আলতোভাবে মুছিয়ে নেবে। পোয়াতিদের জিবে ঘা হলে বোরাক্স-মধু একটু বেশী কোরে জিবে লাগিয়ে রাখলে সেরে যায়। বোরাক্স একটু-আধটু পেটে গেলে কোন ক্ষতিই হবে না।

স্তনে দুগ্ধাগম ও স্তন্যদান

প্রসবের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে শতকরা ৯৫টি নারীর স্তনে দুধ আসে। দুধ আস্‌বার একদিন আগে থেকে গা বাল্‌সায় অর্থাৎ ম্যাজম্যাজ করে, ৯৯° পর্যন্ত জ্বর হয়, বগলের বিচি ঠেলে উঠে বেদনা দেয়, স্তন অত্যন্ত টন্ টন্ করে, স্তনের গায় গিঁট্ গিঁট্ হয়ে ফুলে ওঠে। এর নাম 'দুধনামা জ্বর'। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। দুধ প্রথমটা ঈষৎ আঠালো, হল্‌দে ছাঁটের হয়, টিপলে দু'এক ফোঁটা কোরে বেরোয়। কোনো কোনো গৃহিণী এই দুধ টেনে ফেলে দিতে বলেন; তাঁরা বলেন—এই দুধ খেলে ছেলের পেট কামড়ায় আর পেট খারাপ হয়; তাছাড়া ছেলে ভাল কোরে ঠোঁট দিয়ে টেনে দুধ বের কর্‌তে পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল।

দুধের আভাস মাত্র স্তনে এলেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের গোড়া থেকেই পোয়াতির উচিত শিশুকে দিয়ে স্তন টানানো। প্রথম কয়দিনের মাতৃদুগ্ধে কলস্ট্রাম্ নামক একপ্রকার জোলাপের ওষুধ প্রকৃতিদেবী মিশিয়ে দেন্; তার ফলে ছেলে ঐ দুধ খেয়ে খুব বাহ্যে করে। ৫।৭ দিন ধরে' ওর একটু বেশী পরিমাণে কোষ্ঠ সাফ হওয়ার ও প্রস্রাব করার প্রয়োজন আছে। কারণ, গর্ভে প্রায় সাড়ে-চার মাস বয়সে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পর থেকে ন' মাস দশ-বারো দিন পর্যন্ত সে জরায়ুর মধ্যে বাহ্যে-প্রস্রাব করে না, অথচ নাভীরজ্জু মারফৎ ফুল থেকে তার দেহে পুষ্টির সকল রকম উপকরণ ক্রমাগত প্রবেশ করেছে। লক্ষ্য কোরে দেখো তোমরা, প্রথম

দু'তিন দিন মাইদুধ খেয়ে প্রায় সমস্ত শিশুই প্রত্যহ ৫।৭ বার কোরে গাঢ় সবুজ বর্ণের আঠাযুক্ত মল-ত্যাগ করে। তার পর থেকে মলের রঙ্ হরিদ্রাভ হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু অন্তত তিন মাস কাল পর্যন্ত প্রত্যহ চারবার, পাঁচবার, ছ'বার মলত্যাগ ও অন্তত বার আষ্টেক মূত্রত্যাগ করবে। এটা ওদের পক্ষে বয়সোচিতভাবে স্বভাবসঙ্গত।

স্তন্যদানের ভঙ্গী ও সময়নিষ্ঠা

এইখানে প্রত্যেক পোয়াতিকে বলে রাখি যে, বসে' বসে' স্তন্য দেওয়াই সব চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রথা। শুয়ে মাই দেওয়ায় প্রসূতি ও প্রসূত দু'জনেরই অসুবিধে হতে পারে এবং হয়ও। কিভাবে বসে' ছেলেকে মাই দেওয়া উচিত—কোন্ ভঙ্গী ঠিক্ আর কোন্‌টা বেঠিক, তা আমি এর পর ছবি দিয়ে তোমাদের সকলকে বুঝিয়ে দেব। আপাতত যে ক'দিন পোয়াতির বসা বারণ, সে কয়দিন তাকে শুয়ে শুয়েই মাই দিতে হবে। কিন্তু এ সময়ে বেশী অথবা পুরোপুরি কাৎ হওয়া চলবে না। তাছাড়া কখনই যখন-তখন মাই দেওয়া চলবে না, ঘড়ির কাঁটা ধরে' দুধ খাওয়াতে হবে; একবারে বেশী পরিমাণে খাওয়ানো চলবে না; আবার একটা স্তন বেশীক্ষণ ধরে' খাওয়ানো চলবে না।

যৎসামান্য কাৎ হয়ে একটা স্তনই সহজে খাওয়ানো যায়। সেই-জন্যে স্তন্যারম্ভের প্রথম সপ্তাহটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর বিছানাটা একবার মায়ের ডান দিকে, আর একবার বাঁ দিকে পেতে দেওয়া উচিত। অভ্যাসটা শিশুর ছ'মাস বয়স পর্যন্ত বজায় রাখলে ভালো হয়। সাত-আট দিন পর থেকে বরং একদিন ডান দিকে আর একদিন বাঁ দিকে শিশুর বিছানা পেতে দেওয়া চলে। এটা এতদিন পর্যন্ত বজায় রাখতে বলছি কেন জানো? এতে ছেলের

নরম মাথাটা একপেশে হয়ে গড়ে' ওঠে না। মাই খাওয়ার সময় ছাড়াও ছেলেকে বেশীক্ষণ চিৎ করে' শুইয়ে, আর বাকি সময়টা ভাগাভাগি কোরে একবার এ-কাতে একবার ও-কাতে শুইয়ে রাখবে। বুঝলে?···

সব কথায়ই তো তোমরা মাথা নেড়ে হুঁ হাঁ কোরে সায় দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু কাজের বেলায় কোন্‌টা কতটুকু পালন কর্বে সেইটাই জানবার বিষয়। সব কথা তোমাদের প্রাণে গিয়ে বস্‌ছে কিনা—মনে রাখবে কিনা কে জানে?....

প্রথম তিন মাস স্তন্যদানের নিয়ম

এখন আঁতুড়ে ও শিশুর তিন মাস বয়স পর্যন্ত মাইদুধ খাওয়াবার দুই একটা সাদাসিদে নিয়ম তোমাদের বলে দিই। প্রথম যেদিন শিশুকে মাই ধরাবে, সেদিন ৪ ঘণ্টা অন্তর (২৪ ঘণ্টায় ৬ বার), তার পর দিন থেকে ৩ ঘণ্টা অন্তর (২৪ ঘণ্টায় ৭ বার) দুধ দেবে। রাত্রি ন'টা দশটা থেকে সকাল পাঁচটা ছটার মধ্যে ক্ষিদেয় কাঁদলে শিশুকে একবার মাত্র স্তন দেবে। এই আট ঘণ্টার মধ্যে একবারের বেশী দু'বার যেন দুধ খাওয়ানো না হয়। তিন মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অটুট্ থাকবে। খবর্দার, এর নড়চড় কোরো না। নিয়ম কোরে প্রায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাওয়ালে শিশুর শরীরের আশ্চর্য উন্নতি হবে দেখো।

শিশু কাঁদলেই তার কান্নার কারণ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না কোরে তৎক্ষণাৎ তার মুখে স্তনবৃন্ত পুরে দিয়ে তাকে খুসী ও শান্ত করতে যাওয়ার বদ্ অভ্যাসটির অনুশীলন কোরো না তোমরা কেউ। এতে কত শিশুর যে পরকাল খেয়ে দেওয়া হয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। ক্ষিদে না থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশুর মুখে স্তনের বোঁটা পুরে

দিলে বোঁটা ছেড়ে দিয়ে তারা আরো জোরে কানতে থাকে ; অর্থাৎ তারা মায়ের মূর্খতাকে কান্নার মাধ্যমে সরোষে ধিক্কার দেয়। আবার কোন কোন শিশু খানিকটা টেনে, সঙ্গে সঙ্গে বমি কোরে ফেলে। সুতরাং দয়া কোরে বৃদ্ধা শাশুড়ি ও প্রৌঢ়া জা-ননদদের ক্রন্দনমাত্র স্তন্যদানের অনুজ্ঞাটিকে নীরবে অগ্রাহ্য কোরো। বেশী দুধ খেয়ে পেট কামড়ালেও শিশু কাঁদে—একথাটা তাঁরা ভুলতে বস্‌লেও তোমরা ভুলো না কিন্তু !

হ্যাঁ, আর একটা কথা। কোনবার ঘড়িতে দেখলে—শিশুর দুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে, অথচ সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তখন তাকে ঘুম ভাঙিয়ে মাই দিতে যেয়ো না ; ঘুম ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। যদি তাকে ঘণ্টা ধোরে খাওয়ানো অভ্যাস করিয়ে থাকো, তাহলে দেখবে ঠিক সময়টিতে সে জেগে উঠে কাঁদতে থাকবে। বড় জোর ২৫ মিনিট এধার-ওধার হোতে পারে। সাধারণত মাই দেওয়াটা অভ্যাস করবে—শিশুর বাহ্যে-প্রস্রাব করার ঠিক পরেই, অন্ততপক্ষে প্রস্রাব করার পরেই। তাহলে দুধ খেয়ে সে আবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে, নইলে অল্পক্ষণ পরে ঘুমের ঘোরে প্রস্রাব কোরে জেগে পড়ে' কাঁদতে থাকবে। গ্রীষ্মকালে অন্তত তিন বার এবং শীতকাল ও বর্ষাকালে অন্তত দু'বার ছোট চা-চামচের দেড় চামচ বা দু' চামচ কোরে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দেবে ওকে। ভুল না হয়।

দুধের ক্ষরণবেগ ও পরিমাণ বুঝে— শিশুর হজমশক্তি বুঝে, তাকে প্রতিবারে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের বেশী স্তন দেবে না এবং দুটি স্তনকেই ঠিক সমানভাবে টানাবে। অনেক সময় একটা স্তন বেশী টানানো হোয়ে যায়। দেখো, স্তন মুখে কোরে ছেলে যেন ঘুমিয়ে না পড়ে ; তার ঘুম আস্‌ছে দেখলেই বোঁটা আস্তে আস্তে টেনে নেবে। আর, তোমরা কখনো যেন শুয়ে স্তন দিতে দিতে ঘুমিয়ে পোড়ো না। ঘুমের

ঘোরে মাই দিতে দিতে অনেক পোয়াতিই শিশুর নিঃশ্বাস আটকে তাকে মেরে ফেলে।

স্তনপান করার অল্পক্ষণ পরেই যে সব শিশু বমি তুলে ফেলে অথবা যাদের বিষ্ঠা সবুজাভ ও সাদা সাদা মাছের ডিমের মতো পদার্থ মিশ্রিত হয়, অথবা বিষ্ঠার একদিকে কঠিনাংশ একদিকে জলীয়াংশ চলে' যায়, বুঝতে হবে—তারা দুধ খেয়ে হজম কর্তে পাচ্ছে না, দুধের মাত্রা তাদের বেশী হচ্ছে। তখন দুধের পরিমাণ কমাতে হবে—বুঝেছ ?

স্তনবৃন্তের পরিচ্ছন্নতা

একটা পরিষ্কার ৪ আউন্স শিশিতে আগুনে-ফোটানো জল অল্পোষ্ণ অবস্থায় ভর্তি করবে এবং তাতে এক চা চামচ বোরিক পাউডার মিশিয়ে ভালো কোরে নেড়েচেড়ে ছিপি এঁটে রেখে দেবে। প্রত্যেক বার মাই খাওয়াবার পূর্বে ও পরে ছোট্ট একটুকরো তুলোয় বোরিক লোশন ভিজিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে স্তনের বোঁটার ফুটোগুলো ও চার-পাশটা বেশ কোরে মুছে পরিষ্কার ও নির্বিজীত কোরো। মাই খাওয়াবার পর ফুটোর ভেতরে ও মাথায় দুধের কণা, ধুলোবালি, তেল, ঘাম প্রভৃতি জমে' পচে ও নানাবিধ রোগবীজাণুরা আশ্রয় পায়। তারা আস্তে আস্তে স্তনের অভ্যন্তরে প্রবেশ কোরে স্তনের একাধিক (স্তনপাকা, ঠুনকো প্রভৃতি) ব্যায়রামের সৃষ্টি করে। তা ছাড়া শিশুর দেহকেও অসুস্থ করে। ৪ আউন্স্ বোরিক লোশনে ১ মাস বেশ চল্‌বে। তারপর আবার এক শিশি তৈরি কোরে নেবে।

অত শত করতে যদি কারো আলিস্যি ঠেকে, তাহলে একটুকরো ভালো গায়ে-মাখা সাবান কেটে আলাদা কোরে রেখে দেবে ; একটা ভিজে আঙুলে সাবান ঘষে' বোঁটা দুটোয় লাগিয়ে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলো। সেটা পারবে তো ?....শিশুপালন এত সোজা নয়।

ঠুন্‌কো—কি কল্লে দুধ কমে

কোনো কোনো পোয়াতির স্তনে এত বেশী পরিমাণে দুধ জন্মায় যে শিশুর যথোপযুক্ত পরিমাণ পানের পরও অনেকখানি বেঁচে যায়। শিশু অসুস্থ হয়ে যদি বেশী মাই না টানে, তাহলে'ও খুব বেশী দুধ স্তনের মধ্যে জমে। দুধ বেশী জম্‌লেই গেলে ফেলে দেবে।

যদি গালতে কষ্ট হয়, তাহলে ব্রেস্ট্-পাম্প নামক যন্ত্র ডাক্তারখানা থেকে কিনে এনে (অথবা কোনো প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে চেয়ে এনে) তাই লাগিয়ে দুধ টেনে বার করবে। যারা বেশী দুধ স্তনে জমিয়ে রাখে, গেলে ফেলে দেয় না অথবা সময়মতো ছেলেকে খাওয়ায় না, তাদের প্রায়ই 'ঠুন্‌কো' নামক ব্যায়রাম হয়। এতে স্তনদুটো বেশ ফোলে, টাটায়, জায়গায় জায়গায় ড্যালার মতো শক্ত হয়ে যায়, বোঁটা ভেতর দিকে ঢুকে যায়, বোঁটা ফেটে যায় বা বোঁটার তলায় ঘা হয়ে যায়। এই সঙ্গে ১০১° কি ১০২° জ্বর হয়। সূত্রপাতেই ব্রেস্ট্-পাম্প কিংবা দিয়ে দুধ গেলে ফেল্লে রোগ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। খুব বেশী টাটালে, গরম জলে বোরিক তুলো নিংড়িয়ে দিনে দু'বার কোরে সেঁক দিতে হয়, আর স্তন বস্ত্র দিয়ে একটু ওপর দিকে তুলে বেঁধে রাখতে হয়। স্তনাগ্রভাগ ফেটে গেলে কিংবা ওখানে ঘায়ের মতো হলে, সামান্য মাখনের সঙ্গে যৎসামান্য বোরিক পাউডার মিশিয়ে নিয়ে, তাই অল্পমাত্রায় সারারাত্র মাখিয়ে রেখে দিতে হয়।

দুধ বেশী হলে পোয়াতিকে দু'বেলা দু'কাপ্ কড়া চা বা সকালের দিকে এক কাপ কফি, শুক্‌নো চিঁড়ে-ভাজা আর রাত্রিতে রুটি খেতে দিতে হবে। পোয়াতি যদি দুধ খায় তা বন্ধ করতে হবে এবং জল খাওয়াটা যথাসাধ্য কমিয়ে দিতে হবে। ঘন ঘন জোলাপ নিতে হয়।

কি কল্লে দুধ বাড়ে

আজকাল অনেক পোয়াতির দেখি, স্তনে যৎসামান্য দুধ হয়, কারো বা মোটেই হয় না। যাদের মোটে দুধ হয় না, তাদের স্তনে দুধ আনা খুব শক্ত। দু'এক রকম পেটেণ্ট ওষুধ আছে, যা খেলে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে দুধ আস্‌তে পারে। যাদের শরীর সুস্থ অথচ স্তনে দুধ কম, তাদের আহার ও পথ্যের রকমফের কোরে দুধ বাড়ানো যায়। প্রথমত, তাদের রোজ দেড়পোয়া থেকে আধ সের কোরে গরু বা ছাগীর পাৎলা দুধ খাওয়া দরকার; দুধসাবু খেলে আরো ভালো হয়। নইলে দুধ-বার্লি, ডাবের জল, ভাতের মাড়, কচি তালশাঁস। তারপর, জিয়ল বা চুনো মাছের ঝোল, মুসুর দাল, থোড়, পটল, লাউ, পালং শাকের ঝোল, ভাতের পাতে মাখন। তাছাড়া দুই আহারের মধ্যবর্তী-কালে তৃষ্ণা না থাকা সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। কড্‌লিবার তেল, তুলোর বীজের তেল, কাল জিরা, তিল, মাষকলাই প্রভৃতি খেলে স্তন্যবঞ্চিতাদের স্তনে কিছু-না-কিছু দুধ আসবেই।

মাতৃস্তন্যের গুণ

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, শিশুর যদি মাইদুধ খেয়ে পেট পুরোপুরি না ভরে, তাতে ততটা ক্ষতি হয় না, যতখানি হয় তাকে একেবারে গোড়া থেকে কৃত্রিম খাদ্য বা পশুদুগ্ধ খাওয়াতে সুরু কর্লে। কোন সদ্য-প্রসূতির স্তনদুগ্ধ অপ্রচুর হলে, বরং তাকে বাড়ির ভেতরকার অথবা পার্শ্ববর্তী গৃহের অন্য কোনো পোয়াতির স্তন দেওয়া ভাল, তবু পশুদুগ্ধ দেওয়া ভালো নয়। ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশে মাইনে-করা নীরোগ 'ভিজে দাই' (wet nurse) পাওয়া যায়—যারা দিনে-রাতে নিয়মিত সময়ে শিশুকে নিজেদের স্তনদুগ্ধ পান করায়। ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলাদেশে এখনো এ প্রথাটা প্রতিষ্ঠালাভ করেনি।

অন্তত তিন মাস বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশু যেন মাইদুধ খেয়ে মানুষ হ'তে পারে। কৃত্রিম খাদ্য ও পশুদুগ্ধ ব্যবহারের কথা এর পরে তোমাদের কাছে বল্‌ব।

এখন মাতৃদুগ্ধের কয়েকটি গুণের কথা তোমাদের বলে' রাখি, মন দিয়ে শোন। অবশ্য স্বাস্থ্যবতী মাতার স্তন্যের কথাই বল্‌ছি। (১) মাতৃ-স্তন্য সহজে হজম হয়; (২) সবচেয়ে দ্রুত দেহপুষ্টি হয়; (৩) খাদ্যের যেটুকু তাপ পাকস্থলী সহজভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারে, স্তনদুগ্ধ স্বভাবত সেই তাপ নিয়ে ক্ষরিত হয়; (৪) স্তন্য পরিমাণে একটু বেশী খাওয়া হলে তেমন ক্ষতি করে না; (৫) এক দেহ থেকে আর দেহে সরাসরি যায় বলে' স্তন্য সহজে বীজাণুদুষ্ট হতে পারে না; (৬) এতে মেরুদণ্ড, মাথার খুলি, মাড়ির মধ্যকার দাঁতগুলি ক্রমশ শক্ত হয়, অস্থিক্ষীণতা (rickets) রোগ হয় না; (৭) রোগ-প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে; (৮) শিশু হাঁটতে শেখে ও তার কথা ফোটে শিগ্‌গির; (৯) অন্যান্য খাদ্য খেয়ে হজম করার জন্যে পাকযন্ত্রগুলিকে ক্রমশ প্রস্তুত করে।

প্রত্যেক স্তন্যপায়ী জন্তুর শাবকের নিকট তার মাতৃদুগ্ধই হ'ল শ্রেষ্ঠ খাদ্য; তার পুর্তি ও দ্রুত পুষ্টির সমস্ত উপাদানই মাতৃস্তন্যের মধ্যে প্রকৃতিদেবী সঞ্চিত কোরে রেখে দেন। একটা বেরাল-বাচ্চাকে যদি তার নিজের মায়ের দুধ অথবা অভাবপক্ষে অন্য একটা বিড়ালীর দুধ খাওয়াও, তাহলে সে নিশ্চয়ই আশাতীতরূপ হৃষ্টপুষ্ট হবে। কিন্তু যদি তাকে একটা কুকুরীর দুধ খাওয়াও, তাহলে দেখ্‌বে—সে প্রথমটা খেতে চাইবে না, জোর কোরে খাইয়ে দিলে বমি করবে। যদি কোন বেরাল-বাচ্চা ক্ষিদের জ্বালায় পেট ভরে' কুকুরীর দুধ খায়ও, তাহলে দেখ্‌বে—তার পেট খারাপ হচ্ছে, সে হজম কর্তে পাচ্ছে না, তার মোটেই পুষ্টি হচ্ছে না। অল্পদিনের মধ্যেই বেরাল-বাচ্চাটা হয়তো অসুখে ভুগে মারা পড়্‌বে।...

মনুষ্যশিশু সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। জন্মের অব্যবহিত পরের তিনমাস কাল যে শিশুরা মাতৃস্তন্য পায়, তাদের মধ্যে অসুখ ও অকালমৃত্যুর হার যদি শতকরা পাঁচটা হয়, তাহলে যারা ঐ সময় মাতৃস্তন্য পায় না তাদের মধ্যে অসুখ ও অকালমৃত্যুর হার হবে শতকরা পঁচিশটা, অর্থাৎ পাঁচগুণ বেশী। এমন বউও দেখেছি আমরা, যারা স্তনে দুধ থাক্‌তেও শিশুকে খেতে দেয় না, কাঁচুলি খুলতে কুণ্ঠিত ও ভূলুণ্ঠিত হয়; একেবারে আঁতুড় থেকে নির্বিকারচিত্তে ফুড খাওয়াতে সুরু করে।...এ ঘোর আপত্তিকর, ঘোরতর অন্যায়। মাতার অল্পদিন-স্থায়ী ছোটখাটো অসুখেও শিশুকে বুকের দুধ পান করানো যায়। কতকগুলি কঠিন ব্যায়রামে অবশ্য দুধ দেওয়া উচিত নয়। কোন্ কোন্ রোগে শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য নিষিদ্ধ তা পরে বল্‌ব তোমাদের।

স্তন্যের ওপর দাবি বেশী কার?

যে ছাত্রের বুদ্ধি আছে অথচ মোটে বই ছোঁবে না, তেমন ছেলেকে কি বল্‌বে? যে ট্রামে চড়বে—পয়সা দেবে না, ট্রেনে ভ্রমণ কর্‌বে টিকিট কাট্‌বে না, সে রকম লোককে কি মাথায় তুলে নাচো তোমরা? তেমনি, যে নারী ছেলে কোলে কোরে তাকে স্নেহচুম্বন দেবার অধিকার পেল, সে যদি তাকে স্তন্যদান করতে না চায়, তা'হলে তাকে তোমরা নিশ্চয়ই পা ধোওয়ার জল দাও না। একদল রূপযৌবনরক্ষণলিপ্সু আত্মসুখসর্বস্ব নারী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, ছেলেকে স্তন-চোষণ কর্‌তে দিলে তার নিটোল দেহ-সৌন্দর্যের হানি হবে। কথাটা আংশিক সত্যি হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়। স্তন্যদানের ভঙ্গীর দোষেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্তনপতন হয়।

স্তন না দিয়েও বহু বন্ধ্যা রমণীকে যৌবনের প্রারম্ভে তাদের পয়োধরের প্রগাঢ়ত্ব শোচনীয়ভাবে হারাতে দেখা যায়। আবার

অনেক বহুপুত্রবতীকে প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগেও উন্নতস্তনা থাকতে দেখা যায়। স্তনের সুডৌল স্বাস্থ্য সব সময় দৈহিক স্বাস্থ্য বা সন্তানকে স্তন্যদানের ওপর নির্ভরশীল হয় না; জাতি-বিশেষে বংশ-বিশেষে পরিবার-বিশেষে এর উন্নতি-অবনতির তারতম্য দেখা যায়। যে বউদের মা, মাসিমা, পিসিমা অথবা ঠাকুরমার স্তনের স্বাস্থ্য ভালো নয়, ছেলেকে স্তন্যপান না করিয়েও তাদের স্তন অকালে খারাপ হবে, হাজার কাঁচুলি এঁটেও বুকের যৌবনকে তারা ধরে' রাখতে পারবে না!...যাই হোক্, স্তনের সৌন্দর্য থাক্ আর যাক্, ওর মধ্যে প্রকৃতিসঞ্চিত সুধা থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করা চল্‌বে না কিছুতেই। এর ওপর সন্তানের দাবি স্বামীর চেয়েও বেশী। এ সুধাভাণ্ডে কারো ভাগ বসাবার অধিকার নেই।

মাই যদি না দেবে তো মা হয়েছ কেন?

ট্রেনের সেই বৌটি

বহুদিন পূর্বে একবার আমার স্ত্রী ট্রেনে কোরে আমার সঙ্গে আমাদের গ্রাম থেকে কল্‌কাতায় ফির্‌ছিলেন। কোলে তাঁর সাত মাসের মেয়ে। তিনি ছিলেন মেয়ে-কামরায়। ওঁরই সমবয়সী একটি বউয়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ জম্‌ল। সে তার বাপের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার সঙ্গেও একটি চার পাঁচ মাসের ছেলে; খাসা ফুট্‌ফুটে দেখতে কিন্তু রোগা ও কাঁদুনে। ছেলেটি মাঝে মাঝে কাঁদে আর বউটি তার মুখে মেনাবোতলের বোঁটা পুরে দেয়। তিন ঘণ্টা রাস্তা চলার পরও বউটীকে একবারও স্তন দিতে না দেখে গৃহিণী খুব আশ্চর্য হলেন। শেষে আর থাক্‌তে না পেরে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বউটি বল্ল, "কি জানেন, আমার শরীর তেমন ভালো নয়, আর দুধও খুব বেশী নেই।"

স্ত্রী নিতান্ত নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অসুখ আপনার?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "ছেলে হওয়ার পর একবার ম্যালেরিয়ায় মাস-খানেক ভুগেছি। সেই থেকে ওকে গাই দুধ খাওয়ানো ধরেছি। এখন অবিশ্যি শরীর মোটামুটি ভালোই আছে। আমার ছোট বোনের বে কিনা, তাই বাবা নিয়ে যাচ্ছেন।"

স্ত্রী বল্লেন, "আহা, এতটুকু কচি ছেলেকে শুধু গাইদুধের ওপর রেখেছেন! যেটুকু দুধ মাইয়ে আছে, মাঝে মাঝে সেইটুকু তো ওকে খেতে দিলে পারেন। চমৎকার ছেলেটি, একটু মাইদুধ পেলে ওর স্বাস্থ্যও ভালো হবে, সব সময় এমন কোরে কাঁদবেও না।"

বউটি বেশ একটু গম্ভীরভাবে বল্ল, "কি জানেন, আমার স্বামী মাই দেওয়াটা পছন্দ করেন না।" সে নিজেও পছন্দ করে না—সে কথাটা চেপে গেল, শুধু স্বামীর দোহাই দিল। আমার স্ত্রী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, "স্বামী কি দিনরাত পাহারা দিচ্ছেন? ওতে স্বামীর প্রলোভন, আর ছেলের যে জীবন!"....

তোমাদের মেয়েপুরুষদের মধ্যে এমন দুর্বুদ্ধি যেন কারো না হয়। সন্তানকে স্তন্যদানের মধ্যে মায়ের এক নবীন পুলকানুভূতি আছে—যেটা স্বামীর কাছে দেহদানের চেয়ে কম উপভোগ্য নয়। আর, এতে বাঁচিয়ে তোলার, তিলে তিলে বাড়িয়ে তোলার একটা অপ্রমেয় আত্মপ্রসাদ—একটা অপরিসীম গৌরব আছে। এ গৌরব আত্মক্ষয়ের মধ্যেও জননীকে দান করে অপূর্ব সঞ্জীবনী শক্তি! অতি বড় লম্পট পাষণ্ডও স্তন্যদানরতা মাতাকে দেখে শ্রদ্ধাবিহ্বল নেত্রে থম্‌কে দাঁড়ায়! সে যেন নিজের মায়ের ছবি চোখের সামনে দেখতে পায়, যেন সে সগৌরবে সুদূর শৈশবে ফিরে যেতে চায়!....

দু'দলকেই একটা কথা বলে' দিই, মনে রেখো। ভালবাসার ঠাঁই বুকের মধ্যে, বুকের বাইরে নয়।

আঁতুড় থাকবে কতদিন

আর একটা কথা বলে' আজকের বৈঠক শেষ কচ্ছি।....সভ্য, অর্ধসভ্য ও অসভ্যদের মধ্যেও সদ্যপ্রসবিনীদের জন্যে একটা স্বতন্ত্রবাসের ব্যবস্থা আছে, তাদের বিশ্রামলাভের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। দেশ-ভেদে এর ইতরবিশেষ হয়। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের আঁতুড় দশ দিন, বৈশ্যদের পনেরো দিন, শূদ্রদের কোথাও একুশ দিন—কোথাও বা একমাস। আঁতুড়ের দেহবিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য যারা বোঝে, তারাই বলবে—আঁতুড়ের স্থায়িত্ব যারা যত হ্রাস করে, তারা তত ঠকে! ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিশু ও প্রসূতি-মৃত্যু বেশী দেখা যায়।

আঁতুড় সকল জাতির প্রসূতিদের একমাস হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবে প্রসব হয় যাদের, তাদের জরায়ু, যোনিনালীর পূর্বাবস্থা ও সাধারণ স্বাস্থ্য ফিরে আসতে দু'মাস থেকে আড়াই মাস লাগে। যাদের বিপত্তির মধ্য দিয়ে প্রসব হয়, তাদের লাগে সাড়েতিন মাস তিন মাস। সেইজন্যে এই সময়টা কাটিয়ে আমি দাম্পত্যধর্ম পালন করতে বলি।

কি, উপদেশটা মনে থাকবে তো?

চতুর্দশ আলাপন

শিশুপালনের প্রথম পর্ব

একমাস কাল প্রসূতির পূর্ণবিশ্রাম, তার পরের একমাস অর্ধবিশ্রাম। দু'মাস পর থেকে গড়্পড়তা প্রসূতি তার সংসারের সমস্ত কাজকর্মে একটু একটু কোরে হাত দিতে পারে।....কিন্তু এর মধ্যে তার জীবনে একটা অপরূপ পরিবর্তন এসেছে। তারা দুই ছিল, তিন হয়েছে। বরবধূ আজ পিতামাতা হয়েছে, ওদের দাম্পত্য প্রেম আজ সার্থক হয়েছে—সুন্দরতর হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্যে ও সমগ্র পরিবারের জন্যে এতদিন যে অর্থ, সামর্থ্য ও মনোযোগ প্রয়োগ কর্‌ছিল, তাতে শিশুরূপী এক স্বর্গীয় দেবদূত এসে ভাগ বসিয়েছে। ওকে যোগ্য সমাদর করতে হবে, মাটির পৃথিবীতে ওকে স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে মনের মতো কোরে গড়ে' তুলতে হবে। সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর কাজ বাড়্‌ল; এবং স্ত্রীর বাড়্‌ল খুব বেশী কোরেই।

আগেই তোমাদের বলেছি যে, তিনমাস পর্যন্ত শিশুকে স্রেফ্ স্তনদুগ্ধের ওপর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে—অবিশ্যি মাতার স্তনে ওর পুষ্টি ও তুষ্টির উপযুক্ত পরিমাণ যদি দুধ জন্মায়। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়—তিন মাস বয়স পর্যন্ত দিনেরাতে ক'বার শিশুকে স্তন্যপান করাতে হবে। তিনমাসের পর থেকে—যদি মাতৃদুগ্ধ পর্যাপ্ত না হয়—তাহলে কৃত্রিম খাদ্য ঐ সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে খাওয়াতে পারো। এখনো পল্লীগ্রামের গরিব গৃহস্থঘরের বধূরা ৮।১০ মাস পর্যন্ত শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য একেবারেই খাওয়ায় না, শিশু মাইদুধ খেয়েই মানুষ হয়।

তবে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে শিশুকে মাইদুধ খাওয়ানো একেবারে আঁতুড় থেকেই বন্ধ করতে হতে পারে। ধর, এমন কতকগুলি ব্যায়রাম আছে, যেগুলি মায়ের শরীরে দেখা দিলে, স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে শিশুকে স্তন্যবঞ্চিত করা ছাড়া আর উপায় নেই। তখন তাকে গোড়া থেকে পুরোপুরি কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে মানুষ করতেই হয়। এমন কতকগুলি ব্যায়রাম আছে, যেগুলিতে শুধু স্তন্যদান বন্ধ করা নয়—শিশুকে নিয়ে শোওয়া, কোলে করা, চুমু খাওয়া পর্যন্ত মাকে বন্ধ করতে হয়।

মাতার কোন্ কোন্ অবস্থায় স্তন্যদান নিষিদ্ধ

(১) কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, প্লেগ, নিউমোনিয়া, আমাশা, প্লুরিসি, টাইফএড্ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি হলে।

(২) প্রসবের সময় অত্যন্ত বেশী রক্তপাত হ'য়ে প্রসূতি নীরক্ত, ফ্যাকাসে ও অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লে।

(৩) মাতার ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাক্‌ওয়াটার ফিবার প্রভৃতি হ'লে। [ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন দিয়ে চিকিৎসা করলে, স্তন্যের মাধ্যমে ওষুধের যৎসামান্য অংশ শিশুর পেটে অনভিপ্রেতভাবে যায়; ওটা শিশুর শরীরে বিষের কাজ করে।]

(৪) মাতার বৃক্কপ্রদাহ (nephritis), হস্তপদস্ফীতি (filaria), গর্ভিণী-আক্ষেপ (puerperal eclampsia), রক্তদুষ্টি (septicimia) রোগ হলে; কার্বাঙ্কল, ক্যান্সার, টিউমার, স্তনে ফোড়া, ঘা বা দুগ্ধ-স্রাবী গ্রন্থিতে পুঁজ হলে।

(৫) মাতার মৃগীরোগ (epilepsy), হিস্টিরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি ব্যাধি থাকলে; নতুবা হৃদদৌর্বল্য বা উন্মাদগ্রস্ত হলে।

(৬) মাতা কোন উগ্র বিষাক্ত ওষুধ (যেমন—ষ্ট্রিকনিন্, আফিম, আর্সেনিক-ঘটিত ওষুধ) যতদিন পর্যন্ত সেবন করেন ততদিন। [কুইনাইনের কথা আগেই বলেছি।]

(৭) মাতা যতদিন পর্যন্ত কোন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা করেন ততদিন ও তার পরও ৫।৭ দিন পর্যন্ত।

(৮) স্তন্যদান করতে করতে মাতা পুনরায় গর্ভবতী হ'লে।

কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াবার নিয়ম

যাহোক, মাতা অসুস্থ থাকার জন্যেই হোক বা তার স্তনে দুধ না থাকার জন্যেই হোক্, যদি একেবারে গোড়া থেকেই শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াতে হয়, তাহলে হেমন্ত ও শীতকালে প্রথম সাতদিন, অন্য ঋতুতে প্রথম দশ দিন তাকে "গুগার অব্ মিল্ক্" (দুগ্ধশর্করা) আর সেই সঙ্গে যৎসামান্য চিনি বা মিছরির গুঁড়ো বা মধু খাওয়ানো উচিত। তারপর থেকে 'ফুড্' বা কৃত্রিম দুধের গুঁড়ো অথবা পশুদুগ্ধ খাওয়াতে হবে। প্রথম দশ দিন পরিষ্কার স্যাকড়ার মোটা পল্‌তেয় দুগ্ধশর্করার মিশ্রণ ভিজিয়ে মুখে দিয়ে খাইয়ো। তারপর থেকে কৃত্রিম দুগ্ধ মেনাবোতলে (feeding bottle) পুরে খাইয়ো।

জন্মের প্রথমদিন শুধু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার চার-পাঁচেক পাঁচ ফোঁটা কোরে মধু আঙুলের ডগায় নিয়ে জিবে লাগিয়ে দেবে। দ্বিতীয় দিন থেকে পল্‌তে ব্যবহার করতে থাকবে। প্রত্যেকবার খাওয়াবার সময় নতুন পল্‌তে ব্যবহার করবে। একটা ছোট চা-চামচে এক ড্রাম পরিমাণ কঠিন বা তরল জিনিস ধরে; মাঝারি চামচে দু' ড্রাম ও বড় টেবিল-চামচে চার ড্রাম ধরে।

দ্বিতীয় দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মোট্ তিন চা-চামচপূর্ণ দুগ্ধ-শর্করা খাওয়াতে হবে। প্রতিবারে আধ চামচ দুগ্ধশর্করা ৩½ চামচ পূর্ণ গরম জলে বেশ বেমালুমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওতে ফোঁটা

পাঁচেক মধু অথবা মধুর পরিমাণে চিনি মিশিয়ে দিতে পারো; না দিলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। এই রকম ৪ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার কি ছ'-বার খাওয়াবে। ধর, সকাল ৬টায়, বেলা ১০টায়, বেলা ২টোয়, সন্ধ্যা ৬টায়, রাত্রি ১০টায় একবার। রাত্রি ১০টার পর থেকে পরদিন সকাল ছটার মধ্যে ক্ষিদেয় কাঁদতে থাক্‌লে তবে আর একবার। চুপচাপ যদি ঘুমোয়, তাহলে আর দিয়ো না।

তৃতীয় দিন থেকে সপ্তম অথবা দশম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ৪½—৫ চা-চামচপূর্ণ দুগ্ধশর্করা খাওয়াবে। প্রতিবারে পউনে এক চা-চামচ দুগ্ধশর্করার সঙ্গে সাড়ে-চার চামচ গরম জল মেশাবে; আর মধু বা চিনি আগের মতো দিতে পারো। এইরকম ৩ ঘণ্টা অন্তর ছ'বার কি সাতবার খাওয়াবে। ধর,—সকাল ৬॥ টায়, বেলা ৯॥ টায়, বেলা ১২॥ টায়, বেলা ৩॥ টায়, সন্ধ্যা ৬॥ টায়, রাত্রি ৯॥ টায়। তারপর মাঝরাত্রিতে শিশুর ক্ষিদে পেলে আর একবার।

কৃত্রিম খাদ্যের তাপ

এই সূত্রে একটা কথা তোমাদের কানে বিশেষ কোরে প্রবেশ করিয়ে দিই। শিশুর মুখের মধ্যে যে স্বাভাবিক তাপ আছে, তার চেয়ে বেশী তাপের খাদ্য ওর মুখে দেওয়া উচিত নয়। কৃত্রিম খাদ্য যত গরম হোক্ না কেন, তার তাপ যতক্ষণ পর্যন্ত গাত্রতাপের চেয়ে যৎসামান্য বেশী অর্থাৎ ৯৯°—৯৯½° ডিগ্রী বলে' বোধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা শিশুকে খাওয়াবে না। মাতৃদুগ্ধেরও তাপ ৯৯° ডিগ্রীর বেশী হয় না। এর চেয়ে গরম দুধ খাওয়ালে শিশুর পুষ্টি হয় না; অনেক সময় তারা বমি কোরে ফেলে, নইলে খেয়ে বদ্‌হজমে ভোগে।

এক-একটি মূঢ়া জননীকে দেখি, কোলের ছেলেকে ঠেসে ধরে' গস্‌গসে গরম দুধ তার আপত্তি সত্ত্বেও ঝিনুক দিয়ে গিলিয়ে

দিচ্ছেন। কেউ ঝিনুক-ভরা দুধ নিজের মুখের কাছে এনে দু' একবার ফুঁ দিয়েই শিশুর গলার মধ্যে ঢেলে দেন্। এরকম ফুঁ দিয়ে দুধ জুড়োনো ঘোর আপত্তিকর। এতে দুধের গুণ অনেকখানি কমে' যায়। গরম দুধ জুড়িয়ে নিতে হলে, বাটির ওপর খানিকক্ষণ হাত-পাখার বাতাস দিতে হয়। সব চেয়ে ভালো হয় যদি দুধের বাটি একটা ঠাণ্ডাজলের পাত্রের মধ্যে অর্ধেক ডুবিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে রাখা যায়।

সাতদিন বা দশ দিনের পর থেকে শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য (গুঁড়ো দুধ) অথবা গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়ানো যায়। Allenbury's Food, Benger's Food, Nestle's Baty Food, Glaxo, Lactogen প্রভৃতি নানা রকম শিশুখাদ্য বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের শিশি অথবা কৌটোর গায়ে দুগ্ধ-প্রস্তুতির পদ্ধতি ও প্রতিবার প্রদেয় খাদ্যের পরিমাণ লেখা থাকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী দুগ্ধ প্রস্তুত কোরে শিশুকে খাওয়াতে হবে। বরং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে উপদিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা ½—১ চা-চামচ কম পরিমাণে কৃত্রিম খাদ্য নিয়ে জলে গুল্‌বে।

গরু বা ছাগলের দুধ অমিশ্রিত অবস্থায় পান করানো উচিত নয়; ওতে অল্পবিস্তর জল মিশিয়ে নিতে হয়। শিশুর বয়সভেদে অথবা হজমশক্তির তারতম্য-ভেদে দুধের পরিমাণও যেমন আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়, তেমনি মিশ্রিত জলের পরিমাণও একটু একটু কোরে কমিয়ে দিতে হয়। গরু বা ছাগলের দুধে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা আমিষ উপাদান প্রায় দ্বিগুণ ও শর্করা উপাদান প্রায় অর্ধেক। স্নেহ উপাদান দুটোতেই প্রায় সমান। বরং লাবণিক উপাদান পশুদুগ্ধে কিছু বেশী থাকে। পশুদুগ্ধজাত আমিষ উপাদান শিশুর পক্ষে হজম করা কষ্টসাধ্য; শিশুর পেটের মধ্যে গিয়ে এই উপাদান বড় বড় দলা

বাঁধে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধগত আমিষ পাকস্থলীতে গিয়ে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানায় পরিণত হয় বলে' হজম করা শিশুর পক্ষে সুসাধ্য। সেইজন্যে পশু-দুগ্ধ শিশুর পরিপাকোপযোগী কোরে নিতে হলে ওতে দ্বিগুণ পরিমাণ তো বটেই—প্রথমটা বরং তার চেয়ে কিছু বেশী জল মিশিয়ে নিতে হয়। নইলে শিশুর পেটের অসুখ, পেট-কামড়ানি, দুধতোলা ও যকৃতের দোষ দেখা দিতে পারে।

একেই তো পশুদুগ্ধে শর্করার ভাগ স্বভাবত কম; তার ওপর জল মিশিয়ে নিলে তার মধ্যে শর্করার পরিমাণ আরো কমে যায়। সেই-জন্যে কৃত্রিম খাদ্যে কিছু দুগ্ধশর্করা (Lactose অথবা sugar of milk) অথবা মধু, মিছরির গুঁড়ো বা চিনি মিশিয়ে নেওয়ার নিয়ম। জল মিশোলে স্নেহ পদার্থও কিছু কমে' যায় বটে, কিন্তু তাতে শিশুর পুষ্টির তেমন কিছু ব্যাঘাত হয় না। তবে কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত এই পাঁচ মাস কাল ওর দেহের আশানুরূপ দ্রুত-পুষ্টির উদ্দেশ্যে অল্প-সল্প 'মাটা' বা তরল ননী মিশিয়ে দেওয়া চলে।

মাটা বা তরল ননী তৈরি করার নিয়ম

এখন তরল ননী বা মাটা কি কোরে তৈরি করতে হয়, তা তোমাদের শিখিয়ে দিই। রাসায়নিক পরীক্ষণাগারে ব্যবহৃত কাচের 'সিলিণ্ডার' বা চোঙের মতো গেলাস দেখেছ? এক পোয়া আন্দাজ জল ধরে এমন একটা কাচের-চোঙ্ যোগাড় করতে পারবে? যদি না পারো, একটা ছোট আকারের মেজার্ গ্লাস কিনে আন্তে পারো। তাতে ওষুধ মাপা, দুধ মাপা, ননী তোলা প্রভৃতি অনেক কাজ চল্‌বে। অভাবপক্ষে একটা বাঁশের চোঙ্ (যা দিয়ে পাড়াগাঁয়ে গোয়ালারা দুধ মাপে), নতুবা একটা চোঙের মতো কাঁসার ছোট গেলাস থাক্‌লেই চল্‌বে। এই রকম একটা পাত্রে গলা পর্যন্ত কাঁচা দুধ ঢেলে, মুখ ঢেকে,

পাত্রটাকে একটা ঠাণ্ডা জলের পাত্রের মধ্যে অধিকাংশ ডুবিয়ে স্থির-ভাবে রেখে দিতে হয় ঘণ্টা ৪।৫। এই সময়ের শেষে স্নেহবহুল মাটা বা ননী দুধের উপরিভাগে ভেসে ওঠে। এই দুধের ওপরের প্রায় এক-চতুর্থাংশই ননী। একটা পলার মতো কোন যন্ত্র দুধের ভেতর সাবধানে অল্পদূর ডুবিয়ে ঐ ননীটুকুর যতটুকু দরকার আন্দাজমতো ততটুকু তুলে নিতে হবে। ননীটুকু একটা কাচের বা চিনেমাটির পাত্রে ঢাকা দিয়ে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়। প্রতিবার যখন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হবে, তখন ঐ পাত্র থেকে পরিমাণ-মতো ননী নিয়ে ঈষদুষ্ণ দুধে মিশিয়ে দেবে। দুটো কথা এইখানে বলে' রাখি। পেটুরোগা বা যকৃতের দোষওয়ালা শিশুকে ননী-মেশানো দুধ দিয়ো না। আর জানাশোনা কিংবা ঘরে-পোষা সুস্থ গরু বা ছাগলের নির্জলা দুধের ননী তুলবে। বাজারে-কেনা বা যোগানদারের-দেওয়া দুধের ননী ব্যবহার করলে শিশুর হিতে বিপরীত হতে পারে।

এখন গোড়া থেকেই যাদের শুধু কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে মানুষ করতে হবে, তাদের খাদ্যে কি কি উপাদান কতখানি মিশোতে হবে এবং প্রতিদিন কি পরিমাণ কতবার খাওয়াতে হবে, তার একটা তালিকা তোমাদের কোরে দিচ্ছি। তিন রকমের চামচের পরিমাণ তোমাদের আগেই বলে' দিয়েছি। এইবার মনে রাখো—আট্ ড্রামে এক আউন্স বা আধ ছটাক বা দু'কাঁচ্চা, ষোল্ আউন্সে এক পাউণ্ড বা প্রায় আধ সের।

আর একটা কথা। প্রতিবারের খোরাকে মিছরির গুঁড়ো বা দুগ্ধশর্করা বা ননী পরিমাণ-মতো মিশিয়ে নেবে। এগুলো যেন মোট দুধে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে সারাদিন ধরে' খাইয়ো না। মোট দুধে শুধু জল মিশিয়ে মৃদু আঁচে পনেরো মিনিট কাল ফুটিয়ে একটি পরিষ্কার পাত্রে ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবে। দরকার-মতো

সেই পাত্র থেকে দুধ ঢেলে নিয়ে, সামান্য গরম কোরে তাতে প্রত্যেক বার মিষ্টি ও ননী মিশিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে।

বার্লি মেশাবে কোন্ বয়সে

শিশুর ওপর পাটির সামনের দুটো দাঁত সাধারণত ছয় থেকে সাত মাস বয়সে দেখা দেয়, তখন থেকে জলের বদলে শিশুর দুধে পাতলা বার্লির জল মিশিয়ে দেওয়া যায়। বার্লির জলও একেবারে মিশিয়ে রাখতে নেই। তৈরি কোরে আলাদা পাত্রে রেখে দিতে হয়; দরকার-মতো ঢেলে নিয়ে প্রতিবারের দুধে মিশিয়ে নিতে হয়। মনে রেখো, দু'টো দাঁতের আগা না বেরুলে কখ্‌খনো দুধে বার্লির জল মিশোবে না। বার্লি যেন ঘন বা আঠালো না হয়। কল্‌কাতা, হাওড়া ও অন্যান্য বড় বড় শহরে যোগান্‌-দেওয়া দুধে অল্পবিস্তর জল মেশানো থাকেই। সুতরাং তালিকার যেখানে ৩ গুণ জল মেশাতে বল্‌ছি সেখানে দ্বিগুণ, দ্বিগুণের জায়গায় দেড়গুণ মেশাবে; দেড়-গুণের জায়গায় একগুণ, একগুণের জায়গায় অর্ধভাগ মেশাবে; বাকিটা দুধ দিয়ে পূরণ করবে। এক বছর বয়সের পর থেকে ছেলেদের খাটি দুধ খাওয়াবে।

অনেক বাড়ীতেই দুধের যোগান পেতে ৮টা কি ৯টা বেজে যায়। সে সব ক্ষেত্রে সকাল ৬৷৷টার মধ্যে শিশুকে একবার ফুড্ খাইয়ে দেবে। রাত্রি ১০টার পর থেকে ৬টার মাঝামাঝি নিতান্ত দরকার হলে হয় সামান্য ফুড্ নয় একটু স্তন্য দেবে। পারতপক্ষে নয়। বুঝেছ?

স্তন্য ছাড়াবে কোন্ বয়সে

যে সকল জননী চতুর্থমাস থেকে স্তন্য এবং পশুদুগ্ধ অথবা ফুড্—উভয়বিধ খাদ্য দিয়েই ছেলে মানুষ করবে, তারা তালিকা-প্রদর্শিত

বয়স	কাঁচা দুধের পরিমাণ	মিশ্রিত জল বা বার্লির পরিমাণ	জ্বাল দিয়া কত দাঁড়ায়	প্রতিবার খাদ্যে মিষ্টদ্রব্য	প্রতিবারের খাদ্যে ননী	প্রতিবারের মিশ্রিত খাদ্যের পরিমাণ	দিনেরাতে কয়বার
৮ম বা ১১শ দিন থেকে ১৪শ দিন	৩৷৷ আউন্স	৯ আউন্স জল	১০½ আউন্স	½ চা-চামচ বা ½ ড্রাম	১০ ফোঁটা	প্রায় ২ আ:	৩ ঘণ্টা অন্তর ৬ বার
১৫শ দিন থেকে একমাস পর্যন্ত	৫৷৷ "	১১ " "	১৪ "	¾ "	১৫ "	" ২½ "	"
সমগ্র ২য় মাস	৮ "	১৫ " "	২০ "	১ "	২০ "	" ৩½ "	"
" ৩য় "	১০ "	১৬ " "	২৩ "	১½ "	৩০ "	কিছুবেশী ৪ "	"
" ৪র্থ "	১২ "	১৬ " "	২৫ "	১½ "	৪০ "	" ৫¼ "	৪ঘণ্টা অন্তর ৫ বার
" ৫ম "	১৪ "	১৬ " "	২৭ "	২ "	১ ড্রাম	" ৫¾ "	"
" ৬ষ্ঠ "	১৬ "	১৮ " "	৩০ "	২ "	১ "	" ৬⅜ "	"
" ৭ম-৮ম "	২০ "	১২ " বার্লি	৩২ "	২ "	১½ "	প্রায় ৬¾ "	"
" ৯ম-১০ম "	২৪ "	৮ " "	৩২ "	২ "	২ "	" ৭ "	"
" ১১শ-১২শ "	২৪ "	৬ " "	৩০ "	২ "	২ "	" ৮ "	৪ বার + অর্ধ কঠিন খাদ্য ১বার

খাদ্যের পরিমাণ অর্ধেক কোরে দেবে এবং প্রতিদিন তিনবার স্তনদুগ্ধ দেবে। যাদের স্তনে প্রচুর দুধ, তারা ছ'মাস পর্যন্ত শুধু স্তনদুগ্ধের ওপর ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখুক, তারপর থেকে অর্ধেক স্তনদুগ্ধ ও অর্ধেক কৃত্রিম দুগ্ধের দ্বারা শিশুকে পালন করুক। দশ থেকে বারো মাসের মধ্যে প্রত্যেক শিশুকে ধীরে ধীরে স্তনদুগ্ধ ছাড়িয়ে দিতে হয়। এ বিষয়ে প্রকৃতির নির্দেশ হ'ল কি জানো?—যতকাল সন্তান গর্ভে থাকবে, ঠিক ততকাল জন্মের পর তাকে স্তন্যদান করতে হবে। নইলে ছেলেরও বাড় ভাল হয় না, মায়েরও শরীর খারাপ হয়ে যায়।

তিন মাসের পর থেকে শুধু কৃত্রিম খাদ্যে অথবা আংশিক কৃত্রিম খাদ্য ও আংশিক স্তনদুগ্ধে যে শিশুরা মানুষ হবে, তাদের প্রত্যহ বয়স হিসেবে দু'ড্রাম থেকে চার ড্রাম ফলের বা কাঁচা শাক-সব্জীর রস খাইয়ে দেওয়া উচিত। বিলিতী বেগুণ, গাজর, টাট্‌কা কচি মুলো, ওলকপি, কমলা লেবু, আপেল, নাসপাতি, দাড়িম, বেদানা, বাঁধাকপির কচি পাতা বা পালম্ শাকের পাতা ছেঁচে রস খাইতে দিতে পারো। দশ মাসে পড়্‌লে অর্ধপ্রস্তুত পাৎলা ভাতের ফেন বা দালের জল একটু নুন ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে রোজ এক আউন্স দেড় আউন্স কোরে খাইয়ে দেবে। দুপুরে ও রাত্রিতে দুধ খাওয়াবার ঠিক পরেই অথবা তার কিছুক্ষণ পরে প্রতিবারে দুই থেকে চার ড্রাম বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দেবে।

কঠিন খাদ্যে হাতেখড়ি

একাদশ মাস থেকে শিশুকে বেলা ১০টার সময় আধমুটো থেকে আরম্ভ কোরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এক মুটো পর্যন্ত ভাত নিয়ে কিছু অংশ দালের যূষ বা মাছের ঝোলের সঙ্গে মেখে আর বাকি অংশ সামান্য দুধের সঙ্গে মেখে, টিপে টিপে কাদার মতো কোরে খাইয়ে

দেবে। এই সময় ঝোলতরকারির একটুক্‌রো আলু, লাউ, কাঁচকলা, মুলো, পেঁপে, ওলকপি, গাজর প্রভৃতি চট্‌কে খাইয়ে দেবে। মাঝে মাঝে অর্ধপ্রস্তুত মাংসের ঝোল একটু নুন-লেবু দিয়ে আউন্স দুয়েক খাইয়ে দিতে পারো; অথবা যৎসামান্য ছোট মাছ।

ভাজাভুজি, ওল, কচু-সিদ্ধ, পটল, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, বড়ি, বেগুণ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডাঁটাভুটি, কাঁটাল-বীচি, উচ্ছে, শিম, বর্বটি, পাকা মাছ, মাংসের টুক্‌রা প্রভৃতি, টকের ঝোল, চাট্‌নি, মুড়ি, চিড়ে, রুটী, লুচি, পাউরুটি, ঘি, মাখন, বিস্কুট প্রভৃতি দেড় বছর বয়সের আগে শিশুর সাম্‌নে আন্‌বে না। বার বার কোরে বারণ করে দিচ্ছি। মনে থাক্‌বে তো?....

নইলে কিন্তু শিশুর যকৃৎটির মাথা চিরকালের জন্যে খাবে।.... শিশুর চোখ্ হলদে আর বাহ্যে কড়া বা সাদা ভ্যাস্‌কা ভ্যাস্‌কা হলেই বুঝবে—তার যকৃতের দোষ হয়েছে। সেক্ষেত্রে কঠিন খাদ্য কমিয়ে দেবে; দুধে একটু বেশী কোরে জল মেশাবে, চিনি কম দেবে, ননী বাদ দেবে। রোজ সকালে ১০—১৫ ফোঁটা কালমেঘের পাতা-ছেঁচা রস মাইদুধে বা জলে মিশিয়ে একটি মাস ধরে' খাওয়াবে; মাঝে মাঝে জোলাপ দেবে। পোয়াতিও খাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হবে।

ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াবার রেওয়াজ আমাদের দেশ থেকে উঠে গেলে ক্ষতি নেই। শিশুর ৬।৭ মাস বয়স পর্যন্ত মেনা-বোতলে ঈষদুষ্ণ দুধ ভরে খাওয়াবে; তারপর থেকে আস্তে আস্তে মেনাবোতলের ব্যবহার তুলে দিয়ে তাকে চাম্‌চে দিয়ে দুধ খাওয়াতে অভ্যাস করবে। এক বছর বয়স থেকে শিশুকে বসিয়ে তার মুখে দুধের পাত্র ধরে' নিজে নিজে দুধ খাওয়াতে শেখাবে। দুরন্ত ক্ষিদে-ভোলা ছেলেদের অনেক সময় ধরে-বেঁধে খাওয়াতে হয়, তখন ঝিনুক ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু যে উপায়েই তাকে খাওয়ানো হোক না কেন, প্রতিবার দুধ খাওয়াতে গিয়ে সময় ৭ মিনিট থেকে ১০ মিনিট সময় নিয়োগ করতে হবে; অর্থাৎ অল্প অল্প পরিমাণে দুধ মুখে দিয়ে—তার জিবের স্বাদগ্রহণশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি গলা দিয়ে ঢালতে গেলে শিশু জিবে কোন স্বাদ পায় না, সহজে গিলতে পারে না এবং সময় সময় তার দম আট্‌কাবার উপক্রম হয়।

ঝিনুক, মেনাবোতল, বা চামচে যেন প্রত্যহ নিখুঁতভাবে নির্মল ও নির্বীজিত করা হয়। মেনাবোতল প্রত্যহ সকালে বিশেষ বুরুশ্‌ দিয়ে ও সাবান-জল, বোরিক লোশন অথবা সোডার জল দিয়ে পরিষ্কার করবে এবং ব্যবহারের পূর্বে একবার জল দিয়ে বেশ কোরে ধুয়ে নেবে। রবারের বোঁটা দুটো রাত্রিতে ব্যবহার পর খুলে সাবান জলে ভিজিয়ে রেখে দিয়ো। তাতে বোঁটা শিগ্‌গির নষ্ট হবে না। মেনাবোতলে দুধ খাওয়াবার সময় বোঁটাটা শিশুর মুখে দিয়ে বোতলটা একটু উঁচু কোরে ধোরে থাকতে হয়। বেশী উঁচু কোরো না, গিলতে কষ্ট হবে। খরদার, চুষিকাঠি বা রবারের বোঁটা (Dummy teat) মুখে দিয়ে শিশুকে ভুলিয়ো না। এর যে কত দোষ, তা বলে' শেষ করা যায় না।

খাদ্য কম হচ্ছে না বেশী হচ্ছে?

শিশুর পেটে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য যাচ্ছে কিনা, তার কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ মায়ের কাছে ধরা পড়ে' যায়। আহার বেশী হলেই সে বমি করে, পেট ফাঁপায় কষ্ট পায়, বারে বারে মলমূত্র ত্যাগ করে, মলের রঙ্‌ হয় সাদাটে বা সবুজাভ—ডিম ডিম পদার্থে পূর্ণ, পাৎলা। হাত পা নাড়ে না, বেশীক্ষণের জন্যে জেগে থাকে না, মাথায় ও ঘাড়ে ঘাম হয়....ইত্যাদি।

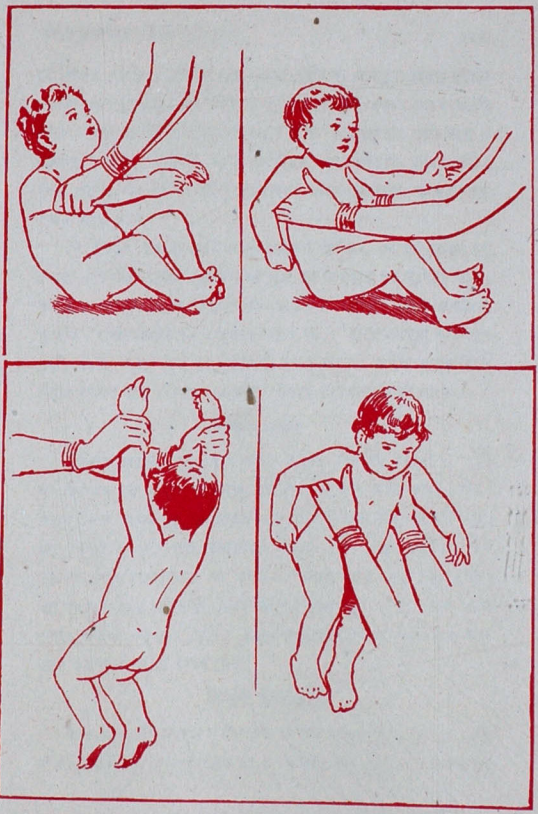

এইভাবে নয়। এইভাবে ধরবে ও তুলবে।

Blank page (s)

যে শিশুর ক্ষিদে মেটে না, সে স্তনের বোঁটা বা মেনাবোতলের বোঁটা সহজে ছাড়্‌তে চায় না, কিছুতে ঘুমুতে চায় না, জেগে থেকে প্রায়ই কাঁদে, জেগে বা ঘুমিয়ে মুখ চোকায় (ঠোঁট দিয়ে চোষার ভঙ্গী করে), প্রস্রাব ও মলের পরিমাণ কমে, রাত্রিতে একাধিকবার জেগে ওঠে; তিন মাসের পর থেকে আঙুল চোষে; নিয়মানুগভাবে তার দেহের ওজন বাড়ে না।

যে শিশুর ক্ষিদে মেটে ও আশানুরূপ পুষ্টি হয়, সে খানিকক্ষণ দুধ খেয়ে আপনিই বোঁটা ছেড়ে দেয় এবং দুধ খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে; রাত্রিতে প্রস্রাব-বাহ্যে কর্লে এক আধবার জাগে, নইলে একটানা ঘুমোয়; বাহ্যে ক্রমশ ঘন ও হলদে রঙের হয়; প্রস্রাব বাহ্যে পরিমাণে বেশী কিন্তু বারে কম হয়; হাতপা নাড়ে চাড়ে; মাঝে মাঝে নিজে নিজে ঘুমিয়ে পড়ে; দৈর্ঘ্যে-প্রস্থতায়-গুরুত্বে নিয়মানুগভাবে বাড়ে।

শিশুর ওজন

শিশুকে প্রতিমাসের শেষে ওজন করার অভ্যাস রেখো। যদি ঘন ঘন ওজনের সুবিধা না থাকে, তা'হলে ৩ মাস অন্তর ওজন নেবে। ওজন নিলে সহজে বুঝ্‌তে পারবে সে নিয়মমাফিক্ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। গড়্‌পড়তা বাঙালী শিশু জন্মকালে থাকে প্রায় ৵৩॥ ভারী। এক মাসের শেষে হয় আন্দাজ ৵৪ সের। চতুর্থ মাসে হয় ৵৬॥ সের; ষষ্ঠ মাসে ৭ সের ৩। পোয়া, নবম মাসে ৯ সের ২৮ পোয়া, এক বছর বয়সে অন্তত ১০॥ সের হবে। মেয়েশিশুর ওজন একপোয়া থেকে আধ সের কম হলে ভয়ের কারণ নেই।

শিশুর দাঁত-ওঠা

দাঁত ওঠার সময় অনেক শিশুরই বাড়ের হার কমে যায়। পেট ফাঁপে, বমি হয়, পাংলা বাহ্যে হয়। কারো জ্বর হয়। অনেকেরই

মুখ নিয়ে নাল গড়ায়, শক্ত জিনিষ মুখে পেলে মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরে। কখনো ঘুমের ঘোরে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। কখনো কখনো হামের মত চুলকোনি বেরোয়। ওপর পাটির দুটো দাঁত ৬-৭ মাসের মধ্যেই বেরোয়। যাদের ১০ মাসের মধ্যে দাঁত ওঠে না, তাদের ডাক্তার দেখানো উচিত। দাঁত ওঠার সময় পেট খারাপ হ'লে শিশুর দুধের পরিমাণ কিছু কমিয়ে দিতে পারো। মিষ্টি কম কোরে দেবে, ননী একেবারেই দেবে না।

শিশুর ছোটখাটো অসুখবিসুখ

পেট ফাঁপলে বা ফ্যানাওয়ালা ভ্যাস্‌কা বাহ্যে করলে, দুপুর আর রাত্রির দুধে এক চা-চামচপূর্ণ পরিষ্কার চুনের জল দুধে মিশিয়ে দিতে পারো। পেটব্যথায় যদি খুব ছট্‌ফট্‌ করে, তা'হলে গরম জলে ৫।৭ ফোঁটা তার্পিন তেল দিয়ে, সেই জলে একটা তুলো বা পাট-করা পুরু ন্যাকড়া ভিজিয়ে ও জোরে নিংড়ে নিয়ে, তাই দিয়ে সহনযোগ্য গরম অবস্থায় ছেলের পেটে সেঁক দেবে। তারপর জোলাপ দেবে।

যাদের কিছুদিন ধরে বদহজম, পেটে দুর্গন্ধ বায়ু ও পাৎলা বাহ্যে হয়, তাদের দুধের মধ্যে বয়স-হিসাবে ১-২ গ্রেন পর্যন্ত Sodium Citrate মিশিয়ে কিছুদিন খাওয়াবে, দিনে দু'বার কোরে। দাঁত ওঠার সময় ছেলেকে খুব সাবধানে রাখতে হয়, তার গায়ে যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

তার বাহ্যে পরিষ্কার না হ'লে, একটা পানের বোঁটায় রেড়ির তেল, নারকেল তেল বা জলপাই তেল বেশ জবজবে কোরে মাখিয়ে মলদ্বার দিয়ে ইঞ্চি খানেক পরিমাণ প্রবেশ করিয়ে, ৫।৭ বার বেশ আনানেওয়া কোরে বোঁটাটা প্রবিষ্ট রেখে দেবে। ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই মল বোঁটা-শুদ্ধ সবেগে বেরিয়ে আস্‌বে। নতুবা ছেলেদের ব্যবহার্য ছোট গ্লিসারিণ সাপোজিটারি কিনে এনে মলদ্বারের মধ্যে দিয়ে কোষ্ঠ সাফ্‌

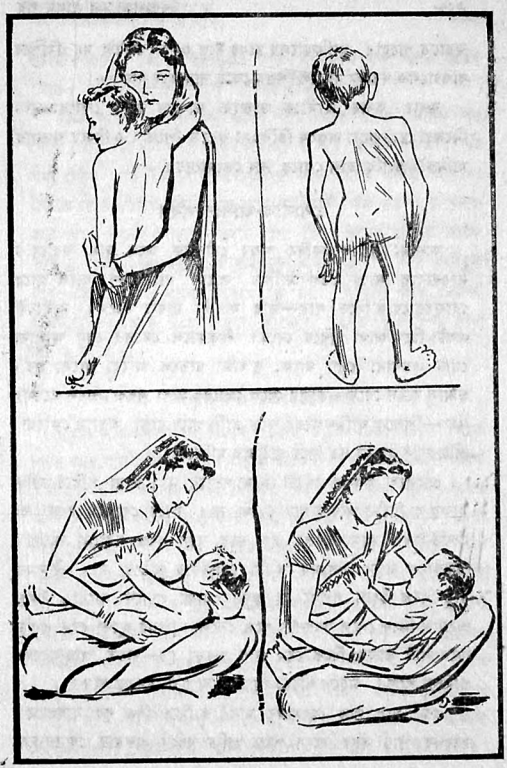

এইভাবে মাই দিও না। এইভাবে মাই দিও।

করাতে পারো। রাত্রিকালের দুধের সঙ্গে ৩০-৬০ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালেও পরদিন সকালে শিশুর কোষ্ঠ সাফ হয়ে যায়।....

কথায় কথায় স্বামীকে ডাক্তার ডাকতে হুকুম কোরো না; নিজেরা ছোটখাটো অসুখে চিকিৎসা করতে শিখো। এ বিষয়ে অতঃপর খানিকটা ওয়াকিবহাল কোরে দেব তোমাদের।

পোষাক-আশাক-শয্যা

বলেছি, শিশুকে একদিন অন্তর রৌদ্রপক্ক জলে স্নান করাবে; নাওয়াবার আগে তেল মাখিয়ে তাকে খানিকক্ষণ খালি গায়ে রোদ্দুরে রেখে দিতে পার—তার মাথাটা ছায়ায় রেখে। নাইয়েই একটা ঢিলে জামা পরিয়ে দেবে। শীতকালে ছেলের যেন আলাদা ছোট একখানা লেপ থাকে, দু'খানা থাকলে আরো ভালো হয়। ছ'মাস বয়েস থেকে—ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে অথবা প্রবল গরমের সময়—শিশুকে খানিকক্ষণের জন্যে খালি গায়ে রাখা অভ্যাস কোরো। গ্রীষ্মকালে স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখিয়ো।

ছেলেকে কখনো আঁটা জামা পরাবে না; জামা পরিয়ে তার বুকের বা পিঠের অর্ধেক খুলে রেখো না। কাঁধে বোতাম-দেওয়া বা ফিতে-বাঁধা জামা শিশুর এক বছর বয়স পর্যন্ত পরানো ভালো। শীতকালে তাকে পশমের আঁটা সোয়েটার পরিয়ো না। ঐ সময় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পশমী বা সুতী মোজা পরাতে পারো; কিন্তু প্রস্রাবে ভিজে গেলে তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলো। শিশুর জুতো যেন একটু ঢিলে আর আগার দিকে যেন বেশ চওড়া হয়—যাতে আঙুলগুলো পাতিয়ে পড়ে। নইলে পায়ের পাতা ও আঙুল বিগড়ে যায়।

এক মাস পরে ছেলেদের মাথা কামিয়ে দিও খুব সাবধানে। তারপর পাঁচ বছর বয়েস পর্যন্ত প্রতি বছরে একবার কোরে চুল

কামিয়ে দেবে। কাজল পরানোর পাট আজকাল তো প্রায় উঠেই গেছে! পারো তো প্রথাটাকে ফিরিয়ে এনো।

তিন মাসের পর থেকে তাকে পারতপক্ষে রাত্রি ১০টার পর থেকে ভোর ৫টা ৬টা পর্যন্ত মাই দেবে না বা দুধ খাওয়াবে না। ঐ সময় থেকে তার বিছানাটা পোয়াতির কাছ থেকে একটু আলাদা কোরে দেবে; যাতে কোরে সে হাত বাড়িয়েই স্তন না পায় অথবা তার কান্না শুনেই পোয়াতি অমনি পাশ ফিরে ঘুমের ঘোরে তাকে মাই না দেয়। রাত্রিতে পোয়াতিকে অন্তত দু'বার উঠে দেখ্‌তে হবে—ছেলে প্রস্রাব-বাহ্যে করেছে কি না। অবিশ্যি প্রায় ছেলেই প্রস্রাবের পর জেগে উঠে কাঁদতে থাকে। অনেক কুম্ভকর্ণ-মা কান্না শুনেও জাগে না।

শিশুর বসা ও হাঁটার সময়

দু'টো দাঁত বেরোলেই অনেক ছেলে বস্‌তে চেষ্টা করে। সাত মাসে প্রায় সবাই নিজে নিজে বস্‌তে পারে। অকালে কোন শিশুকে বসাবার চেষ্টা কর্‌তে নেই, তাহলে তার পিঠ যায় কুঁজো হয়ে। আট থেকে ন' মাসের মধ্যে তারা হামা টানে; দশ মাস থেকে তারা দাঁড়াতে চেষ্টা করে। এক বছরের মধ্যে বেশ দাঁড়াতে পারে এবং তারপর থেকে এক-পা দু-পা কোরে হাঁটে। বসা বা হাঁটার সময় শুধু নজর রাখ্‌বে—সে পড়ে' না যায়। বয়সের আগেই তাকে জোর কোরে হাত ধরে' হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করাবে না। শুধু তার নিজের উদ্যমকে একটু একটু সাহায্য করবে। সে শুয়ে পড়তে বা বসে' পড়তে চাইলে, তাকে সার্কাসের কুকুর-বাঁদরের মতো ধম্‌কে টেনেটুনে উঠিয়ো না। অকালে দাঁড় করাতে বা হাঁটাতে শেখালে বহু ছেলেই ত্রিভঙ্গ-মুরারি তৈরি হয়। ছবি দেখ্‌লে ব্যাপারটা বুঝতে পার্‌বে।

ঘুম পাড়াবার নিয়ম

দোল্‌নায় শুইয়ে রাখাও খুব ভালো প্রথা নয়, এতে ছেলের হজমের ব্যাঘাত হয়। আর এতে ছেলের এমন বদ্ অভ্যাস হয়ে যায় যে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত দোলায় না গুলে তার ঘুম আসে না। কোনো কোনো বাড়িতে গিন্নিরা দুই-পা সাম্‌নের দিকে মেলে তার ওপর ছেলেকে উপুড় কোরে শুইয়ে পাদুটো নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকেন। এও অত্যন্ত অনিষ্টকর অভ্যাস।....হাতের তালুতে তার মাথা রেখে, বসা-কোলে শুইয়ে অল্প অল্প নাড়াতে পারো; নতুবা কোলে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ো। খাওয়ানোর পর শুইয়ে বা বসিয়ে নাড়া দিয়ে বা দোলা দিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়াবে না। এর ফলে দেখবে—বহু শিশুর না দুল্‌লে ঘুম আসে না। তারপর বুড়ো বয়স পর্যন্ত এরা খেতে বসে', সভায় বসে', কথা বল্‌তে বল্‌তে, লিখতে লিখতে, পড়তে পড়তে আপনা-আপনি সাম্‌নে-পেছনে দুল্‌তে থাকে। লক্ষ্য কর্‌লে এরকম অনেক বালক-যুবক-বৃদ্ধ দেখতে পাবে তোমরা। শুইয়ে বরং তার মাথায় হাওয়া কোরো, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ো। নীচু গলায় সুর কোরে ছড়া বোলো—গান গেয়ো। প্রত্যেক শিশুই সুরজ্ঞ জেনো। মিঠে সুর তাদের মোহাবিষ্ট করে, চোখের পাতা ভারী কোরে তোলে। বেজায় কাঁদ্‌লে ছেলেকে খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ কোলে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ো।

শিশুকে কখনো হাতের কোন জায়গা ধরে' টেনে তুলবে না অথবা কব্জি বা কনুই ধরে' শূন্যে ঝুলোবে না; এতে অনেক সময় ওদের বাহুর হাড় বেঁকে যেতে—কাঁধের সন্ধি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারে, নতুবা বাহুর পেশী চিরকালের জন্যে বিশীর্ণ থেকে যেতে পারে। শিশুর বাহুতে শক্তি দেবার তোমরাই কর্ত্রী। হাতের পাতাদুটো চিতিয়ে

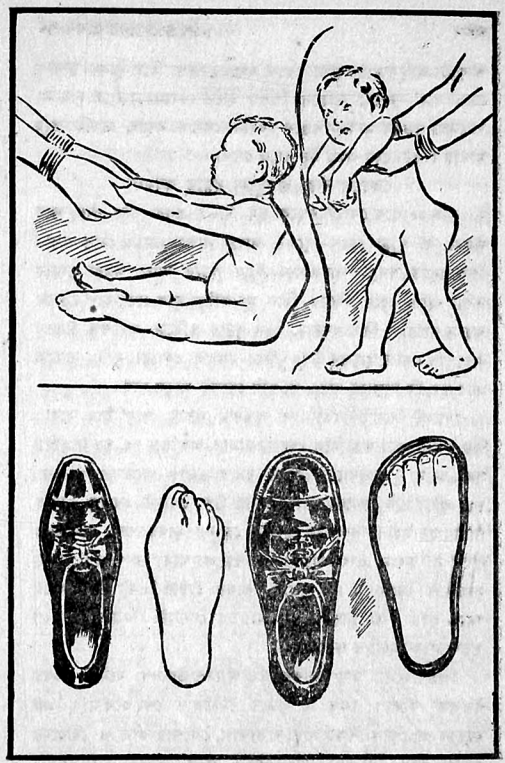

অল্প বয়সে শিশুকে বস্‌তে ও দাঁড়াতে শিখিও না।
সুচোলো-মুখ জুতো পরিয়ে পায়ের দফা খেও না।

ও বুড়ো আঙুল দুটো খাড়া রেখে, বগলের পাশ দিয়ে বুকের দু'পাশ চেপে ধরে' তুলবে, তাহলে শিশুর হাতে কোনো চাড় লাগ্‌বে না বা জোর পড়্‌বে না।....শিশুকে যখনি কোলে কর্‌বে, তখনি তার মাথার দিকটা যেন একটু উঁচু থাকে দেখো।

কোলে করা ও তুলে ধরার কায়দা

কচি ছেলেকে কোলে কর্‌বে দুই বাহুর ওপর তার কাঁধ আর উরুদ্বয় বা পাছা রেখে—বুকের কাছে আল্‌তোভাবে ঠেসে ধরে'। শিশু বস্‌তে শিখ্‌লে তাকে ঘড়া কাঁখে করার মতো অথবা পাছার তলায় হাত রেখে পিঠের দিকে মুখ করিয়ে বুকে চেপে ধর্‌ে' কোলে কর্‌তে পারো। কিন্তু খবর্দার, ২২৭ পৃষ্ঠার ছবিতে প্রদর্শিত উপায়ে একপেশে কোরে হাতের উপর বসিয়ে কোলে কোরো না। তাহলে তার ফল কি দাঁড়াতে পারে, তা ছবি থেকেই মালুম হবে।

আগেই বলেছি—ছেলেদের স্তন্যদান করবে 'বাবু' হয়ে বসে'। এক-কাতে শুয়ে স্তন্য দিলে ছেলের টানার অসুবিধে হয়, দুধ শিগ্‌গির হজম হয় না। স্তন্যদানের নিমিত্ত বসার ভঙ্গীও অনেকের খারাপ। ২২৭ পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই কোন্ ভঙ্গীটি ঠিক, কোনটি বেঠিক্ বুঝতে পারবে তোমরা। বুক নীচু কোরে ছেলের মুখের ওপর স্তন ঠেসে ধ'রো না কখনো এবং কোলের ওপর ছেলের মাথা ও পায়ের দিকটা সমক্ষেত্রে রেখো না। মাথার দিকের হাঁটুটা একটু উঁচু কোরে ধরতে হয়। তা ছাড়া দুই আঙুলে বোঁটাটা অল্পবিস্তর টিপে স্তন্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

শিশুপালনের কত ফিকির-ফন্দি-আদেশ-উপদেশ মনের ভেতর গজ্‌গজ্ কচ্ছে। কিন্তু এ যাত্রার বৈঠকে তা শেষ হবে না। এক বছরের পর থেকে শিশুর সারা বাল্যকাল, কৈশোর কাল ও যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত কিভাবে লালন-পালন কত্তে হবে, রোগে-শোকে

আকস্মিক বিপদে তাদের কিভাবে যত্নশুশ্রূষা কর্তে হবে, কিভাবে তাদের স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ কর্মনিষ্ঠ শিক্ষিত নাগরিক কোরে গড়ে' তুলতে হবে, সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরের যাত্রায় বল্‌ব। এবারকার পালা আমার ফুরিয়ে এল!

কান্নার অর্থ

বিদায়-কালে আবার তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই—ছেলে কাঁদলেই তার মুখে স্তন্যবৃন্ত বা মেনাবোতলের বোঁটা ঠেসে দিয়ো না। জানো তো কান্নাই কচি ছেলের ভাষা, তাই দিয়ে সে তার শতেক অভিযোগ ঘোষণা করে। গরম বা শীত বোধ হলে, গায়ের কোথাও চুল্‌কোলে, মশা-ছারপোকা-পিপড়ে কাম্‌ড়ালে, মাছিতে জ্বালাতন করলে, গায়ে কোন কিছু বিঁধ্‌লে, খোলা বাতাসে যাবার ইচ্ছে হলে, ঘুম পেলে, কোলে উঠ্‌তে চাইলে, পেট কাম্‌ড়ালে, গলা ব্যথা করলে, সর্দিতে নিঃশ্বাস আট্‌কে এলে, জিবে ঘা হ'লে, বিছানায় প্রস্রাব-বাহ্যে কল্লে, কান্ কামড়ালে....শিশু কাঁদে। প্রত্যেক উদ্দেশ্যমূলক কান্নারই একটা স্বতন্ত্র ধরণ—পৃথক পর্দা ও সুর আছে। কাঁদলেই ধরণটা লক্ষ্য কোরো, কারণটা খুঁজে তার প্রতিকার কোরো।

আদর ও ব্যায়াম

ছেলেকে খোলা হাওয়ায় ছাতে কিংবা বাইরে দু'বেলা নিয়ে খানিকক্ষণ বেড়াবে; বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগস্থাপন করাবে। দিনরাত কোলে কোরে রেখো না, কাঁদলেই কোলে তুলে আদর কোরো না। মা ছাড়া তাকে বাঁচতে হবে—বাড়তে হবে—লড়তে হবে, এটা তাকে একটু একটু কোরে বুঝতে দিয়ো।

যার-তার কোলে শিশুকে ছেড়ে দিয়ো না, অচেনা লোককে তার গালে-ঠোঁটে চুমু খেতে দিয়ো না। এই কোরে তার দেহে যে কত

রোগ ঢোকে তার ঠিক নেই। চক্ষুলজ্জা কোরো না, বাপমা এরকম দেখলে স্পষ্টই মুখের ওপর প্রতিবাদকরবে। জাপানে অনেক পরিবারে শিশুর হাতে বা গলায় একটা পদক দিয়ে রাখে, তাতে লেখা থাকে—'দয়া কোরে চুমু খাবেন না।'....

তাকে কাতুকুতু দিয়ে খবর্দার হাসিয়ো না, কাউকে হাসাতে দিয়ো না। তাকে নিয়ে যেন লোফালুফি কোরো না। ওর গোপনাঙ্গ নিয়ে কেউ যেন ঘাঁটাঘাটি না করে, ওখানে যেন চুম্বন না দেয়।

তিন মাসের পর থেকেই ছেলে হাতপা নেড়ে নিজে-নিজে খেলা করে। এটা তাদের ব্যায়ামও বটে। ছ'মাস বয়স থেকে একটু অবসর পেলে এই ব্যায়ামে তোমরা সাহায্য করতে পারো। আগে যেসব ছেলে-ভুলোনো ছড়া ছিল, তার কতকগুলো ছিল পেশী-সঞ্চালনে শিশুকে উৎসাহ দেবার জন্যে। কব্জি ও মুটো শক্ত করার জন্যে শিশুর হাতেকাঠের ভাঁটা দিয়ে বলা হ'ত—

হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব,
নইলে নাড়ু কোথায় পাব,
পড়ে গেলে নাড়ু কুড়িয়ে দেব;
সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেব।....

আবার, তার হাত আর পায়ের পেশীগুলির বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ব্যায়াম করিয়ে দেবার সময় বাপ-মা-ভাই-বোন্ ছড়া কাটত্—

আড়ারে মোড়ারে— মা ষষ্ঠীর ঘোড়ারে,
আশে যা, পাশে যা, আয় চাঁদ আয় চাঁদ,
মণির কপালে টিপ্ দিয়ে যা।

—শেষ—

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন অ্যাম্বুলেন্সের টেলিফোন

কলিকাতা কর্পোরেশন অ্যাম্বুলেন্স—ফোন্ ব. বা. ৩৯২৭। **আই, এন্, এ, সি, অ্যাম্বুলেন্স**—পি. কে. ৪৬১২, ৪৬১৩। **আর, ডব্লিউ, এ, সি, অ্যাম্বুলেন্স**—ব. বা. ৩৯৬৫। **রেড্ ক্রস্ অ্যাম্বুলেন্স**—কলি. ৫১১৫।

কলিকাতা ও হাওড়ার কয়েকটি প্রসূতি-হাসপাতাল

[এর প্রায় সবগুলিতেই বিনামূল্যে প্রসূতিদের খালাস করবার ব্যবস্থা আছে এবং অনেকগুলিতেই নির্দিষ্ট মূল্যে ক্যাবিন ভাড়া পাওয়া যায়। প্রসূতির ব্যথা উঠ্‌লে এই সকল হাসপাতালের নিকটস্থ একটিতে বা একাধিক জায়গায় ফোন্ কোরে জেনে নিতে হয় শয্যা বা ক্যাবিন খালি আছে কিনা। তারপর যে-কোন একটা অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ী ফোনে সংবাদ দিয়ে ডাকিয়ে আনিয়ে তাইতে কোরে আগে-থেকে-ঠিক্-করা হাসপাতালটিতে প্রসূতিকে পাঠিয়ে দিতে পারো অথবা নিজেরা কেউ গাড়ী ভাড়া কোরে পৌছিয়ে দিতে পারো।]

(১) **চিত্তরঞ্জন সেবা সদন,** ১৪৮ নং রসা রোড সাউথ। ফোন্ সাউথ ২২৪। (২) **ডাফেরিন্ হাসপাতাল,** ১ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট্। ফোন্ ব. বা. ১১১৩। (৩) **শম্ভুনাথ হাসপাতাল,** ১১ নং এলগিন রোড, ভবানীপুর। ফোন্ পি. কে. ১৩৭৪। (৪) **ইডেন হাসপাতাল** (কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত), ইডেন হাসপাতাল রোড, কলেজ ষ্ট্রীট্। পৃথক ফোন্ নেই। (৫) **বলদেওদাস**

মেটার্নিটি হোম, ২২ নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট্। ফোন্ ব. বা. ৫৬৮। (৬) **চেতলা মেটার্নিটি হোম,** ১০, ময়েরপুর রোড। ফোন্ সাউথ ৬৯৬। (৭) **খিদিরপুর মেটার্নিটি হোম,** ৪৭ নং একবালপুর রোড। ফোন্ সাউথ ৬৪১। (৮) **মাণিকতলা মেটার্নিটি হোম,** ২৩৭ নং মাণিকতলা মেন রোড্। ফোন্ ব. বা. ৪২১২। (৯) **প্রসূতি-গৃহ,** ১৪২-৪৩ নং জে, এন, মুখার্জি রোড্, ঘুষুড়ি, হাওড়া।

কর্পোরেশন-নিযুক্ত বিনামূল্যের ধাত্রীদের ঠিকানা

[এঁদের যাওয়ার-আসার গাড়ীভাড়া দিতে হয়। নিরাপদে খালাস হোলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা ধাত্রীকে ২৲।২৲ খুসি হয়ে বক্‌শিশ দেন্; কিন্তু এঁরা কারো কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক আদায় করতে পারেন না, কর্পোরেশন থেকে নিয়মিতভাবে মাইনে পান। বাড়িতে অ-নিযুক্ত অবস্থায় থাক্‌লে এঁরা সংবাদ পেলেই আসতে বাধ্য।]

(১) ৩২।১০, বীডন ষ্ট্রীট্; ব. বা. ৩১২১। (২) ২৬।৯।১এ, হ্যারিসন্ রোড্; ব. বা. ৪৪৮০। (৩) ১৩ নং পুলিস হাসপাতাল রোড, এণ্টালি; কলি. ৫৩৭১। (৪) ৪৭।১ সি, হাজরা রোড্; পি. কে. ১০৮৮। (৫) ১০।১ মমিনপুর রোড্, খিদিরপুর, সাউথ ৫৩৭। (৬) ৬৭।১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্; ব. বা. ৫২৯৭।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি-নিযুক্ত ধাত্রীদের ঠিকানা

(১) ১নং হইতে ৪ নং ওয়ার্ডের জন্যে ধাত্রী—৫১ নং অবনী দত্ত রোড্, সালকিয়া; ফোন্ হাও. ২৮৮। (২) ৫ নং হইতে ৭ নং ওয়ার্ডের জন্যে ধাত্রী—৭২২ নং সার্কুলার রোড্, হাওড়া; হাও. ২৯৯। (৩) ৮ নং হইতে ১০ নং ওয়ার্ডের জন্যে ধাত্রী; ৫৫ নং কালীকুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর; হাও. ৩১০।

Blank page (s)